১৭ ৩৪

কবিতা

ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা] আশ্বিন ১৩৫৪ [ক্রমিক সংখ্যা ৫৫

সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য

মানবস্বভাব সীমাহীনরূপে শোধনীয় ব'লে মানবসমাজে প্রগতিমাত্রই আপতিক, কোনো মঙ্গলই অমিশ্র নয়, ভালোর বিশুদ্ধতা, অন্তত ব্যতিক্রমরূপে, সম্ভব শুধু জন-জীবনে, কিন্তু গণ-জীবনে তার মিশ্রতাই অব্যতীত নিয়ম; আর যেহেতু সকল মানুষের, এমনকি অধিকাংশ মানুষের, বিশুদ্ধতা এখন পর্যন্ত অচিন্তনীয় প্রস্তাব, যূথ-জীবনে এমন-কোনো ভালোর উদ্ভব হ'তেই পারে না, কালক্রমে মন্দের মাশুল দিয়ে যার দেনা ডবল শুধতে না হয়। উদাহরণত, সংস্কৃতির উপর মুদ্রাযন্ত্রের ও গণতন্ত্রের প্রভাবের কথা যদি ভাবি? মাতৃভাষায় বর্ণপরিচয় দেশের প্রত্যেক মানুষের হ'তেই হবে, এ-ব্যবস্থা কি ভালো নয়? পাঠ্যবস্তুর দ্রুত, সুলভ ও বহুল প্রচার কি অকাম্য? নিশ্চয়ই ভালো, নিশ্চয়ই কাম্য।…কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফলিত বিজ্ঞান মানুষকে এমন একটা অসহায় অবস্থায় নিয়ে এসেছে যে নিজের ক্ষমতার সীমা সে টানতে পারে না; কোনো-একটা শক্তি একবার জ্যামুক্ত হ'লে কোথায় গিয়ে থামবে, এবং পথে-পথে কী কাণ্ড করবে তা স্বয়ং উদ্‌ভাবকের অজ্ঞাত। আমাদের পুরাণে দেখতে পাই, দারুণতম অস্ত্র প্রভুর আজ্ঞায় দুঃসাধ্যসাধনে বেরলো, এবং যেটুকু প্রয়োজন ঠিক সেটুকু সম্পন্ন ক'রেই ভালোমানুষের মতো ফিরে এলো তূণে।

এই প্রত্যাহরণ বিদ্যাটা আধুনিক মানুষ হারিয়েছে : পুরাকালে, বীরেরা অন্তত উপায়ের কর্তা ছিলেন, এ-যুগে দিগ্বিজয়ীরাও উপায়ের দাস। মুদ্রাযন্ত্র জন্ম দিলো সংবাদপত্রকে, সর্বজনীন প্রথম পাঠ তাকে লালন করলো, তারপর দেখতে-দেখতে তা হ'য়ে উঠলো প্রজাবৃন্দের প্রধান পাঠ্য, জনগণের একমাত্র মানসিক খাদ্য। বর্তমান পৃথিবীর সাক্ষর জনসংখ্যার বিশাল অধিকাংশের পক্ষে প্রতিদিনের প্রথম প্রাতঃকৃত্য হ'লো পত্রিকাপাঠ, অনেকের পক্ষে ত্রিসন্ধ্যার আহ্নিক অনুষ্ঠান; আর বয়স্কদের মধ্যে এমন ব্যক্তির সংখ্যাও আজ তুচ্ছ নয়, যাঁরা জীবন কাটিয়ে দেন দৈনিক কিংবা প্রাহরিক সংবাদস্তস্ত ছাড়া আর-কোনো মুদ্রিত বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না-ক'রে।

বর্তমান জগতে সংবাদপত্রের অপরিহার্যতা স্বতঃসিদ্ধ। পৃথিবী আজ ভৌগোলিক অর্থে এমন সংকুচিত, ঐতিহাসিক অর্থে এমন একীকৃত যে কোনো-এক দেশে কোনো-এক সময়ে এমন-কিছু প্রায় ঘটতেই পারে না, যার প্রভাব ছড়িয়ে না পড়ে অন্য সব দেশের আশু কিংবা ভবিষ্যৎ সুখদুঃখে; সেইজন্য বিশ্বব্যাপারে দৈনন্দিন অনুসন্ধিৎসা মানুষের পক্ষে অদম্য। পূর্বযুগে দেশে দেশে, এমনকি জনপদে জনপদে, ভৌগোলিক ব্যবধান দুরতিক্রম্য ছিলো ব'লে মানুষের কৌতূহলের ক্ষেত্রও ছিলো সংকীর্ণ এবং গণে-গণে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন; তখন সংবাদপত্র রচিত হ'তো মানুষের মুখে-মুখে, হাটের কোলাহলে, ঘাটের কলরবে, চণ্ডীমণ্ডপের চর্চায় কিংবা শুঁড়িখানার হল্লায়—এই শেষোক্তেরও বৃত্তান্ত আর এগোতো না নাবিকের উপবাদের পরে। এর বিলুপ্তি, বলা বাহুল্য, নাগরিক সমাজেও এখনো ঘটেনি; আর এই স্বতোরচিত মৌখিক সংবাদপত্র সম্বন্ধে এমার্সনের উক্তি মেনে নিতে কারোরই আপত্তি হবে না যে সংবাদমাত্রেই পরচর্চা, 'all news is gossip'। এমনকি, এর সামাজিক স্বীকৃতি দেখতে পাই এই ভিক্টরীয় প্রবচনে যে

ভদ্রলোকেরা কথা বলেন নানা বিষয়ে আর ভৃত্যেরা কথা বলে ব্যক্তিদের নিয়ে। কিন্তু মুদ্রিত সংবাদপত্রের প্রতি এমার্সনীয় সংজ্ঞাটি আরোপ করতে অনিচ্ছুক হবেন প্রায় সকলেই, যদিও তাতে মিথ্যার পরিবেষণ স্নানের ঘাটের বা চায়ের পার্টির পরচর্চার তুলনায় গুরুত্বে, আয়তনে ও ব্যাপ্তিতে বহুগুণ। ইংলণ্ডে অ্যাডিসন যখন প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর প্রতিশ্রুত ও প্রযুক্ত উদ্দেশ্য ছিলো সরসতার দ্বারা নীতির উজ্জীবন, আর নীতির দ্বারা সরসতার সংশোধন; কিন্তু এ-সূত্র গ্রহণ করলে আধুনিক ব্যবসা-সেবক, পার্টিপোষিত সংবাদপত্রের পক্ষে অস্তিত্বই অসম্ভব। আধুনিক সংবাদ-পত্রের তিনটি অংশ : সংবাদ, মন্তব্য ও বিজ্ঞাপন। তিনটিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপে সত্যের অপলাপী। প্রত্যক্ষ অপলাপ ঘটে তথ্যের নির্বাচনে, অন্যগুলি বাদ দিয়ে শুধু সেই সব তথ্যের বিকীরণে যা কেবল কোনো-একটি সামাজিক শ্রেণীর কিংবা রাজনৈতিক দল বা উপদলের স্বার্থানুকূল: অর্থাৎ, যে-সব তথ্য নির্বাচিত হয়, আর নির্বাচিত হ'য়ে যে-ভাবে তারা পরিবেশিত হয়, তাতেই নিহিত থাকে চিত্তবিকারী মন্তব্য। খবর সাজাবার কৌশলে পাঠকের মনকে তৈরি ক'রে নিয়ে তারপর প্রয়োগ করা হয় সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্বারা পরোক্ষ অপলাপ; ফলত লোকচিত্তে সেই তথ্যের অধিকতর বিকৃতি ঘটে, যার উপর নির্ভর ক'রে মানুষ 'সত্য কথাটা' জানতে চায়। এই অপলাপের ব্যতিক্রম সংবাদে ও মন্তব্যে যতটা দেখা যায়, বিজ্ঞাপনে তার চেয়ে অনেক কম; বিজ্ঞাপনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় অপলাপেরই সক্রিয়তা তীব্রতর, পাঠকের পক্ষে অদম্যতর। আধুনিক বিজ্ঞাপন চতুর্বিধ: প্রথম, যেখানে তথ্য আর মীমাংসা দুটোই যথার্থ; দ্বিতীয়, যেখানে তথ্য ভ্রান্ত কিন্তু মীমাংসা গ্রহণীয়; তৃতীয়, যেখানে তথ্যে ভুল নেই, কিন্তু মীমাংসা কাল্পনিক; চতুর্থ, যেখানে তথ্য আর মীমাংসা দুটোই ভ্রান্ত। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপন অত্যল্প, কেননা সেটা সম্ভব

শুধু সেই ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত বা নগণ্য, কিংবা যেখানে পণ্যবস্তুর নামটা জানানোই যথেষ্ট ; যেমন সংগ্রন্থের বা গ্যালিউড্রিনের বিজ্ঞাপন। চতুর্থ শ্রেণীর বিজ্ঞাপনও পরিমাণে অপেক্ষাকৃত অল্প এবং—অন্তত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে—প্রতিপত্তিতে দুর্বল ; এখন পর্যন্ত এই শ্রেণীটা নিতান্তই যুবকীকরণী ভেষজে আর সন্তাননিবারিকা বটিকায় আবদ্ধ। আধুনিক সংবাদপত্রে প্রচারিত অধিকাংশ বিজ্ঞাপন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর : যেমন, 'রাত্রিকালীন অপুষ্টি' তথ্যহিশেবে ভ্রান্ত কিন্তু এই অলীক ব্যাধির প্রতিকারীরূপে যে-পানীয় বিজ্ঞাপিত, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তা উপকারী হ'তেও পারে ; কিংবা, নিয়মিত স্নান যে স্বাস্থ্যকর এ-তথ্য অকাট্য, তাই ব'লে সাবান না-মাখলে, তার উপর বিশেষ কোনো-একটি সাবান না-মাখলেই যে স্নান ব্যর্থ হ'লো, এ-মীমাংসা একেবারেই অলীক ; অতএব অধিকাংশ বিজ্ঞাপনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সত্যের অপলাপী ; অথচ প্রত্যেক সংবাদপত্রের একটি প্রধান অংশ ব'লে, এবং কোনো-কোনো পত্রিকার সুপাঠ্যতম অংশ ব'লে, প্রতিপত্তিতে বিজ্ঞাপন আজ সংবাদ ও সম্পাদকীয় স্তম্ভের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এ-যুগের সাধারণ মানুষ তার কাজ চালাবার মতো জীবনদর্শন সংবাদপত্র থেকেই সংগ্রহ করে (যেহেতু মোটের উপর সে আর-কিছুই প্রায় পড়ে না), কিছুটা তার 'পাঠ্য বস্তু' থেকে, কিছুটা বিজ্ঞাপন থেকে—বোধহয় বিজ্ঞাপন থেকেই বেশি, কেননা অনেক পত্রিকার 'পাঠ্য বস্তু'ও মুখ্যত প্রতিপালক বিজ্ঞাপনদাতারই প্রচারক, অর্থাৎ ছদ্মবেশী বিজ্ঞাপন। এ-অবস্থায়, যতই মন-খারাপ হোক, এ-সিদ্ধান্তে না-এসে তো উপায় দেখি না যে বর্তমানে সাধারণ মানুষের সমস্ত ধারণা ও অনুমানের, অতএব সমস্ত ব্যবহারের ভিত্তিটাই মিথ্যা।

পুরাকালীন মৌখিক সংবাদপত্র এত মারাত্মক নিশ্চয়ই ছিলো না। লোকে পরচর্চা করতো, কিন্তু তাকে পরচর্চা ব'লেই

জানতো, পরাবিদ্যা ব'লে ভ্রম করতো না। তাতে বিশ্বাস ছিলো না, শুধু বিনোদন ছিলো। বিশ্বাস সংগ্রহের অন্য ক্ষেত্র ছিলো ছিলো তখন, ছিলো ভিন্ন-ভিন্ন দেশে নিত্যক্রিয়াশীল ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও আদিকাব্য। আধুনিকের দৃষ্টিতে বাইবেল কিংবা রামায়ণ মহাভারত তথ্যের দিক থেকে যতই অসম্পুর্ণ ও ভ্রান্ত হোক, বিজ্ঞানের তৎকালীন অপরিণতির পরিমাপে মানুষের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষারই ব্যবস্থা ছিলো তাতে ; তাছাড়া, যে-সংশ্লেষণ-শক্তির বা জ্ঞানের সহায় ব্যতীত কোনো বিশেষ জ্ঞান, বিশ্লেষণী জ্ঞান, অর্থাৎ বিজ্ঞান শুভপ্রসূ হ'তে পারে না, এ-সব গ্রন্থ সেই জ্ঞানেরই ভাণ্ডার ব'লে তাতে জীবনের মৌল মূল্যবোধ সম্বন্ধে স্বীকৃতির পরাকাষ্ঠা আজ পর্যন্ত আমাদের বিস্ময় জাগায়। সেকালে মানুষ তার প্রতিদিনের কাজ-চালানো জীবনদর্শন যে-উৎস থেকে সংগ্রহ করতো, সেই উৎসটা অন্তত সত্যাভিমুখী ছিলো, একালে উৎসটাই মিথ্যাশ্রয়ী। প্রভেদটা নিঃসন্দেহে নিদারুণ।

সংবাদ যে মিথ্যা, বিজ্ঞাপন যে ততোধিক, এ-কথা মনে-মনে অনেকেই জানেন, মুখেও মানেন, কিন্তু কার্যত এ-কথা মনে করতে অনেকেই সীমাহীনরূপে অক্ষম যে রটারিযন্ত্রের রটনাও হাটের চ্যাঁচামেচি বা ঘাটের কিচিমিচির মতোই 'গসিপ'। একে তো মুদ্রাক্ষর সম্বন্ধে ছেলেবেলার অন্ধ আস্থা অনেকেই আজীবন কাটিয়ে উঠতে পারেন না, তার উপর আপাতদর্শনে আধুনিক সংবাদপত্রের তথ্যাবলী এতই প্রামাণিক, তার সংগ্রহে মানুষের উপায়নৈপুণ্যের ক্রীড়া এতই চমকপ্রদ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনাস্থার অস্থায়ী অপনোদন—যদিও কোলরিজীয় অর্থে নয়—অনিবার্য। বস্তুত, এই তথ্যাবলী অনেক ক্ষেত্রেই অতথ্য নয়, তবু সত্যের অপলাপী ; কেননা সংবাদপত্র শুধু জীবনের বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকাণ্ডের বিবৃতি দেয়, কোনো সংশ্লেষণী নীতির দ্বারা ঘটনাবলীকে সুসংবদ্ধ ও অর্থমণ্ডিত করার কোনো চেষ্টাই করে না। রাজনীতি,

ঘোড়দৌড়, রঙ্গালয়, বিচারালয়, মৃদুমধুর পরচর্চা ও বিবিধ বিচিত্র পণ্যপ্রচার—এই সব পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিষয়ের দিন-পঞ্জীতে তথ্যের যাথার্থ্য কিছুটা যদি থাকেও, এই বিচ্ছিন্নতাকে একসূত্রে গাঁথবার মতো কোনো মূলনীতির প্রয়োগ নেই ব'লে তথ্য আর অতথ্য মানুষকে সমপরিমাণেই উদ্‌ভ্রান্ত করে। অর্থাৎ কোথায় কী ঘটছে তা আমরা কাগজ প'ড়ে জানতে পারি, কিন্তু ঘটনাবলীর তাৎপর্য বুঝতে পারি না, আর সেটা না-বুঝলে আমরা-যে যত জানবো ততই মূঢ় হবো, মানবজাতির সাম্প্রতিক ইতিহাসই তার তর্কাতীত প্রমাণ। বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থও বিবিধ বিষয়ে তথ্যের আধার; কিন্তু সে-সব তথ্য একটি একাভিমুখী উদ্দেশ্যে, একটি সত্যান্বেষী মূলনীতির দ্বারা সংবদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট ব'লে সেখানে তথ্যাবলীর তাৎপর্য এতদূর সুপরিস্ফুট যে অতথ্যও সর্বত্র সত্যনির্ণয়ের অন্তরায় হয় না। যেমন, বস্তুবিশ্ব সম্বন্ধে প্রাচীন দার্শনিকদের অনেক ধারণাই ভ্রান্ত ছিলো, আজ আমরা এ-কথা জেনেছি ব'লে তাঁদের মুখ্য মীমাংসা, তাঁদের সামগ্রিক উপলব্ধি আমাদের কাছে অনর্থক হ'য়ে যায়নি। উদ্দেশ্য সংবাদপত্রেরও আছে, কিন্তু সে-উদ্দেশ্য সত্যান্বেষী নয়, একাভিমুখীও নয়, কেননা তার আশ্রয় দিনানুদৈনিক রাজনীতি, অর্থাৎ আজ-নীতি। আজ-নীতি বলি তাকেই, যার কাছে আজকের মুহূর্তটাই সবচেয়ে প্রধান, বর্তমান সময়টা অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, আর সত্যের একমাত্র সংজ্ঞাই হ'লো ঘটনা। সংবাদপত্র-সেবিত মানুষের কাছে নীতি মানেই যেহেতু আজ-নীতি, বর্তমান জগতে এ-ধারণা প্রায় সর্বব্যাপী যে সত্য তথ্যেরই নামান্তর মাত্র, অতএব শিক্ষা মানেই তথ্যসংগ্রহ। সামাজিক মূল্য সবচেয়ে বেশি আজ 'well-informed' মানুষের, অর্থাৎ সবজান্তার। উদারতম শিক্ষাব্যবস্থাতেও কোনো সত্যান্বেষী সংশ্লেষণী নীতির প্রভাব নেই, শুধু খবর, শুধু কতগুলি খবর কুড়োতে পারলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিলাভ সম্ভব।

আমরা যারা সে-সব উপাধি পেয়েছি, কখনো, কোনো উপলক্ষ্যে কোনো শিক্ষকের মুখে এমন পরামর্শের আভাসও আমরা শুনিনি যে খবর সংবাদ হয় শুধু তখনই যখন তাকে কোনো-এক সমগ্রের অংশ ব'লে উপলব্ধি করি, আর সেই সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলে যে-কোনো খবরই 'গসিপ' ছাড়া কিছু নয়। কেউ আমাদের বলেননি যে আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য ধাতুগত অর্থে সংবাদ, অর্থাৎ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি সংবিদ হ'তে, সম্বিৎ জাগাতে, জ্ঞানের অন্বেষণে। দৈনিকপত্রের মতো বিভিন্ন, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, তাৎপর্য-বঞ্চিত খবর কুড়োনোকেই আমরা জেনেছি শিক্ষা ব'লে। যে-সমগ্রের অংশরূপে না-দেখলে সব খবরই 'গসিপ', সেই সমগ্রের অস্তিত্বের কথাও এমনকি আমরা শুনিনি। তবু আমাদের সময়ে তথ্য-তৃষ্ণা অপেক্ষাকৃত অনুগ্র ছিলো; সাধারণত, সাহিত্যের ছাত্র সাহিত্যের খবরই শুধু রাখতো, আর বিজ্ঞানের ছাত্র বিজ্ঞানের। এই বিষয়-বিভক্ত শিক্ষা জ্ঞানের অন্তরায়, কিন্তু এর চেয়েও বড়ো অন্তরায় অধুনাপ্রবর্তিত তথ্যোন্মাদনা—শুধু ছাত্ররা নয়, অগ্রগামী বয়স্করাও এ-ধারণার বশবর্তী যে যত বেশি তথ্য তাঁরা জানবেন আর তার বিষয় যত বহুল-বিচিত্র হবে, ততই তাঁরা শিক্ষিত হবেন, ততই পাল্লা দিতে পারবেন আধুনিক জীবনের জটিলতার সঙ্গে। এই তথ্যোন্মাদনার পরিচয় পাই রীডর্স ডিজেস্ট ধরনের বটিকা-পত্রিকার পৃথিবীব্যাপী পরার্ধ-প্রচারে, আর রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন ও বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ে গণপাঠ্য গ্রন্থ-ও পুস্তিকা-সংখ্যার অফুরন্ত গুণনে। বলা বাহুল্য, এই পত্রিকা ও পুস্তিকারাশি দৈনিক পত্রেরই করিমৎকর্মা সহযোগীমাত্র, কেননা স্বল্প পরিসরে, জলবৎ ভাষায় এ-সব বিষয়ে কতগুলি তথ্যই শুধু জানানো যায়, সে-সব তথ্যের সংশ্লেষণ, মূল্যবিচার, তাৎপর্যনির্ণয়, অর্থাৎ তথ্যে নির্ভর ক'রে সত্যের অন্বেষণ, লেখকের অভিপ্রেত এবং শক্তির অধিগম্য হ'লেও (বস্তুত, প্রায়ই তা হয় না) কার্যত অসম্ভব।

সাধারণ মানুষের চিন্তার জগতে, তাই, নৈরাজ্য আজ ঘোরতর; পনেরো বছর আগেকার তুলনায় আজকের দিনের উৎসাহী ছাত্র কিংবা অগ্রগামী মধ্যবয়সী খবর রাখেন ভূরিপরিমাণে বেশি, কিন্তু কোনো-এক সমগ্রের অংশরূপে না-দেখলে সব খবরই যে 'গসিপ', এ-বিষয়ে অচেতনতা আরো ব্যাপ্ত, আর সেই সমগ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা আরো নীরন্ধ্র। ফলত, তথ্যের আধিক্যের পরিমাপে আরো ঘনীভূত হচ্ছে প্রমাদ; তথ্য যত পাচ্ছে, সত্য থেকে তত দূরে স'রে যাচ্ছে মানুষ; বুদ্ধিমানেরাও তাজ্জব সবজান্তার বেশি কিছু হ'তে পারছেন না। আর এই অবস্থাটাই অনেকের মতে প্রগতি, আর-কোনো কারণে নয়, আমাদের জৈব জীবনের বর্তমান ব্যবস্থা এরই অনুকূল ব'লে, আজকের দিনে আর্থিক মূল্য ও সামাজিক মর্যাদা সবজান্তারই সর্বাধিক ব'লে।

মুদ্রাযন্ত্র ও গণতন্ত্রের ফলে সংবাদপত্রের উত্থান ও প্রতিপত্তি; সংবাদপত্রের উত্থান ও প্রতিপত্তির ফলে সাধারণের তথ্যোন্মাদনা, সাধারণের তথ্যোন্মাদনার ফলে সংস্কৃতির অধঃপাত—আমাদের আপতিক প্রগতি বলতে গেলে মাত্র এক শতকের মধ্যে এতদূর নিয়ে এসেছে আমাদের। শেষোক্ত প্রস্তাবের প্রমাণস্বরূপ এখানে এটুকুমাত্র বলবো যে তথ্যোন্মাদনার সংক্রমণ আজ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। এটা উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে সাহিত্য, কল্পনাপ্রবণ সাহিত্য, বিজ্ঞান নয়, অর্থাৎ বিশেষ-কোনো জ্ঞান নয়; সাহিত্য-রচনার জন্য কোনো তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয় না—কিংবা, এমন-কোনো তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয় না, যা সাধারণ মানুষের অনায়ত্ত। স্পষ্টত, নতুন-কোনো খবর পাবো ব'লে আমরা কবিতা গল্প উপন্যাস পড়ি না, কেননা আমরা সকলেই জানি ওতে যে-সব খবর পাওয়া সম্ভব, তা সাধারণত আমাদের সকলেরই জানা। অবশ্য নতুন খবর আমরা পেতে না পারি তা নয়; যেমন, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প'ড়ে আমি জেনেছি যে সেকালের কলকাতার বাবুরা

পাড় ছিঁড়ে ঢাকাই ধুতি পরতেন, কিংবা চেহভ প'ড়ে জেনেছি যে সেকালের রুশদেশে বৃদ্ধ কৃষক-দম্পতী পরস্পরকে সম্বোধন করতো 'মা' এবং 'বাবা' ব'লে। এ-রকম ক্ষেত্রে আমি সাহিত্যপাঠের উপফলস্বরূপ খানিকটা ইতিহাসও জেনে গেলুম; এই ইতিহাসটা, বলা বাহুল্য, সাহিত্যের মধ্যে মুখ্য নয়, গৌণ; প্রাথমিক নয়, প্রাসঙ্গিক; সারবস্তু নয়, শুধু প্রসারের ক্ষেত্র। সাহিত্যের শরীরে—বিশেষত গল্প উপন্যাস নাটকে—ইতিহাসের অংশ কিছু-না-কিছু থাকেই, কিন্তু সেটা একেবারে বর্জন ক'রেও যে সাহিত্য হয়, শুধু তা-ই নয়, সাহিত্য-হিশেবে তার কাজ অতুলনীয়রূপে সম্পন্ন করতে পারে, গীতি-কবিতাই তার প্রমাণ। কখনো এমনও হয় যে দেশে কিংবা কালে দূরবর্তী কোনো লেখকের রচনা আমরা পড়ি—কষ্ট ক'রেও পড়ি—শুদ্ধু সেই দেশের বা কালের জীবন্ত ইতিহাস জানবার জন্য (পৃথিবীর রাশি রাশি অনুত্তম পদ্য বা গদ্য কাহিনীর সার্থকতা একবার স্বকাল পেরোলে এতেই পর্যবসিত হয়); কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমরা সাহিত্যকে খাটিয়ে নিচ্ছি ইতিহাসের কাজে, সাহিত্য আর সাহিত্য নেই আমাদের কাছে, হ'য়ে উঠেছে ছদ্মবেশী ইতিহাস। সাহিত্যের কাছে সাহিত্যের প্রার্থনা নিয়ে যখন আমরা যাই, সাহিত্যের কাছে সাহিত্যেরই ফল যখন চাই, তখন এই ইতিহাসের অংশটা অবান্তর, বড়ো জোর প্রাসঙ্গিক।

অথচ আজকের দিনের অধিকাংশ মানুষের শিক্ষা আর মানসিক অভ্যাস এইরকমই যাতে সাহিত্যের কাছে সাহিত্যের ফল চাইতে তারা ভুলেই গেছে। দৈনিকপত্র আর বটিকা-পত্রিকার সম্পাদকরা তাঁদের কোটি-কোটি ক্রেতার মনে এই ধারণা-সঞ্চারে কৃতকার্য হয়েছেন যে গুছিয়ে-লেখা খবরকেই বলে 'story'। কাহিনীরঞ্জিত তথ্য প'ড়ে-প'ড়ে এমন অভ্যেস তাদের হয়েছে যে তারা যখন খবর-কাগজের শানানো গল্প ছেড়ে বইয়ের পাতার বানানো গল্পে মন দেয়, তখনও প্রত্যাশা করে তথ্যাকীর্ণ

কাহিনী। অর্থাৎ, সাহিত্যের কাছে ইতিহাসের ফল চায় তারা। শুধু চায় না, দাবি করে। শুধু-যে বহুল তথ্যাংশ না-থাকলে সে-বই তাদের ভালো লাগে না, তা নয় ; উপরন্তু এ-ইচ্ছাও তারা ঘোষণা করে যে নতুন যত সাহিত্য জন্মাবে সবই হবে আজ-নীতির একান্ত অনুগত, আজকের এই মুহূর্তের বিবিধ ঘটনার ঈষৎ রং-ফলানো বিবরণ। স্বভাবত এবং ন্যায়ত সাহিত্যের যা কাজ নয়, সাহিত্যের কাছে সেই কাজের দাবি দিনে-দিনে প্রবল হ'য়ে উঠছে, আর সে-দাবি নিয়মিত মিটিয়েও চলেছে পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় রাশি-রাশি সাংবাদিক গল্প, সাংবাদিক নাটক এমনকি সাংবাদিক কবিতা। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সব দেশেই সাহিত্যক্ষেত্রের যশস্বী ও যশোলিপ্সুদের অনেকেই গেলো ক' বছর ধ'রে নির্ভুল নিয়মে জুগিয়ে গেছেন যুদ্ধের এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর সাহিত্যবেশী বিবৃতি। বেশভূষাটা সাধারণত অগোছালো, কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে রীতিমতো মনোরম ব'লে উচ্চশিক্ষিতের মধ্যেও অনেকের মনে আজ এ-বিভ্রম জন্মেছে যে সাহিত্য সাংবাদিকতারই নামান্তর কিংবা উচ্চ স্তর, যে সেই লেখাই ভালো যা হালখবরের হালখাতা, আর সেই লেখাই দূষ্য যাতে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কোনো উল্লেখ নেই।

সাহিত্যবেশী, কিংবা সাহিত্যের মধ্যে গ্রথিত, সাংবাদিকতা পৃথিবীতে অবশ্য নূতন নয়, বরং অত্যন্তই প্রাচীন। খবরের কাগজ যখন ছিলো না, তখনও যেহেতু খবর ছিলো, সেই খবর কোনো-না-কোনো উপায়ে লিপিবদ্ধ না-ক'রেও মানুষ পারেনি। আর পুরাকালে উপায়ের বৈচিত্র্য বেশি ছিলো না ; ছন্দোবদ্ধ কাব্যই ছিলো প্রধান বাহন, এইজন্য ছন্দোবদ্ধ যাতে পুঁথির অভাব স্মৃতি দিয়ে পুষিয়ে নেয়া যায়। মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে যেমন দর্শন, সমাজনীতি, বিবিধ বিজ্ঞান যথেচ্ছ বিক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত, তথ্যও তেমনি পর্বতপ্রমাণ ; বস্তুত, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসরূপে মহাভারতই আখ্যেয়।

একই গ্রন্থের মধ্যে কাব্য, কাহিনী ও ইতিহাসের, আর সেই সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব থেকে অশ্ববিদ্যা পর্যন্ত সর্ববিষয়ে উপদেশের অঙ্গীকরণ আজ আমাদের কাছে অচিন্ত্য ; মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবনার পর থেকে শুধু যে ছন্দোবন্ধনের আবশ্যিকতা ঘুচে গিয়ে গদ্যের প্রসার বেড়েছে, তা নয়, সাহিত্যরূপের বিভেদীকরণ এবং বিশেষীকরণও সম্ভব হয়েছে ; দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি তত্ত্ব, তথ্যে যার নির্ভর, সেগুলি সাহিত্যশরীর থেকে চ্যুত হ'য়ে স্বতন্ত্র স্থান ক'রে নিয়েছে, যার ফলে সাহিত্য বলতে আমরা আধুনিক যুগে বুঝি শুধু কল্পনাপ্রবণ রচনা, সংস্কৃত পরিভাষায় রস-সাহিত্য। বিশেষীকরণ এখানেই থামেনি ; রস-সাহিত্যের মধ্যেও ভেদ বেড়েছে, কাহিনী (মোটের উপর) বিচ্ছিন্ন হয়েছে কাব্য থেকে, আর গীতিকাব্য (বহুলত) সংগীত থেকে, আবার কাব্য আর কাহিনী উভয়েই শাখান্বিত হয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন আকার ও আকৃতি নিয়ে। কবিতা, ছোটোগল্প, নাটক, উপন্যাস, আধুনিক রস-সাহিত্যের এই সব স্থূল বিভাগের পরেও আরো বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা এনে দিয়েছে প্রবন্ধাদি উপসাহিত্য, ফরাশিরা যাকে বলে রূপ-সাহিত্য। সাহিত্যরূপের এই বিশেষীকরণ আধুনিক জগতের একটি প্রধান ঘটনা।

সাহিত্য আর সাংবাদিকতার ভেদ ভুলে যাওয়া মানেই এই বিশেষীকরণের অস্বীকরণ, মুদ্রাযন্ত্রের যথার্থ উপকর্মের প্রত্যাখ্যান। সাহিত্যরূপের বর্তমান বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োগ, আবার সেই মুদ্রাযন্ত্রের বিশ্ব-ব্যবহারের ফলেই কি বৈচিত্র্যবিলোপের আন্দোলন ? সাহিত্যে তথ্য চাই, তারিখ-মাফিক খবর-সরবরাহ চাই, এই সূত্রের একমাত্র ন্যায়সম্মত পরিণতি হ'তে পারে সাহিত্য আর ইতিহাসের পুনরঙ্গীকরণে। সেই সঙ্গে যদি মহাভারতের মতো কোনো-একটি সংশ্লেষণী জ্ঞানের প্রভাব থাকতো, কোনো সার্বভৌম বিশ্বাসের সক্রিয়তা থাকতো, তাহ'লে এর ফলে সাহিত্য অবান্তরতা-ভারাক্রান্ত আর ইতিহাস

সংশয়াচ্ছন্ন হ'লেও কোনো নৈতিক বিকৃতির আশঙ্কা থাকতো না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে-রকম কোনো সম্ভাবনা দেখি না; মানুষের বিশ্বাস আজ সার্বভৌমতা হারিয়ে নানা শিবিরে বিভক্ত, কিংবা তার জীবন্ত কোনো বিশ্বাসই নেই; তাই সাহিত্যশরীরে ইতিহাসকে গ্রথিত করতে গেলে তার ফল হবে ভিন্ন-ভিন্ন দল বা উপদলের আপন স্বার্থান্বেষী অপলাপ, কিংবা নিতান্তই সংবাদপত্রিক তথ্যপ্রলাপ। হবে কেন, তা-ই হচ্ছে।

সাহিত্যে এই ঐতিহাসিকতার আন্দোলন শুধু যে নীতিবিকারী তা নয়, তদুপরি অনর্থক। অনর্থক এইজন্য যে আন্দোলনের প্রবক্তারা লেখককে দিয়ে যা করিয়ে নিতে চাচ্ছেন, অন্য অর্থে লেখক তা না-ক'রে মোটে পারেনই না। যে-দেশের যে-সময়ে তিনি বাঁচেন, সেটা তাঁর নিশ্বাসের হাওয়া; তাঁর দেহ যেমন সেই দেশের মাটির, তাঁর মন তেমনি সেই সময়ের হাওয়ার। তাঁর রচনার বস্তু, তাঁর চিন্তার উপকরণ তাঁর মনে পৌঁছয় তাঁর জীবৎকালের পরিধি থেকেই, তাছাড়া পথ নেই। শুধু বস্তু বা বিষয় নয়, রচনার রূপ ও রীতি, অর্থাৎ তার কলাকৌশলও কালাদিষ্ট। বর্নার্ড শ শেক্সপিঅরের সমসাময়িক হ'লে অমিত্রাক্ষরে ছাড়া নাটক লিখতে জানতেন না, ব্রাউনিং তাঁর সময়কারই ফ্রান্সে জন্মালে খুব সম্ভব হতেন মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে অন্যতম অগ্রণী। তাই ব'লে এমন অনুমান অসত্য যে লেখকরা ইতিহাসের এক-একটি উপসর্গ বা কালতরঙ্গের এক-একটি বিক্ষেপ মাত্র, কেননা বিষয় তো উপকরণ, আর কলাকৌশল তো উপায়; কিন্তু উপকরণ আর উপায় অন্বিষ্ট, সুসংবদ্ধ, অর্থময় হ'য়ে উঠে একটি তৃতীয় সত্তাকে জন্ম দেয় যে-শক্তির প্রভাবে, তার উৎস লেখকের দেশকালাতীত মন। শিল্পীনামযোগ্য লেখকমাত্রেরই মন কিছু পরিমাণে দেশকালাতীত হ'তেই হবে; যাঁর মন যত মুক্ত, তিনিই, শেষ পর্যন্ত তত বড়ো লেখক। কিপলিঙের ছিলো উপকরণে অগাধ অধিকার,

কলাকৌশলে আশ্চর্য দক্ষতা, তবু তাঁর মন নিতান্তই দেশে-কালে আবদ্ধ ছিলো ব'লে লেখকহিশেবে তাঁর ক্ষুদ্রত্ব কিছুতেই ঘুচলো না। পক্ষান্তরে, তাঁরই সমসাময়িক ইএটস, যদিও কিপলিঙের তুলনায় উপকরণের পরিধি তাঁর অনেক সংকীর্ণ, কলাকৌশলেও আপাতবৈচিত্র্য ও আপাতরমণীয়তার অভাব, তবু তাঁর দেশকালাতীত মুক্ত মনের অমৃতক্ষরণে তিনি তো বৃত হলেন অমরাবতীতে।

কলাকৌশলকেই কলাকৈবল্য ব'লে গ্রহণ ক'রে ইংলণ্ডের 'নব্বুই' যুগের সমালোচনা যেমন ভুল করেছিলো, তেমনি, হয়তো তার চেয়েও মারাত্মক ভুল করছে এ-যুগের এক শ্রেণীর সমালোচনা উপকরণকেই সর্বস্ব ব'লে ভেবে। উপকরণকেই যদি ক'রে তুলি সাহিত্যবিচারের মান, অনাচার তাহ'লে অনিবার্য: তাহ'লে, অন্তত পরোক্ষে এ-কথাই বলতে হয় যে অপাঠ্য মঙ্গলকাব্য যেহেতু ইতিহাসের উপাদানে সমৃদ্ধ, তাই অশরীরী বৈষ্ণব কাব্যের চেয়ে তার প্রাধান্য বেশি, আর একই কারণে 'সংবাদপ্রভাকর' 'সন্ধ্যা-সংগীত' অপেক্ষা গরীয়ান। আবার বলি, সাহিত্যে সমসাময়িকতা চাই, এ নিয়ে আলাদা ক'রে একটা দাবি উত্থাপন করাই বাহুল্য; আর-কোনো কারণে নয়, লেখক মানুষ ব'লেই সেটা না-হ'য়েই পারে না; স্মরণীয় ও বরণীয়দের অনেকের মধ্যেই এই সমসাময়িকতা ঘননিবিড়, যদিও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সুদূরপরাহত। পোপ বা ডিকেন্সের স্বকালের স্বাক্ষর তাঁদের রচনার প্রতি পৃষ্ঠায় অঙ্কিত, কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যে ব্লেক যে আঠারো শতকের, আর হপকিন্স যে ভিক্টরীয় যুগের, তাঁদের রচনা থেকে সে-কথা আমরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি না, তথ্যহিশেবে জেনেও রীতিমতো অবাক লাগে। দান্তে, শেক্সপিঅর, রবীন্দ্রনাথ, এই সব বিশ্ববরেণ্যরা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, অর্থাৎ ঘননিবিড়রূপে সমসাময়িক ব'লে, আমাদের মনে কখনো-কখনো এ-রকম মোহসঞ্চারও সম্ভব যে সুপ্রচুর

পরিমাণে স্বকালের বিবৃতি যিনি দিয়ে যাচ্ছেন, তিনিই বড়ো লেখক। বস্তুত, অমর কবিদের অধ্যয়নের ফলে এই শিক্ষাই আমরা পাই যে সমসাময়িকতা ততক্ষণই গুণ, যতক্ষণ লেখক সেটা অতিক্রম করতে পারেন; আর যখন তিনি সমসাময়িকতাতেই আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন, তখন প্রণম্যদেরও পতন ঘটে। শুদ্ধশীলা শকুন্তলার প্রেমিক-স্বামীরূপে হারেমবিলাসী দুষ্মন্ত আমাদের আধুনিক ধারণায় অসহ্য, কিন্তু কালিদাসের যে কখনোই অসহ্য লাগেনি, সেটুকুই কালিদাসত্বে তাঁর ন্যূনতা। ইহুদি শাইলককে চরম দণ্ড দেবার পরেও শেক্সপিঅরের মনে তার জন্য কোনো বেদনাবোধ নেই, বিধবা বিনোদিনী যখন অপরাধের ভার নিয়ে হ্রস্বকেশ নতশিরে কাশীধামে নির্বাপিত হ'লো, তখন রবীন্দ্রনাথ এতটুকু করুণা করলেন না তাকে। এ-সব ক্ষেত্রে কালিদাস, শেক্সপিঅর, রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ হয়েছেন তাঁদের স্বীয় সমসাময়িকতার সীমা পেরোতে পারেননি ব'লেই। সমসাময়িকতাটাই লক্ষ্য নয়, সেটা পথ, যে-পথ চ'লে গেছে চিরন্তনের দিগন্তে, আর সে-পথে যিনি যত অগ্রসর, তিনিই তত মহান।

উল্লিখিত পতন থেকে আত্মরক্ষার জন্য আধুনিক কবিরা কেউ-কেউ সমসাময়িকের জীবন্ত রঙ্গালয় থেকে ইচ্ছা ক'রে, এমনকি চেষ্টা ক'রে অনেকটা দূরে স'রে যান, বেছে নেন প্রতীকী পন্থা, আত্মরোপণ করেন কোনো পুরাণ, রূপকথা বা দর্শনের অখণ্ড উপলব্ধির ভূমিতে। দৃষ্টান্ত আছেন ইএটস, রিলকে, এলিঅট, বর্তমান পাশ্চাত্ত্য দেশের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশীল কবিত্রয়, গদ্যলেখকদের মধ্যে ভর্জিনিয়া উলফ। সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনা ছাড়া সমসাময়িকতার আর-কোনো সংজ্ঞা যাঁদের মনে নেই, এঁদের লেখা প'ড়ে তাঁদের তো হতাশই হ'তে হবে। টেনিসনের কয়েকটি নিকৃষ্ট আর কোলরিজের দু-একটি গৌণ কবিতা, তার উপর সুইনবর্নের কয়েকটি অপ্রধান আবেগোচ্ছ্বাস—এ ছাড়া আর

কী দিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দিতে পারি ভেবেও পাই না। কেননা ইতিহাসই বলে যে ইতিহাসের বড়ো-বড়ো ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন অনেক সময় সাহিত্যের উপর কিছুই হয় না। ইংরেজি সাহিত্য থেকে দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি। ইংলণ্ডে প্লেগের মহামারী আর তৎপরবর্তী কৃষক-বিপ্লব দুটোই ঘটেছিলো চসরের জীবদ্দশায়, কিন্তু এই বহুপ্রসবী প্রতিভাবানের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে প্লেগের নামগন্ধ নেই, আর কৃষক-বিপ্লবের একটিমাত্র সকৌতুক উল্লেখ আছে। চসরের সমসাময়িক ল্যাংল্যাণ্ডের কাব্য তৎকালীন দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনায় পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সাম্প্রতিক পরিভাষায় তিনি চসরের চাইতে অনেক বেশি সমাজচেতন, কিন্তু ল্যাংল্যাণ্ডের কাব্য কি তাতে বাঁচলো? কার্যত দেখা গেলো, চসরের মধুচক্রেই ইঙ্গজন নিরবধি আনন্দে সুধাপান করলো, আর ল্যাংল্যাণ্ড আবদ্ধ হলেন পণ্ডিত মহলে, উপাধিপ্রার্থীর ক্লেশকর অধ্যয়নে, ইতিহাসের তথ্যান্বেষীর পরিশ্রমে। তারপর স্প্যানিশ আরমাডার পরাজয়ের মতো এত বড়ো একটা ঘটনাও একটি কবিতার নিমিত্ত হ'লো না, যদিও স্পেনসর আর মার্লো দুজনেই তখন বেঁচে, এলিজাবিথান গীতবিতান কলমুখর, আর ঠিক সেই সময়েই সাহিত্যক্ষেত্রে শেক্সপিঅরের আবির্ভাব। যে-সব লেখক স্বকালের আত্মাকে ধারণ করেন, তাঁদের বসবাস, মনে হয়, ঘটনার অন্তরালেই।

এই শেষের কথাটা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মতো ঘননিবিড় সমসাময়িক লেখকের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। ইএটস, এলিঅট, বা রিলকের মতো নন তিনি, সমসাময়িকের ঘটনাস্থল থেকে দূরে স'রে যাননি কখনোই; বরং তিনি সর্বত্র এবং সব সময় একটু যেন বেশি পরিমাণেই উপস্থিত। তাঁর স্বকালের ইতিহাসে এমন-কোনো তথ্যই বোধহয় নেই, তাঁর রচনাবলীর কোনো-না-কোনো পৃষ্ঠায় যার উল্লেখ না আছে। অপঘাতের আশঙ্কা যেমন ছিলো, তেমনি

তিনি জন্মেওছিলেন রক্ষাকবচ নিয়ে। সে-কবচ আর কিছুই নয়; মহাকবিদের সহজাত সংশ্লেষণশক্তি, এই সহজাত জ্ঞান যে কোনো-এক সমগ্রের অংশ ক'রে না-দেখলে সব তথ্যই অর্থহীন, খবরমাত্রেই মিথ্যা এবং ইতিহাসমাত্রেই বানানো। এ-বিষয়ে তাঁর সমধর্মী অন্যান্য কবিদের মতো, দান্তে বা শেক্সপিঅরের মতো, তিনিও তাই ইতিহাসকে বানিয়ে ছেড়েছেন সেই করুণ রঙিন পথ, যে-পথে বেরোলে চোখের তারায় অরণ্য-পর্বতের গান শোনা যায়; স্বকালকে অবলম্বন ক'রে ব্যক্ত করেছেন চিরকালকে, স্বদেশের জীবনের মধ্যে প্রকাশ করেছেন বিশ্বজীবন। মহাকবিদের সমসাময়িকতার বৈশিষ্ট্য এইখানে যে সমসাময়িক প্রসঙ্গ উপলক্ষ্য ক'রে তাঁরা যা বলেন, ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন সময়ে, কিংবা ভিন্ন দেশে ভিন্ন সময়েও তার সার্থকতা নষ্ট হয় না, যে-কোনো দেশের, যে-কোনো কালের ঘটনাবলীর সঙ্গে তা মানিয়ে যায়, ভিন্ন-ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যঞ্জনা তার বিচ্ছুরিত হয়। অর্থাৎ, মহাকবিরা আসলে যা করেন, সেটা সমসাময়িকতার সেবা নয়, চিরন্তনেরই অর্চনা।

সমসাময়িক থেকে চিরন্তনে পৌঁছবার দিগন্ত-দীর্ঘ পথে রবীন্দ্র-রথের জয়যাত্রার কাহিনী, আমার বিশ্বাস, তুলনাহীন। এ-বিষয়ে এমন অবিশ্বাস্য স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর ছিলো যে সমসাময়িককে শুধু নয়, সাময়িককেও নিশ্চিন্তে স্থান দিয়েছেন, আর তাতেও সোনা ফলিয়েছেন। শুনেছি, 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' গানটি তিনি বানিয়েছিলেন যুবরাজ জর্জের ভারত-ভ্রমণের সংবর্ধনার ছলে, আর 'সংকোচের বিহ্বলতা' শান্তিনিকেতনের সংকুচিতা ছাত্রীদের জিউ-জুৎসু শিক্ষায় উৎসাহিত করতে। কিন্তু কিসে থেকে কী হ'লো। শুধু বাংলার 'স্বদেশী' উদ্দীপনাতেই নয়, কত বিবাহে আর মৃত্যুতে, কত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ঘটনায়, কত দিক থেকে কত বিচিত্র অনুরোধরক্ষার্থে কত কবিতা, কত গান তিনি গেঁথেছেন নিছক সাময়িকতার প্ররোচনায়, শুধুমাত্র কোনো উপলক্ষ্যের ক্ষণিক

প্রয়োজনে, তার অধিকাংশই উপলক্ষ্য পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁচেছে, স্থায়ী হয়েছে সাহিত্যে। প্রণাম করি এই অসম্ভব প্রতিভাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলি যে অন্যদের প্রতিভা যেহেতু সম্ভবত সম্ভবপরতারই সীমানার মধ্যে, সেইজন্য এ-বিষয়ে তাঁকে অনুকরণ করতে যাওয়া মারাত্মক; আমাদের দু জন শক্তিশালী কবি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আর নজরুল ইসলামকে তো চোখের উপরেই কতবার দেখলাম এ-বিষয়ে রাবীন্দ্রিক হ'তে গিয়ে সাংবাদিকতায় পথ হারাতে।

সাময়িক প্রসঙ্গকে, নির্দিষ্ট ঘটনাকে কবিতাদ্বারা চিহ্নিত করাটা আসলে প্রাচীন কালের প্রচলন। যেকালে রাজাই ছিলেন কবির ভরণকর্তা, সেকালে রাজবাড়ির ক্রিয়াকর্মে শোকে উৎসবে পুরোহিতের মতো কবিরও যে কিছু করণীয় ছিলো, সেই প্রথা পাশ্চাত্ত্য দেশ মুছে ফেলেছে কিছুটা আগেই, আমরা ভুলতে-ভুলতেও আঁকড়ে ছিলাম। যে-কোনো উপলক্ষ্যে কবিরও ডাক পড়ুক, এমনকি নতুন রঙ্গালয় বা মোদকভাণ্ডারের উদ্বোধনেও, এই সামাজিক স্বীকৃতির ইচ্ছাটুকুতে দোষ নেই, কিন্তু আধুনিক জগতে সামাজিক স্বীকৃতিটা অন্যরকম হওয়াই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় মনে করি। ইংলণ্ড আজও অবশ্য একজন রাজকবিকে রেখেছে, বিগ্রহে বিবাহে অভিষেকে তাঁকে বাধ্য হ'য়েই আজ-কবি হ'তে হয়; তবে এটুকু সুবুদ্ধিও ইংরেজের হয়েছে যে অ্যালফ্রেড টেনিসনের পরে আর-কোনো মুখ্য কবিকে ঐ আসনে তারা বসায়নি। বাংলাদেশের সর্বজনীন রাজকবির যে-পদ উত্তরজীবনে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, সেটাও ঠিক কবি ব'লে পাননি, পেয়েছিলেন বিশ্ববিশ্রুত একজন ব্যক্তি ব'লে, এমন একজন ব্যক্তি যাঁর নামের সঙ্গে যে-কোনোরকম সংশ্রবই একটা বিরাট বিজ্ঞাপন। আশ্চর্য এই যে রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুণ্ডল এ-দুর্বিপাকেও তাঁকে রক্ষা করেছে, কেননা যদিও দধিমন্থনে

৩

কবিতালক্ষ্মীকে উৎপন্ন করতে তাঁর প্রতিভাও ফেল পড়েছে, তবু সিনেমাবিষয়ক গদ্য-কবিতাটিতে চিহ্নিত হয়েছে তাঁর তুলনাহীনতার অন্যতম উদাহরণ।

'তুলনাহীন' কথাটির বিশেষ একটি তাৎপর্য আছে এখানে। রবীন্দ্র-অভ্যুদয়ের পরে বহুদিন পর্যন্ত রাশি-রাশি প্রাসঙ্গিক কবিতা লিখেছেন প্রত্যেক বাঙালি কবি, তার কোনোটাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় হ'লো না, কোনো-কোনোটি এখনো কোনারকমে পাঠযোগ্য হ'লেও অধিকাংশ ধুলো হ'য়ে গেলো গত চৈত্রের ঝরা পাতার মতোই। পুরীতে গিয়ে সমুদ্রকে, দারজিলিং গিয়ে হিমালয়কে আর আগ্রা গিয়ে তাজমহলকে উদ্দেশ্য ক'রে উচ্ছ্বাস, উপরন্ত যে-কোনো ব্যক্তিগত আত্মীয়ের বা প্রখ্যাত পুরুষের মৃত্যুতে শোকগাথা—আমাদের ছেলেবেলায় এ-সব ছিলো কবিত্বের নিত্যকর্ম-পদ্ধতি। বড়ো হ'য়ে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলুম আমরাই, অন্তত এ-ধরনের কৃত্রিমতাকে তাড়িয়েছিলুম সাহিত্য থেকে। আজ নাকি সে আবার ফিরে এলো হালফ্যাশনের সাজগোজ ক'রে, আর তার যজমানি করলেন এমনও কয়েকজন যাঁরা সেই বিদ্রোহে সঙ্গী ছিলেন আমাদের! বাল্যকালে ফরমাশ পেয়েছি আত্মীয়মহলে প্রত্যেকটি বিয়েতে একটি ক'রে পদ্য লিখে দেবার, যৌবনে ফরমাশ পেয়েছি বছর-বছর সরস্বতী পুজোয় বাণী-বন্দনা রচনার, আর এ-সব ফরমাশ যখন কৌতুকাবহ ইতিকথায় পর্যবসিত হ'লো, তারও এতদিন পর আজ কিনা পাঠকদেরই বড়ো তরফ থেকে নতুন ক'রে ফরমাশ চেতিয়ে উঠলো কয়লার, কেরোসিনের, কালোবাজারের কবিতার!

বাংলা সাহিত্যের কি তবে প্রাসঙ্গিকতার দিকে, সাংবাদিকতার দিকে স্বাভাবিক একটু প্রবণতাই আছে? নাকি এটা রবীন্দ্র-প্রভাবের একটা শোকাবহ বিকৃতি? দুটোই সম্ভব; কিন্তু আরো একটা কারণ এর আছে, সেটা এই যে আমরা পরাধীন—মানে,

এতদিন ছিলুম। পরাধীন দেশেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত, পরাধীন দেশেই এ-পর্যন্ত পরিণতি। দুর্বল ও দুর্গত দেশে স্বদেশপ্রেমের আবেগপ্রাবল্য অনিবার্য, এবং দুর্বল ও দুর্গত দেশেই স্বদেশপ্রেম সহনীয়। কিপলিঙের সমালোচনা প্রসঙ্গে এলিঅট লিখেছেন যে দেশপ্রেম কখনো কবিতার বিষয় হ'তে পারে না। সত্য কথা। ইংলণ্ডের মতো প্রবল সমৃদ্ধ দেশে দেশপ্রেমের কবিতা মানেই 'রুল ব্রিটানিয়া'র দাম্ভিক চীৎকার কিংবা বড়ো জোর তার কিপলিঙীয় সংস্করণ। দেশপ্রেমের কবিতা সম্ভব হ'তে পারে শুধু দুঃস্থ পরাধীন দেশে, সম্ভব হয়েছে আয়র্ল্যাণ্ডে আর বাংলাদেশে। স্বদেশ-বন্দনার পরিমাণ বাংলা সাহিত্যে যত বহুল, আয়তনে অত বৃহত্তর ইংরেজি সাহিত্যে তার অংশ মাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। জাঁক করবার মতো কিছু নয় এটা, এটা আমাদের দুর্দশারই পরিমাপ। দেশপ্রেমের এক মুঠো উৎকৃষ্ট কবিতা রবীন্দ্রনাথ যদি দিতে পেরে থাকেন, সেই সঙ্গেই দেশ ছেয়ে গেছে সেন্টিমেন্টাল দ্বিজেন্দ্রলালে। পরাধীনতা মানুষকে হীনতাবোধে বিদ্ধ করে, আপ্লুত করে ভাবালুতায়; সে লুব্ধ হয় অতিরঞ্জনে, অতিকথনে, আত্মপ্রদর্শনে, নিজের গৌরব রটনার এতটুকু সুযোগ পেলে সেটাকে তুলোধুনো না-করা পর্যন্ত ছাড়ে না; তখন এমন কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোয় সে সর্বজীবের মাতা যে-পৃথিবী, সেই পৃথিবী ধন্য হ'লো তার মাতৃভূমির পদস্পর্শ ক'রে। অবিশ্রাম আমরা খুঁজে বেড়িয়েছি আমাদের বন্ধন-দশার দুঃখপ্রকাশের সুযোগ; ছোটো-বড়ো কোনো উপলক্ষ্যই ব্যবহার করতে ভুলিনি; সম্ভবত সেইজন্যই আমাদের দেশে প্রাসঙ্গিক, সাময়িক, বা সাংবাদিক রচনার পরিমাণ সমগ্র সাহিত্যের তুলনায় এখন পর্যন্ত অত্যধিক। রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন, তৎকালীন সম্ভ্রান্ত জীবিত কবিরা প্রত্যেকে কবিতা লিখেছেন সে-উপলক্ষ্যে—সে তো কবি-প্রশস্তি নয়, ইঙ্গ-শাসিত হ'লেও বঙ্গভূমি যে আসলে কত বড়ো,

৩

তারই গৌরব-ঘোষণার কলরব। মনের এই দুর্বলতা অবশ্য মার্জনীয়, কিন্তু রচনার দুর্বলতার তো মার্জনা নেই। আমাদের দুঃখ আমাদের তাড়না ক'রে বেড়িয়েছে চলতি মুহূর্তের ক্ষণিক আবেগ লিপিবদ্ধ করতে; সহজ উত্তেজনায় সহজে কিছু-একটা লিখে ফেলে আমাদের নিজেদের মন হালকা হয়েছে তখনকার মতো—কিন্তু সাহিত্য কি দুঃখপ্রকাশের বাহন, দুঃখলাঘবের উপায়? এইভাবে, পরাধীনতার পরোক্ষ অভিশাপে, এতদিন ধ'রে প্রচুর অপব্যয় হয়েছে আমাদের সাহিত্যশক্তির; এমনকি, এত বড়ো যে রবীন্দ্রনাথ তিনিও 'এবারে ফিরাও মোরে' না-লিখে পারেননি—দেশ পরাধীন না-হ'লে কি ও-কবিতা লিখে সময় নষ্ট করতে হ'তো তাঁকে?

কিন্তু আর কেন? আজ তো দেশে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অনেকাংশে স্থাপিত হ'লো, আমরা আত্মমর্যাদা ফিরে পেলাম; আমরা যে খুব বড়ো, খুব ভালো, কিংবা খুব দুঃখী, এ-কথা সকলকে ডেকে চেঁচিয়ে বলবার আবেগের তাড়নাটা অন্তত রইলো না। আর কেন ঘটনার বিবৃতি, রটনার অনুলিখন, উচ্ছ্বাস, সদিচ্ছা, আত্মকরুণা? চলতি মুহূর্তের ক্ষণিক আবেগকে লিপিবদ্ধ করার কর্তব্যপরায়ণতা থেকে মুক্তির সময় কি এখনো আসেনি? এই ক্ষণিক আবেগের উপলক্ষ্য যখন ছিলো পুরীর সমুদ্র কি আত্মীয়ের মৃত্যু, অর্থাৎ ব্যক্তিগত, তখন বিলাপে-প্রলাপে নিরীহতা অন্তত ছিলো, কিন্তু আত্মজীবনের বদলে যাঁরা আজ আর্ত জীবনের তথ্যানুগামী, নিজত্বকে জনতায় লীন করবার পক্ষপাতী, প্রতি মুহূর্তের ঘটনাপ্রসূত উত্তেজনার বশবর্তী হ'য়ে তাঁরা যা লিখছেন, সেটা তো শুধু সাহিত্য নিয়ে পরিহাস নয়, মানুষের দুঃখকে অপমান। তাঁরা নি-খিলপন্থী, অর্থাৎ ঘরের দরজা বন্ধ করার বিরোধী; কিন্তু বিষয়হিশেবে গণজীবনকে অবলম্বন ক'রেও তাঁরা প্রকাশ করছেন সেই ক্ষণিক, ব্যক্তিগত আবেগের বুদ্বুদ, চলতি

মুহূর্তের উত্তেজনা, ব্যক্তিগত ক্রোধ, কি ব্যক্তিগত দুঃখ; দুঃখটা কখনো-কখনো এত চড়া গলায় এত বেশি ক'রে বলা যে আমাদের মনে প'ড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অ-সাহিত্যের উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত 'দুঃখ করো অবধান, দুঃখ করো অবধান, আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান', কিংবা এমনও মনে হয় এ যেন বাংলা সাহিত্যের একদা-খ্যাত 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমে'র শোকোচ্ছ্বাসের আধুনিক প্রকরণ। প্রভেদটা শুধু এই যে উচ্ছ্বাসের উপলক্ষ্য সমুদ্রের বদলে মজদুর, মৃতা পত্নীর বদলে লক্ষ-লক্ষ মুমূর্ষু মানুষ। 'শুধু' বললাম, কিন্তু প্রভেদটা এদিক থেকে গুরুতর যে নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে ভাবালুতা শুধু কু-সাহিত্য প্রসব ক'রেই ক্ষান্ত হয়, তার বেশি ক্ষতি করে না; কিন্তু বিষয় যেখানে দেশব্যাপী ক্ষুধা, বিশ্বব্যাপী হত্যা, সেখানে ভাবালুতায় মানুষের প্রতি যে-অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, সেটা মনুষ্যত্বেরই পরিপন্থী।

প্রতিদিনের সংবাদ-জ্ঞাপন, বিবিধ তথ্যপ্রচার, বিক্ষোভ, অভিযোগ ও সদিচ্ছার বিচ্ছুরণ—এর প্রয়োজন আছে আমাদের সামাজিক-সাংসারিক জীবনে, সে-প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান নৈপুণ্যে পূরণ করুক সংবাদপত্র আর সাংবাদিক পত্রিকা ও পুস্তিকাবলী। সাহিত্য আর সাংবাদিকতা যে ভিন্ন, ভিন্ন জগতের, জীবনের ভিন্ন মহলের অধিবাসী, এ-কথার সক্রিয় স্বীকৃতি রাষ্ট্রিক স্বাধিকার-প্রাপ্তির পরেও দেখা দেবে না, আমাদের জীবন থেকে, অতএব সাহিত্য থেকে, ভাবালুতার বিলুপ্তি এখনো ঘটবে না, এ-কথা মেনে নিতে হ'লে যত বড়ো হতাশাকে প্রশ্রয় দিতে হয়, তাতে প্রাণধারণ অসম্ভব। সেইজন্য আশা করি এ-চৈতন্য আমাদের হবে যে ঘরের দরজা নি-খিল ক'রে দিলেই নিখিলমিলন ঘটে না, বরং উল্টো, অর্থাৎ নিজের ঘরে, নিজের মনের মধ্যে ছাড়া বিশ্বকে উপলব্ধি করার আর উপায় নেই। ঠিক ততটুকুই আমরা উচ্চারণের অধিকারী, যতটুকু আমাদের উপলব্ধি, আর অধিকার

অতিক্রম করবার প্রলোভন ত্যাগ করতে-করতেই উপলব্ধির পরিধি বাড়ে। ক্ষণিক আবেগকে, চলতি ঘটনার উত্তেজনাকে তখন-তখন প্রকাশ ক'রে ফেলে হাতে-হাতে নগদ-বিদায় যদি না চাই, যদি উপলব্ধির জন্য অপেক্ষা করতে শিখি, তাহ'লেই আমরা পারবো সমসাময়িককে অবলম্বন ক'রে চিরন্তনে পৌঁছতে, ঘটনাকে, তথ্যকে, বস্তুকে কোনো-এক সমগ্রের অংশরূপে দেখতে, তার চরম তাৎপর্য বুঝতে। অপেক্ষায় যিনি অক্ষম, উপলব্ধি যাঁর অনায়ত্ত, যাঁর পরিশ্রম পর্যবসিত শুধু ইতিহাসের উপকরণের স্তূপীকরণে, তিনি মূল্যবান সমাজ-সেবক হ'তে পারেন, কিন্তু তিনি যে সাহিত্য-শিল্পী নন, যুদ্ধকালীন বাংলাদেশে এই সত্যকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো যে-আত্মকরুণায় আসক্তি, তার অবসান হোক, চিন্তা মুক্ত হোক, আমাদের সাহিত্য আজ সাবালক হোক।

কয়েকটি কবিতা : রাইনের মারিয়া রিলকে

নিঃসঙ্গ

বরঞ্চ, অহল্যাচিত্ত রূপান্তরে হোক্ ঊর্ধ্বে পাষাণ-দেউল ;
আমি রই খিলানের আলম্বিত শূন্যাবর্তে খোদাই কিন্নর,
যে শূন্যে কিছুই নেই, যেখানে বিরাজে শুধু প্রহর প্রহর
যন্ত্রণাই, ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্, শুধু পৃথিবী পৃথুল ;

কেবল অণিমা সেথা মহিমায় দিশাহারা, বিরাটে বিলীন,
যে বিরাট দিনরাত্রি আলোঅন্ধকারে নিত্য দুহাত বাড়ায় ;
কেবল চরম এক বিদায়-মন্থর মুখ, শেষ আকাঙ্ক্ষায়
সত্তার দুর্দম্যবাক্ সমুদ্রের ঢেউ-এ ঢেউ-এ ত্রিকাল-মসৃণ ;

কেবল নিছক এক পাথরের মুখ, তবু আন্তর আভাস
স্বত মাধ্যাকর্ষে মানে স্বপ্রতিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ সুষমাগম্ভীর ;—
সে মৃদঙ্গে, করতালে যেই শূন্য মহাকাল বিস্তৃত আকাশ
নীরবে আঘাত হানে, হর্ষে হর্ষে বেজে ওঠে কোনার্কমন্দির।

হৃদয়ের পর্বতে পর্বতে

হৃদয়ের পর্বতে পর্বতে অগুণ্ঠিত। দেখ, ঐ কতটুকু
ঐ দেখ শব্দের ও শেষ গ্রাম, আর, আরো উঁচু
কিন্তু কতো ছোটো, তবু আছে তো রয়েছে এখানেও
আবেগের গোলাবাড়ী। দেখতে কি পাও ?
হৃদয়ের পর্বতশিখরে অগুণ্ঠিত। নিছক পাথর কালো রুখু
আমাদের মুঠির তলায়। তবুও এখানে
কি যেন ফুটেছে দেখ, নীরব খাড়াই থেকে
করবী যে ফুলে ফুলে হাওয়ায় ছড়ায় গান নিজেরই অজ্ঞাতে।

আর যে জ্ঞানী, সে ? আহা জ্ঞানের উৎরাই থেকে
এখন সে নির্বাকে আগত, অগুণ্ঠিত হৃদয়ের পর্বতশিখরে।

এখানে তো ঘোরে ফেরে সম্পূর্ণ চেতন
অনেক প্রাণীই, বহু পার্বত্য পশুই ঘোরে, অভ্রান্তচরণ
কখনও বা থেমে থেমে, কখনও উধাও। আর গুহাহিত অতিকায় পাখী
ওড়ে শুচি সুদুর্গম চূড়া ঘিরে ঘিরে ওড়ে—নয় আর
গোপন সে, এইখানে হৃদয়ের উত্তুঙ্গ পাহাড়ে।

বিশ্ব ছিল

বিশ্ব ছিল প্রিয়ার আননে—
কে যেন সে ঢেলে দিলে সহসা উজাড়ি
বাহিরে এসেছে বিশ্ব, বুঝি না এখন।

কেন পান করি নিকো, তখনই নিই নি তুলে
সে সমগ্র থেকে, সেই প্রিয় চোখ মুখ নাক ললাট চিবুক থেকে
বিশ্ব সেই, এতোই নিকটে, আমার অধরে তার সুরভি কপোলে ?

করেছি করেছি পান অতর্পিত তৃষ্ণাভরে পান
কিন্তু আমারই বিশ্বে আমি যে ছিলুম পূর্ণ বিশ্বম্ভর
তাই তো পানের ভারে নিজেরই উপরে পড়ি, নিজেরই প্রয়াণ।

পরিবর্তনীয়তা

মুহূর্তেরা উড়ন্ত বালুকা। শান্ত অন্তহীন অদৃশ্যে পালায়
উত্তোলিত কণ্ঠস্বরে করপুটে মাঙ্গলিকে রচিত প্রাসাদ।
জীবনের হাওয়া বয় সর্বদাই। এলোমেলো মতিচ্ছন্নতায়
আকাশে আঙুল তুলে রিক্ত যতো স্তম্ভগুলি, শূন্য, শূন্যছাদ।

তবু ক্ষয় : ক্ষয়ে কি যথার্থ কিছু আরো আছে যন্ত্রণানিবিড়,
সে কি শুধু ফোয়ারার নিজেরই ছিটানো ডোরে প্রত্যাবর্ত নয় ?
পরিবর্তনীয়তার দাঁতের পংক্তির মধ্যে এসো বাঁধি নীড়,
পাক্ পাক্ আমাদের পূর্ণস্বাদ সে তাড়কা রোমন্থ-তন্ময়।

তবু বারম্বার

তবু বারম্বার, প্রেমের নিসর্গদৃশ্য আমাদের খুবই চেনা,
করুণ নামের স্মৃতিবহ ছোটো মঠের আঙিনা
আর সেই ভয়ঙ্কর স্তব্ধ খদ যেইখানে আর সব শেষ—
সেইখানে বারম্বার আমরা একত্রে দোঁহে যাই
প্রাচীন কদম্বছায়ে, আমাদের শয়ন বিছাই
রক্তকরবীতে, দোঁহে আকাশের মুখোমুখি থাকি নির্নিমেষ।

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

ভিনাসের জন্ম

ভোরের আগে সেই রাত্রি ছিলো ভীষণ
রাত কেটে গেলো ছটফট ক'রে, হৈ-চৈ হুল্লোড়ে,
উল্লোল সমুদ্র খুলে গেলো আবার,
যেন ফেটে গিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো,
আর সেই চীৎকার যখন ভাটার টানে আস্তে এলো বুজে
আর আকাশে দিনের ম্লান উন্মেষ আর আলোর আরম্ভ
থেকে ফিরে এসে
আবার ডুবতে লাগলো বোবা মাছের অন্ধকারে—
সমুদ্র জন্ম দিলো।

তার নিশ্বাসের সমস্ত শক্তি দিয়ে তীব্র আঘাত করলো
নূতন স্তন দুটিতে,
ভ'রে তুললো তাদের, নিজেকে ভ'রে দিলো জোর ক'রে
তাদের মধ্যে,
আর তারা
দিগন্তে-ভ'রে-ওঠা ভরা পালের মতো
হালকা মেয়েটিকে তীরে নিয়ে এলো ঠেলে।

এমনি ক'রে দেবী মাটিতে নামলেন।

দেবী চললেন তারুণ্যের তীর দ্রুত ত্যাগ ক'রে,
আর তাঁর পিছনে
সমস্ত সকাল ভ'রে ফুটে-ফুটে উঠতে লাগলো
ফুল আর ঘাস, উষ্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত,
যেন আলিঙ্গন থেকে উঠে-আসা। দেবী চললেন কখনো হেঁটে,
কখনো ছুটে।

কিন্তু দুপুরের পরে, বেলা যখন সবচেয়ে ভারি,
আরো একবার সমুদ্র ফুলে উঠে
ছুঁড়ে ফেললো ঠিক একই জায়গায় একটা শুশুক,
মরা, ছেঁড়া, লাল।

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

লেস্‌বিয়া

বাণী রায়

কোথায় প্রেমিক তুমি ?
কই প্রিয়তম ?
স্বপ্নের প্রাসাদ 'পরে
ক্লান্ত কণ্ঠস্বরে
শুনি যেন অবিরাম কবিতার পাঠ ;
শুনি যেন অবসন্ন বৈশাখ-আকাশে
বিস্মৃত সে-হাসি আজি ইসারায় ভাসে।

দূর কোন্ নগরীর সাজানো ছোট্ট ফ্ল্যাটে,
('কপোত কপোতী যথা'—)
স্বচ্ছ-শ্বেত পেয়ালায় সোনালী পানীয় ঢেলে দেয়
যে-নারী তোমারে আজ হাসিমুখে—
নহি আমি সেই।
কর্ম্ম-অবসাদ-ম্লান তুমি ফিরে এলে
যে তোমারে ভালবাসে—
সে তো আমি নই।

আরো জানি,
রজনীর তন্দ্রাতুর যামে
ব্যাকুল বাহুতে তুমি যারে খুঁজে মরো—
যার লাগি ওষ্ঠে ফোটে সাগ্রহ চুম্বন,
সকল সত্তার মাঝে যারে তুমি চাও—
—সে-নারী সে-জন নয়।

কৃষ্ণচূড়া রক্তরঙে
আজিও সাজায় দেখি দুই ধারে পথ,
আজও বহে তপ্ত বায়ু দিবসের শেষে
শীত-স্পর্শ নিয়ে।
ডালে ডালে বসন্তের বিদায়-বিলাপ
ফুল হয়ে যায় ঝ'রে
পীচ-ঢালা পথে।
মনে পড়ে,
বহুদিন, বহুদিন আগে
একদিন নিত্য তুমি আসিতে অতিথি।
সকল দিবস মম
পুষ্পমধু সম
বিকচ লাবণ্যে ছিল ভরপুর।
ফিরে আসে সেইদিন, ভুলে-থাকা সুর।
আজ এই রৌদ্র-দগ্ধ নিদাঘ-প্রহরে
এ-মনের কোণে কোণে বেদনার রেশ ;
আজ এই বসন্তের বিকালবেলায়
সে-প্রতীক্ষা, জানি বন্ধু, হয়ে গেছে শেষ।

চিঠি, শুধু তুচ্ছ চিঠি আছে আজ জমা ;
ভুলে তো ছিলাম আমি অস্তিত্ব তাদের,
সহসা শিথিল দিনে দীর্ঘ নিরালায়
জাগালো, জাগালো স্মৃতি,
জাগালো তোমায়।
অধীর অধর তব আনন্দে উৎসুক,
উদ্দীপ্ত প্রেমের দৃষ্টি আদরের আকাঙ্ক্ষায় দ্রব,

তরুণ মসৃণ দেহ ছুরির ফলক
সিগারেট ধূম্রজালে সমাহিত মুখ।
মনে পড়ে দুজনের কাব্যপাঠ, সমস্ত জগৎ
স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষায় গৃহের বাহিরে।

মনে ভাবি,
কাকপক্ষ কেশ সেই আজও কি বাতাসে এলোমেলো
প্রশান্ত ললাটে ঝরে ?
দেশলাই-আলো লেগে জ্ব'লে ওঠে হীরে
আজও, প্রিয়, আঙুলে তোমার ?
ভুলে গেছি কণ্ঠস্বর, তবু কানে ভাসে—
'লেস্‌বিয়া! শোনো, প্রেম জীবনে মিলাও।'

শুনিয়াছি। বুঝেছি যে কী গান তোমার,
বিদেশী ভাষায় চির জন্মের বারতা,
দেশ-কাল-পাত্রাভেদে সেই এক সুর,—
সহস্র ক্যাটিউলাস্‌, শত লেস্‌বিয়া!

বেহাগ

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

শীত-সন্ধ্যার লজ্জানত নক্ষত্রের দরোজা খুলে,
নেমে এসেছে থম্‌থমে অন্ধকার
দূর্বাঘাসের উপবাসশীর্ণ হলুদ নদীতে তার এলোচুল ছড়িয়ে,
পাশে মহানিমগাছটায় রহস্যময় স্তব্ধতা।

রান্নাঘরে জ্বলছিল তেলের কুপিটা।
ঝিল্লীঝংকৃত কোণ থেকে রান্নাব্যস্ত তুমি উঠে এসে
তোমার চোখের কালোতে আমার চোখ ডুবিয়ে দিলে;
তোমার শান্ত অন্তরতম রাত্রিশেষ আমার পৃথিবীতে হেলান
দিলো
আর অনেক দূর থেকে গানশেষের রেশের মতো মীড় কাঁপলো
—'তোমাকে ভুলবো না কোনোদিনই'।
কেঁপে উঠলো স্তব্ধ রান্নাঘরের রহস্যময়ী মেয়ে।
সে-মুহূর্তে আমার আমি
মিলিয়ে গেল তোমার নিঃসীম নীরবতায়।
আমার অস্পষ্ট মূর্তিতে কেরোসিন আলোর ম্লান ছায়া
হারিয়ে-যাওয়া ক্ষণিকের দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁপছিলো।
স্তব্ধ ছিলাম আমি,
গানশেষের নিস্তব্ধতা ভেঙে যাবে ব'লে,
আমার এতদিনের একান্ত বেদনার সাধনায় মনে হ'ল
এই কি জন্মজন্মান্তরের চিরতুমি?
পৃথিবীর কেরোসিন আলোর আবছা রান্নাঘরে
সংসারের অসংখ্যতা আছে জানি—
তবু আমি আছি আরো অত্যন্ত ক'রে সেই রান্নাঘরে
তেলের কুপিটার পাশে।

তুমি উঠে গেলে আবার রান্নাব্যস্ততায়।
ভাব নয়, চিন্তা নয়, কী এক অন্তহীন অনুভূতি
নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রবেলায় সেই প্রথম নাম ধ'রে ডাকার মতো।

আমার বেদনা-ধূসর মুখে
সন্ধ্যাবেলার জীর্ণ উত্তরীয়খানি লবণ-নিশ্বাসে ভারি হ'য়ে আসে,
পৃথিবীর মহানিমগাছটায় রহস্যময় স্তব্ধতা।
রাত্রিশেষের ক্লান্তির মতো চোখ বুজে থাকি,—
আমার শান্ত অন্তরতম অন্তহীন অস্তিত্ব ঘিরে
কেমন-যেন তুমি-তুমি-ভরা চিরদিনের গন্ধ।

সনেট

অরুণকুমার সরকার

কেটেছে সমস্ত দিন অনাত্মীয় রুক্ষ পরিবেশে
হে রাত্রি, মিনতি শোনো, মিত্র হও, কটাক্ষ হেনো না।
ঘুম, শুধু ঘুম দাও, নিয়ে যাও সেই নিরুদ্দেশে
যেখানে স্মৃতির শব অন্ধকারে আগাগোড়া বোনা
স্থূল আস্তরণে ঢাকা ; দুপুরের দিঘির মতন
আমার সমগ্র সত্তা মৃত্যুমগ্ন নিঃস্পন্দ নির্বাক :
নেই, নেই, কিছু নেই, নেই, নেই এই দেহ মন,
প্রত্যহের ভ্রূকুঞ্চন, নিরানন্দ কুকুরের ডাক
আর দূর আকাঙ্ক্ষার বক্ররেখা অপ্রতিভ নদী।
স্বপনের সরোবরে বিকশিত শ্বেত শতদল
দূরে থাক, প'ড়ে থাক। স্মৃতিহর ঘুম পাই যদি
ভেসে যাই, ডুবে যাই, মুছে যাই অগাধ অতল।
হে রাত্রি, মিনতি শোনো, প্রিয়তম, অনুকম্পা করো,
বিনত শরণাগত থরোথরো দেহ তুলে ধরো।

আঁখির স্মৃতি

শক্তি মুখোপাধ্যায়

বিরহিণী, তব অবগুণ্ঠনে
যে-আঁখি-সূর্য জ্বলে
তার বহ্নির শিখা
চলে গেল যবে দূর দিগন্তে
আঁখির অন্তরালে,

শুভ্র ব্যথার অশ্রুর মন্থনে
ধূ ধূ প্রান্তর তলে
বেদনাদীপ্ত টীকা
এঁকে দিয়ে গেল মহান্ সত্যে
মম রক্তিম ভালে।

সেদিনের গান
হোলো যবে ম্লান
অস্ত-সাগর তীরে,
একটি তারারে
দেখি চোখ ভ'রে
অনেক চাঁদের ভিড়ে।

সে-তারা আমার সখীর আঁখির স্মৃতি,
সে-তারা আমার আপন গোপন গীতি।

প্রশ্ন : কৃষ্ণাকে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণা ! তোমার চোখে সমুদ্রের অসহ্য জোয়ার
একূল-ওকূল ভাঙা ঢেউয়েদের স্বপ্নের সীমায়
আহত আবর্ত ঘিরে নিয়ে এলো এ কোন সম্পদ ?
আমার হৃদয় তাই আশায় আঁধারে তোলপাড় !

কৃষ্ণা ! তোমার চোখে বালুতটে খেয়েছি আছাড়,
অথবা আমারে তুমি ঢেকে দিলে এ-কোন মায়ায় ?
দু'চোখ ভরেছে জলে : প্রেম কিংবা স্তব্ধ সর্বনাশ ?
প্রশ্ন জাগে, অর্থ বুঝি, ব্যর্থতার কিংবা দুরাশার।

জানি ঢেউ স'রে স'রে, দূরে বহুদূরে চ'লে যায় ;
বালুতট আরবার ফিরে আসে রক্তাক্ত আঁধারে,
সূর্যাস্তের দগ্ধ সঙ্গী !...তবু চোখ দেখেছি তোমার,
দেখেছি মাতাল ঝড় ; মন মোর তাই শান্তি চায়।

কৃষ্ণা ! তোমার চোখে এবার কি এলো অন্ধকার ?...
তাই ভালো ! বালুতটে সমুদ্র কি কখনো হারায় !

ভয়

অরুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

যখনি আঁধার আসে জীবনের প্রত্যন্ত সীমায়
যখনি সংশয়বেগে শঙ্কাকুল হ'য়ে ওঠে প্রাণ
যখনি সমাজে রাষ্ট্রে ভাঙনের রব শোনা যায়
তখনি আমার কাব্যে প্রাণলক্ষ্মী হ'ল ম্রিয়মাণ।
জানি সে-কাব্যের মাঝে রহিবে না মূর্ত্তিমতী প্রেম,
তোমার তনুর স্বর্গ, হৃদয়ের অফুরন্ত দান ;
ভুলে যেতে হবে তব অনুপম স্নিগ্ধ কান্তি হেম
যা নিয়ে নিবিড় মোর প্রত্যহের প্রেরণার গান।
যদি তা মুছিয়া যায় ক্ষান্ত হবে লেখনী আমার
শান্ত হবে চিরতরে নিন্দুকের বিকৃত প্রলাপ
সমগ্র বিপদ মাঝে ঘনতর হবে যে আঁধার
বাঁচার সুন্দর পথে বিধাতার তীব্র অভিশাপ।
সত্যি কি ভুলিতে হবে তোমাকে জীবনে, অনুপমা,
তখন দুঃখের রাতে অন্তরীক্ষে করিবে কি ক্ষমা ?

তুমি মোর সর্বনাশ

অশোক মিত্র

তুমি মোর সর্বনাশ :
অগ্নির অক্ষরে
এই কথা লিখে যায় গ্রীষ্মের বাতাস
দ্বিপ্রহর আলোড়িত ক'রে।
তুমি শুধু সর্বনাশ, হে প্রেমিকা,
রূঢ় বিভীষিকা
রূপ নেয় তোমাতেই শীতের কবরী ঘিরে
(বরফের মতো তার তনু)।
বর্ষামুক্ত আকাশের স্নিগ্ধ রামধনু
গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যায় আবেগের ভিড়ে
মুখোমুখি আশ্লেষের হ'লে পরিচয়।
তোমার প্রণয়
পৃথিবীকে ক্রমাগত মৃত্যুগত করে।
শ্রাবণের কামনার গহন অন্তরে
যেই তুমি এঁকে যাও চটুল প্রবেশ,
যাত্রা থেমে যায়
তন্ত্রীশিরা 'পরে ঝরে অবশ আবেশ।
ফাল্গুনের দিকে যেই চাও, বসন্ত-বিদায়
সে-মুহূর্তে নিরূপিত হয়,
সহস্র রাত্রির
অবসাদক্লিন্ন অনুনয়
বিস্মৃতির গুহাপটে শুরু করে শান্তির সন্ধান।

শিশির, রূপালি রোদ,
টলমলে ভরা-নদী জীবনের গান,
সব তুমি দুঃস্বপ্নের আলিঙ্গনে করো অবরোধ।
তোমার চুম্বন
কী উজ্জ্বল অন্ধকারে ঢেকে ফেলে দিন,
তোমার ক্রন্দন
জীবনকে ক'রে দেয় কৃষ্ণস্রাব প্রবাহে বিলীন।
অনুরাগে, হাহাকারে
কল্পনাকে অবিশ্রান্ত তমসার পারে
টেনে তুমি নিয়ে যাও—
তোমার প্রকোপে, প্রিয়া, প্রেরণা উধাও।

তুমি মোর সর্বনাশ :
তুমি মোর দীর্ঘশ্বাস।

আকাশ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সারা দিন পাইনে সময়।
সকাল থেকেই শুরু ব্যতিব্যস্ত কঠিন প্রহর।
বিস্তীর্ণ সংসারময়
কোথাও সবুজ নেই, শুধু শাদা জমাট পাথর।
প্রত্যেক নিমেষে
দৈনন্দিন স্রোতে দিশেহারা ;
পদক্ষেপ ফেলি দূর অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে।

কোথা দিয়ে কাটে যে সময়।
প্রহরেরা একে-একে অপগত হয়।
সকলের সূর্য্যালোক বিকেলে সুদীর্ঘ ছায়া মেলে
জাদুদণ্ড দিয়ে যেন তার
পশ্চিম দিগন্তপারে দেয় শেষ স্বর্ণরশ্মি জ্বেলে,
তারপর নামে অন্ধকার।

অন্ধকার ঘন হ'লে বারান্দায় বসে' মাঝরাতে
ছুইটি ছাদের ফাঁকে দেখি দূর আকাশের ফালি ;
দিনের রোদ্দুরে পুড়ে থাক্,
তাপিত হৃদয় নিয়ে ধরা দিয়ে আকাশের হাতে
আশ্চর্য্য অনেক স্মৃতি মনে পড়ে খালি।
সারাদিন ব্যতিব্যস্ত ; পুড়ে থাক্ সমস্ত সংসার
তারপর রাত এলে স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে
এ-আকাশ আমার আপন।

কলিকা ✓

নরেশ গুহ

কলিকাকে কেউ ভাবো যদি ফুল
তোমাদেরি ভুল, তোমাদেরি ভুল।
পাখির ডিমকে পাখি ?
লজ্জায় আমি মুখ নিচু ক'রে থাকি।
ভুলো না, ভুলো না এখনো সে শুধু কলি
যতো বিরক্ত মৌমাছিদের বলি।
একদিন হবে টুকটুকে ফুল লাল
ভ'রে দেবে মধু গন্ধে এক সকাল,
হাওয়া দোলা দেবে তারে ;
তখন সে, জেনো, হাসির ঝলকে, একটি মাত্র
চোখের পলকে,
স্বর্গ মর্ত্য এবং পাতাল জয় ক'রে নিতে পারে।
আজ সে কলিকা কুণ্ঠিত পল্লবে,
তারো একদিন ভোর হবে, ভোর হবে,
হাত তুলে বিস্ময়ে,
বলবে সবাই—সেই কলি এই ফুল ?
এই সেই মেয়ে ছিল যার এলো চুল
লুকিয়ে বেড়াতো সংকোচে, লাজে, ভয়ে ?

হাওয়া দেয়, হাওয়া দেয়

বুদ্ধদেব বসু

দশখানা খাতা ভরেছি গদ্যে-পদ্যে
দশ থেকে বারো-তেরো বছরের মধ্যে।
গ্রীষ্মমদির দুপুরের নিঃসঙ্গ
অবসরে কত অবোধ নীরব রঙ্গ।
হাওয়া দেয়, হাওয়া দেয়।
সতেরো বছরে পা দিয়ে ভেবেছি
কী ছেলেমানুষি হায় রে!

ত্বরিতে ছড়ালো অধীর মুদ্রাযন্ত্র
পূর্বতিরিশে পঞ্চাশোর্ধ্ব গ্রন্থ।
শত রাত্রির অনিদ্রা দিলো আকুলি'
আমার বুকের সুখের পাখির কাকলি।
হাওয়া দেয়, হাওয়া দেয়।
আজ মৃদু হেসে ভাবি ব'সে-ব'সে
কী ছেলেমানুষি হায় রে।

মায়াবী টেবিলে কুটিল কঠিন হীরকে
মনে হয় আজ চোখে-চোখে দেখি চিরকে;
বিন্দু-বিন্দু নিঙাড়ি' মনের মজ্জা
অচেতনে চাই পরাতে চেতন সজ্জা।
—আরো দেয়, হাওয়া দেয়।
পঞ্চাশে এসে বলবো কি শেষে
কী ছেলেমানুষি হায় রে।

আজীবন অফুরন্ত মনের ব্যঞ্জনা,
আযোজন পরিমার্জনা, পুন মার্জনা।
অবশেষে ঠিক মৃত্যুর আগে, সত্য
যদি জেনে যাই কীর্তির অমরত্ব—
তবু দেয়, হাওয়া দেয়,
তালে দিয়ে তাল তবু হাসে কাল—
'কী ছেলেমানুষি হায় রে!'

ডায়েরি

অমিয় চক্রবর্তী

(এক)

ভুল যদি ক'রে থাকি ক্ষমা তো পাবোই
এই জন্মে হোলো না সময় জানাবার
কতটুকু কী পেয়েছি অসীম অনন্ত মূল্য দিয়ে।
হারিয়েছি পথ তবু যা দেখেছি তাও মিথ্যে নয়,
শুধু ঘোরা বেশি হল, দেরি হল এই খেদ।

ভেবেছি কবিতা লিখে দিনলিপি ডায়েরিতে রোজ
নির্জনে শুনিয়ে যাব ছন্দে বেঁধে একান্ত অন্তরে,
ধূলো হাওয়া পৃথিবীতে নীলান্তিক আমার স্বাক্ষর ;
সহজ নিগূঢ় কথা রেখে যাব এই জীবনের,
যা হয়েছে, ছেলেবেলা থেকে মূলরেখা
উঁচু নীচু কোন্‌খান দিয়ে
পৌঁছল ঘটনা আর মনের ভাবনা যত মিলে ;
যতদূর যা বুঝেছি, তাই বলে যাই।
একেবারে সবই বলব আলোর দিনের তলে,
সুন্দর রাত্রির স্নিগ্ধতায়,
জীবনের ভুলভ্রান্তি তাই নিয়ে বাক্য পরিক্রমা।
সংসার পড়ুক্ এই জীবনীকে ক্ষমা ক'রে,
ক্ষমা সে তো পূর্ণ জানা।

কিন্তু দেখি বল্‌বার শুভ্র ভাষা আজো নেই মনে,
শিশুকালে যে-বেদনা পাখীর ডাকের সঙ্গে মিশে
ঘরের নিবিড় কোনো ক্ষুদ্র ঘটনার গাঁথা জালে

স্মৃতির ভিতরে পাই, সূক্ষ্ম মাত্রা তার
কলমে আসে না, নেই সমস্তটা বলারও সাহস।
অন্যের জীবনী সূত্র আমার প্রাণের শিল্পে লাগা
যে-ছবি সম্পূর্ণ করে, তার সব কথা
স্পষ্ট বলবার স্বচ্ছ মন কৈ।
ছুচারটে খণ্ড মুগ্ধ বাগানের আলোর বিভ্রমে
হঠাৎ সম্পূর্ণ পাওয়া অমরাবতীর স্পর্শ শ্বাস,
বই-পড়া, স্বপ্ন-দেখা, শিউলি ফুলের গন্ধ-মেশা
তারই প্রাথমিক রূপ রেখে যাব।

কৈশোর যৌবনে এসে হঠাৎ যে কোটি আলো নিয়ে
পুড়ে জ্বলে হোমানলে জাগ্রত বিশ্বের কাছে আসা,—
সেইদিন স্বর্গীয় বিরাগে
মাধুরীর দীক্ষা নিল অনন্তের জীবনসঙ্গিনী।
সে বেদনা জানাবার স্বচ্ছ বিকশিত মন কোথা,
আনন্দের উজ্জ্বল তুলিকা ?
আজো সেই পথে আছি প্রেমের প্রাণের পথগামী
ভ্রান্ত মুগ্ধ যাত্রী আমি, কখনো অধ্যাত্ম দৃষ্টি পাই,
হারাই, আবার জাগি, বারবার অপূর্ব জীবনে
আমার চৈতন্যে নেমে এল
এ বিশ্বের ক্রন্দসীর পালা।
ঘরে আজ সংসারের সুন্দর জ্বলেছে প্রদীপ,
বাড়িতে আমার ফুল, প্রসন্ন আপন পরিবেশ,
কৃতজ্ঞ অন্তরে তবু জ্বলে দাহ
মৃত্যুময় সংঘাতী লোকালয়ে,
অসাম্যের নির্মম হন্তায়।

আত্মপরীক্ষার দীক্ষা নিয়ে
আমার চিত্তের কালি আজো পোড়ে কয়লার অঙ্গার,
অসমাপ্ত ব্রততী জীবনে।
সব নিয়ে প্রাণনের ঐক্যবোধ সৃষ্টির ভাষায়
প্রদীপ্ত কখন্ হবে, রশ্মিপথে চেয়ে
মুক্ত শতদল পথ তারি খুঁজি প্রকাশ পূর্ণিমা।
আনন্দের অশ্রুজলে দোলে তার অনিন্দ্য স্বরূপ
মর্ত্যের ধেয়ানে তবু পৌছতে পারি না শুভ্রতায়,
গীতিকাব্যে ছিন্ন পাপড়ি হাতে আসে, সম্পূর্ণের ছবি
ভাষাহারা বোবা বুকে দেখা দিয়ে মিলায় আবার।

যে-তুমি আমার প্রাণে বহুদিন পথ দেখিয়েছ,
তুমি আজ বেদনায় আরো কাছে থাকো জীবনের,
ডায়েরিতে রেখে যাই তোমাকেই আহ্বানের স্তব,
দেখা দিয়ে, চলে গিয়ে, পাশে চলে দুপুরে সন্ধ্যায়,
তুমি দাও মন্ত্র পূজারীকে।
আর যত ভুল করি, তোমার পূজায়
সব ভুল ভুলে গিয়ে তবু জানো তোমার ভক্তের
জীবনপ্রদীপ জ্বলেছিল;
সেখানে তাপের দাহ, পাপের চিহ্ন তো রবে না,
তুমিই আমাকে ভাষা দাও।
জীবনগেহিনী,
সে-ভাষা কথায় নয়, জীবনের রক্তে রক্তে ভাষা ;
আমার বুকের স্পন্দে সেই ভাষা সত্য হোক্, স্বচ্ছ হোক্।
আজো যদি ভুল করি, তারো উর্ধ্বে উঠবই,
সেই সত্যতম সেই তোমারি সঙ্গমে পাওয়া ভাষা

লক্ষ্যহীন দিগন্তের জলন্ত প্রযানী পথে চলে
যেখানে কোনোই মিথ্যা নেই।
তুমিই বিশ্বাস রেখো, তুমি এই দগ্ধ প্রাণটাকে
জ্বালিয়ো, আরোই দুঃখ দিয়ো তাকে, তুমি
জাগ্রত মানবদাহে বিশ্ব যজ্ঞলোকে
ডেকে নাও ;
যতক্ষণ পূর্ণরূপ উদ্‌ঘাটিত না হয়, ততক্ষণ
তোমাকেই নিবেদিত এই এক জীবন ছেড়ো না।
তাকে লজ্জা দিয়ো, তাকে ক্ষমাহীন সত্য দিয়ো,
মনে মনে যদি তাকে ক্ষমা করো তাও কোরো,
—তার দাবি কী সাহসে চাব।
ডায়েরিতে এত লিখি তবু শুধু লেখাই হোলো না,
তুমি কে, তোমার সঙ্গে জীবনে কী সম্বন্ধ আমার,
অনন্ত প্রাণের পথে লক্ষ্মী সরস্বতী বলি যাকে
পূজা করি আনন্দের পুণ্যতম চৈতন্যের দিনে,
পূজা ক'রে চলে যাই নিত্য বেদনার মৃত্যুপারে॥

(দুই)

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জ্বলে রাতে,
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে নদীর আঘাতে।
দুঃখের আবর্তে নৌকো ডোবে, ঝড় নামে,
নূতন প্রাণের বার্তা জাগে গ্রামে গ্রামে—

নীলান্ত আকাশে শেষ পাইনি কখনো
আমি যেন বলি, আর, তুমি যেন শোনো।

তুমি যেন বলো, আর আমি যেন শুনি
প্রহরে প্রহরে যায় কল্পজাল বুনি।
কুমুদকহ্লার ভাসে থৈ থৈ জলে
কোথা মাঠ ফেটে যায় মারীর অনলে।
আঙিনায় শিশু খেলে, ফুলে ধরে মৌ,
তুলসীতলায় দীপ জ্বালে মেজো বৌ
সানাই বাজানো রাতে হঠাৎ জনতা
বিয়ে ভেঙে মালা ছিঁড়ে ছড়ায় মত্ততা।
মানুষের প্রাণে তবু নিরন্ত ফাল্গুনী—
তুমি যেন বলো আর আমি যেন শুনি॥

এ-যুদ্ধের কবি

নরেশ গুহ

পৃথিবীতে যুদ্ধ যেন আজ মৃত্যুর মতোই অনিবার্য। মৃত্যুর মতোই যুদ্ধও যেন আমাদের নিয়তি, অথচ মৃত্যুর যে মহিমা, ক্ষমা, পরিপূর্ণতা, যুদ্ধে তার কিছুই নেই। দিনে দিনেই অসহনীয় হয়ে উঠল অমানুষিক যুদ্ধের অপরিমেয় নীচতা এবং কাপুরুষতার গ্লানি। মৃত্যু জীবনকে যেমন হরণ করে, তেমনি পূর্ণ করেও তোলে। কিন্তু যুদ্ধে শুধুই ক্ষতি আর ধ্বংস আর লজ্জা। তবু এই নিয়তির হাত থেকে আজ যেন কারোরই নিষ্কৃতি নেই। তার সর্বগ্রাসী হাঁ সমাজের সবচেয়ে নিরুপদ্রব অজাতশত্রু যুবক-কবিকেও মুক্তি দেয় না। পৃথিবীকে এবং জীবনকে সুন্দর করে স্বর্গের পথে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়েই তার জন্ম হয়েছিল। বিত্তের কি গৌরবের উচ্চাভিলাষ ছিল না কল্পনায়। কবে একদিন দূরের গ্রামে শেষরাতে গাড়ি বিকল হোলো। হেঁটে সহরে ফেরার পথে রাত্রির জঠর দীর্ণ ক'রে বৃষ্টিভেজা প্রভাতের জন্ম দেখেছিল পূবের আকাশে। এ-জীবনে সেই তার পরম পুরস্কার বলে সে মেনেছিল। তবু খাকি উর্দি এঁটে হন্তারক যূথে বদ্ধ হ'য়ে জাহাজে চ'ড়ে সাগর পাড়ি দিতে হয়। আর কি ফিরবে কোনোদিন? ফিরলেও কবে, কতদিন পরে? জাহাজ-ঘাটে বিদায় দিতে এসে স্ত্রীর চোখে, মার চোখে মৃত্যুর আশঙ্কা কেঁপে-কেঁপে ওঠে। কিন্তু এ-ভাবে মূঢ় মৃত্যুর হাতে আত্ম-সমর্পণ করতেই হবে কেন? সকলের মৃত্যু, সকলের ক্ষতিই শোকের। কিন্তু অকালমৃত কবি কি শিল্পীর?

মানসিক পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত যুদ্ধবিলাসীরা অলীক মানবহিতের স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে ইওরোপের যুবকদের যুদ্ধে নামিয়েছিলেন। যৌবনের স্বাভাবিক আদর্শনিষ্ঠায় পরহিতে আস্থাবান সেই হতভাগ্য যুবকদের প্রাথমিক উল্লাস ইংরেজি কাব্যে ভাষা পেয়েছিল রূপর্ট ব্রুকের কবিতায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই সেই ভ্রান্তিবিলাসের অবসান হোলো। সিগফ্রীড স্যাস্যুন প্রমুখ যে-সব কবিরা যুদ্ধের গুহামুখ থেকে দৈবক্রমে ফিরে এসেছিলেন তাঁদের কবিকণ্ঠ যুদ্ধোত্তর হতাশায় কোথায় যে ডুবে গেল আর শুনতে পাইনি। আবার এই হতাশাও ডুবে

৬

গেল আরো সাম্প্রতিক সাম্যবাদী কবিকুলের আরক্ত আশাবাদে। তবু বৃহত্তর যুদ্ধের আসন্নতা ইওরোপের উদ্বিগ্ন স্নায়ু থেকে কখনোই তো মিলিয়ে যাওয়ার অবকাশ পায়নি। এই ভেবে আমার আশ্চর্য লাগতো যে এই আসন্নতার কালো হাওয়ায় ইওরোপের কবিকুল এখনো চঞ্চল হয়ে উঠছেন না কেন? কিন্তু সেইটেই হয়তো স্বাভাবিক। অপমান, লাঞ্ছনা, এবং মৃত্যুর পার হয়ে জীবনের জয়যাত্রা তো অনবসন্ন। অপ্রীতিকরকে ভুলে যাওয়াই তার ধর্ম। হয়তো বা তাই যুদ্ধের দ্বারা মানবহিতের মোহ ভঙ্গ হলেও সৈনিক-কবি এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সেই যুদ্ধে বিতৃষ্ণার স্বর কালক্রমে শুদ্ধ হয়েছিল। আর যাই হোক, নতুনতর কবিদের মনে সেই সুর তাঁরা সংক্রমিত করতে পারেন নি। এদিকে ইএটসের মতো মহৎ কবি তো যুদ্ধকে প্রকাশ্যেই অবজ্ঞা করে তাঁর আশ্চর্য কবিসত্তা অটুট রাখতে পেরেছিলেন। মহান তাঁর এই অবজ্ঞা, তবু মনে প্রশ্ন ছিল।

ইওরোপের চিত্তবৃত্তির মর্মে প্রবেশের একটিমাত্র দরজা আমাদের ভারতীয়দের সামনে খোলা আছে—সে হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্য। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যেই সমগ্র শ্বেত সভ্যদেশের চিত্ত যে প্রতিফলিত হয় না অতি সম্প্রতি জর্মন কবি রিলকের ক্ষুদ্র একটি কবিতা-গ্রন্থ অনুবাদে পড়ে সে-ভ্রান্তি আমার কেটেছে। ব্যক্তির জীবনে নিষ্ঠুর এবং শোকাবহ হলেও মৃত্যু জীবনের মতোই স্বাভাবিক। তার একটা সুনিপুণ ছন্দ আছে। বিশ্বের আলো-আঁধারের পরিমিত নৃত্যের সে তালভঙ্গ করে না। কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইওরোপে জীবনের এই স্বাভাবিক ছন্দ কেটেছে। মৃত্যু আর সেখানে জীবনের স্বাভাবিক সমাপ্তি মাত্র নয়—কালের নিষ্ঠুর পরিহাস। যুদ্ধলাঞ্ছিত পৃথিবীতে মৃত্যুর এই আকস্মিকতার কাছে আত্মার পরাজয় স্বীকারের অসীম লজ্জা দূর করলেন জর্মন কবি রিলকে—মৃত্যুকে জয় করবার কামনা দিয়ে। মৃত্যুর শিকার না হয়ে মৃত্যুকে শিকার করব—উন্মোচন করব তার কালো অবগুণ্ঠন—রিলকের কাছে এই আলোর সন্ধান পেয়েছেন ইওরোপের কতিপয় নবীন কবি, ইংলণ্ডেরও।

এই যুদ্ধে মৃত দুটি তরুণ ইংরেজ কবির গ্রন্থ আমার হাতে এসেছে। এর মধ্যে সিডনি কীজ (Sidney Keyes)-এর বয়স অত্যন্ত অল্প। তিউনিসিয়ার যুদ্ধ তার জীবন কেড়ে নেয় একুশ পার হবার আগেই।

শৈশব সুখের ছিল না ব'লে তাঁর মনের গড়নটা হয়েছিল নিঃসঙ্গ আত্মমগ্ন। ইওরোপ জুড়ে যখন যুদ্ধের আগুন জলছে তখন তিনি অক্সফোর্ডে ব'সে আপন মনে লিখছেন কাহিনীলালিত কবিতাবলী। সমসাময়িক পৃথিবীর প্রতি তাঁর এই উদাসীনতা সত্ত্বেও সার্বিক যুদ্ধের অসহায় শিকার হ'য়ে তাঁকেও বন্দুক ঘাড়ে যোগ দিতে হোলো। তখন জীবনের সার্থকতা আর কালের উন্মত্ত অবিচারের অনিবার্য দ্বন্দ্বের তিনি সমাধান করেছিলেন এই ভাবে—

> I say, Love is a wilderness and these bones
> Proclaims no failure, but the death of youth.
> We say, you must be ready for the desert
> Even among the orchards starred with blossom,
> Even in spring, or at waking moment
> When the man turns to the woman, and both are afraid.
> All who would save their life must find the desert.
>
> (*The Wilderness*)

অর্থাৎ যে-যুদ্ধকে তাঁর চিত্তের সুস্থতা প্রাণপণে অস্বীকার করে তা যখন অনাবৃষ্টি কি মহামারীর মতো দেশ-মনকে আচ্ছন্ন করলোই তখন নির্ভয়ে কালের সেই ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে তাকে অতিক্রম করতে না পারলে জীবন বৃথা। বলা বাহুল্য, ঈষৎ বিকৃত করলেই ইওরোপের এই মৃত্যু-কামনাকে (death-wish) ফ্যাশিজমের আদর্শে দাঁড় করানো যায়। আমার ধারণা হোলো—মৃত্যুজয়ের এই সাহস আর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই এ-যুদ্ধের কবিরা তাঁদের যৌবন, প্রতিভা, আশা, আকাঙ্ক্ষা সমস্ত দিতে পেরেছিলেন যুদ্ধের দানবকে। না হ'লে প্রথম মহাযুদ্ধের মতো মানবহিতের আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করবে, এমন সরলচিত্ত বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে বিরল। প্রকাশ্যে ফ্যাশিস্ত শক্তির সঙ্গে সাধুযুদ্ধের অভিনয় হলেও আসলে যে ক্ষমতালোভী দুই শক্তিমদমত্তের মধ্যে এই কলহ, এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের রমণীসুলভ রণ-রোমাঞ্চের অবসান হ'লেও এ-যুদ্ধই যে শেষ যুদ্ধ নয় এ-কথা এবার কে না জানতো? সিডনি কীজের কবিতায় তাই ওএনের অভিযোগ বা অসহায় আক্ষেপ নেই; কিন্তু প্রতিবাদও নেই। যুদ্ধে নিতান্ত নিরুৎসাহ হয়েও

বিনা প্রতিবাদে কালের অগ্নিপরীক্ষা পার হওয়ার ব্রত এই কবিরা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কেন? সার্বিক যুদ্ধের কাপুরুষ বীভৎসতা অনুভব করা সত্ত্বেও মানুষের কল্যাণের, মঙ্গলের, শান্তির সপক্ষে অন্তত কবিরাও যে তাঁদের কণ্ঠস্বর তুললেন না, বরং নিয়তির মতো নিষ্ঠুর মৃত্যুপরীক্ষা পার হওয়ার জন্য জীবনপণ করলের, এ দেখে বিস্ময় বোধ করতে পারি, করুণাও হয়, কিন্তু প্রশংসা করতে পারি না। যুদ্ধতন্ত্রের যজ্ঞে কত জীবন তো শাসকরা বলি দিলেন। কিন্তু যুদ্ধের তৃষ্ণা কি মিটলো?

সিডনি কীজ শুধু তাঁর প্রতিভার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। উৎসাহী অনুসন্ধানীর সেই অস্থিরতা তাঁর রচনার সর্বত্রই ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু মাত্র একুশ বছরের জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তো তাঁর আসার কথা ছিল না। তাঁর মধ্যে যে শক্তি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিভার পরম অন্বয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তাঁকে চলে যেতে হোলো।

বিজ্ঞানসেবিত যুদ্ধপোষক নব্য তন্ত্রে নিরুৎসাহ এবং জীবনের সর্বস্ব প্রেমে মুগ্ধ স্থিরচিত্ত কবিকে হননযজ্ঞে বাধ্য করলে তাঁর নিরাসক্ত দৃষ্টিতে যুদ্ধ কেমন লাগে তার সুন্দর নিদর্শন অ্যালন লুইস (Alun Lewis)-এর কবিতাবলী। *Raider's Dawn* নামে তাঁর প্রথম কবিতা-গ্রন্থ আমি দেখিনি। স্বল্প পরিসরে নিবদ্ধ দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ গ্রন্থ *Ha! Ha! Among the Trumpets* পড়ে মনে হোলো বুদ্ধিবৃত্তে সীমায়িত, গঠন-স্থাপত্যের পারিপাট্যে পরীক্ষাশীল আধুনিক ইংরেজি কাব্যের জগতে লুইস ইএটসের রীতিতে বুদ্ধি এবং আবেগের মণিকাঞ্চনযোগে সচেষ্ট ছিলেন। এলিঅট-মুগ্ধ অডেন স্পেণ্ডরের পরে এর প্রয়োজন ছিল। ইএটসের বুদ্ধিবিধৃত অথচ প্রাণোন্মাদ অপরূপে যাঁদের তৃপ্তি, তাদের কাছে এ-ঘটনা বিস্ময়কর লাগতো যে তাঁরই সমসাময়িক পাউণ্ড এবং এলিঅটের প্রভাব পরবর্তীদের উপর যেমন গভীরভাবে পড়লো, অন্যের ইএটসের কাব্য তেমনিই প্রায় অননুসৃত থাকলো কী ক'রে, এবং কেন? ইএটসের কাব্যরূপের পুনরুত্থানের যাঁরা আশা ক'রে আছেন, অ্যালন লুইসের কবিতাবলী, সংখ্যায় স্বল্প হলেও, তাঁদের আশা দেবে।

ওইএলসের কয়লাখনি অঞ্চলে অ্যাবারডিন নামে ক্ষুদ্র এক গ্রামে লুইস জন্মেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়—১৯১৫ সালে। তাঁর বাবা ছিলেন

ওখানকার শিক্ষাবিভাগের পরিচালক। কৃতী ছাত্র লুইস ১৯৩৫ সালে ইতিহাসে বি. এ. পাশ করেন প্রথম হয়ে। তারপরে গবেষণার বৃত্তি নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ নিতে তাঁর আরো দু বছর লাগলো। ছাত্রজীবন শেষ ক'রে লুইস স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন।

এ-যুগে কবির পক্ষে শিক্ষকতার মতো সৎ এবং নিরুপদ্রব শান্ত জীবন আর নেই। চসর তাঁর সময়ে রাষ্ট্রদূত হয়েও কবি হ'তে পেরেছিলেন। কিন্তু এই হৃদয়হীন প্রতিযোগিতার দিনে বিবেকবান কবি এবং সাহিত্যিকের জন্য এখনো কোনো সসম্মান জীবিকার পথ যদি খোলা থেকে থাকে তো সে হচ্ছে শিক্ষকতা। অবশ্য সেই দেশে, যে-দেশে শুধুমাত্র 'জীবনীশক্তি এবং পৌরুষের অভাবেই' হতভাগ্য শিক্ষিত যুবককে এই পথ অবলম্বন করতে হয় না। শিক্ষাব্রতী পরিবারের নির্মল ধারায় লুইসের কবিজীবন দিনে-দিনে বিকশিত হ'তে পারতো।

এর মধ্যে যুদ্ধ। দেখতে-দেখতে আগুন ছড়িয়ে পড়লো বৃহৎ এশিয়ার দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে-দ্বীপে। আধুনিক রাষ্ট্রশক্তির নীতিবোধ নেই। কোনো-এক দেশে দৈবক্রমে জন্ম হয়েছে এবং সে-দেশের শস্য, জল, হাওয়া পরিপুষ্ট করেছে দেহ—শুধু এই কারণেই আমাদের জীবনের উপর সেই রাষ্ট্রের সর্বময় অধিকার জন্মে আজকাল। পৃথিবীতে আমার যদি কোনো শত্রু না থাকে এবং নির্বিচার মারণলীলায় কোনো উল্লাসই যদি আমি বোধ না করি, তবু ক্ষমা নেই আমার। সেই রাষ্ট্রের পক্ষ নিয়ে অস্ত্র ধারণ আমাকে করতেই হবে। কনস্ক্রিপশনের নাগপাশে জড়িত হ'য়ে লুইসকেও ১৯৪০ সালে যুদ্ধে যোগ দিতে হোলো। এর এক বছর পরেই গোএনো এলিস নামে আপন প্রদেশ-বাসিনী একটি তরুণীকে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু প্রথম সন্তানের জন্মের পূর্বেই প্রেমের নীড় ত্যাগ ক'রে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তাঁকে চলে আসতে হলো বর্মার সীমান্তে—আরাকানের অরণ্যে।

প্রথম মহাযুদ্ধের রঙ্গভূমি ছিল ইওরোপেই। সাগর পাড়ি দিয়ে বহুকালের মতো যুবকদের স্বদেশ থেকে নির্বাসিত থাকতে হয়নি। ফ্ল্যাণ্ডর্সের ট্রেঞ্চ তো শাখাসমুদ্রের ওপারেই। সুদূর প্রাচ্যের সীমান্তে যাদের এবার আসতে হোলো, দেশের সঙ্গে, পরিচিত জীবনের সঙ্গে তাদের ব্যবধান প্রায় জন্মান্তরের মতোই সুদূর হয়ে উঠল। তাছাড়া কোন ভারতবর্ষে এসে

ইংরেজ সৈন্যেরা ১৯৪৩ সালে দাঁড়ালো ? বেয়াল্লিশের বিক্ষোভের পরে দুর্ভিক্ষ-কবলিত ভারতবর্ষে শুধু অনিশ্চিত অসহায় বিদ্বেষ ছাড়া আর-কোনো অভ্যর্থনা লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তরুণ কবি লুইসকেও এই প্রেমহীন পরাধীন দেশ অব্যক্ত ঘৃণাই শুধু উপহার দিলো।

The people are hard and hungry and have no love
Diverse and alien, uncertain in their hate,
Hard stones flung out of Creation's silent matrix
And the Gods must wait.

লুইসকে এ-দুঃখ করতে হয়েছে।

সৈন্য হয়ে নিজেকে অপমানিত করলেও যুদ্ধের উত্তেজনা কি হতাশা তাঁর কাব্যের জগতে কখনো কালো ছায়া ফেলেনি। ইংলণ্ড থেকে বিদায় নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছনো, আর ভারতের প্রকৃতি ও জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর মনের উপর—এরই বেদনার্দ্র ছবি থাকলো এই কবিতাগুলিতে। বিদেশী কবির চোখে নিজের দেশকে দেখতে কৌতূহল হয়। কিপলিংকে দেখেছি, লুইসকেও দেখলুম। আশ্চর্য প্রভেদ। সাম্রাজ্যগর্বিত উদ্ধত ইংরেজ আর নয়, এ তো ইংরেজ মানুষ। কাব্যের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের যতটা দেয়া যায় ততটাই লুইস দিয়েছেন। যুদ্ধের প্রতি তাঁর শুধু একটা অধীর অসহায় অবজ্ঞা, না আত্ম-গৌরব, না শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ। ওইএলসে তাঁর সুন্দর গ্রাম—মাঠের বীজের চেয়েও রাত্রির গভীরে সুপ্ত হ'য়ে এরোপ্লেনের তলায় মাথা নত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—সেই

Small nameless mining village
Whose slopes are stretched with streets and sprawling graves
Dark in the lap of firwoods and great boulders
Where you lay waiting, listening to the waves
My hot hands touched your white despondent shoulders—

পুনার হাসপাতালে স্বপ্নে ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়। ঝিলকিয়ে ওঠে ঝাড়ুদার মেয়েটির পায়ে রুপোর খাড়ু, যেন ভারতবর্ষের সূর্যের আলোয় গড়া; পাথরের এলোমেলো স্তূপের উপরে ব'সে আছেন বিষ্ণু

Demanding nothing
But the simplicity that she and I
Discovered . . .

আয়ত-আঁখি রজককন্যারা দীঘির জলে কাপড় কাচছে, গোরাসৈন্য দেখে বুকের কাপড় টেনে দিল—লজ্জায় না, ভয়ে। তবু ভালো লাগে 'sarbande of trees of guava and papaya (ঐ 'সারবন্দী' কথাটাও)। কিন্তু প্রেম কোথায় ? প্রেম তো শুধু স্বপ্নে। আর প্রেম না হ'লে জীবনের কী মূল্য ? আর এই যুদ্ধ কিসের ? কেন ? কার বিরুদ্ধে ?

And though the state has enemies we know
The greater enmity within ourselves.

একটিমাত্র কবিতায় লুইস 'lynx-eyed Japs'-এর উল্লেখ করেছেন। আমাদের মনে হয় যেন সুর কাটলো, কিন্তু আসল অসংগতি তো তাঁর যুদ্ধে যোগদানেই। যুদ্ধে যোগ না দিয়ে আপনার বিশ্বাস-মতো সুন্দর জীবন যাপনের জন্য তিনি তো সর্বস্ব পণ করতে পারতেন। উপহাস, নিন্দা, কারাগার—সবই বরণ করতে পারতেন। মূঢ়তার কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে কবির কাছে বরং সেই বীরত্বের প্রত্যাশাই তো আমরা করি।

যাই হোক, বর্বরতার সঙ্গে নিরন্তর দ্বন্দ্ব তাঁর শেষ পর্যন্ত সহ্য হোলো না। যাঁর হৃদয় আছে, বুদ্ধি আছে এবং অনুভূতির তারটি যাঁর সূক্ষ্ম, তিনি কী ক'রে এই দ্বন্দ্ব বহন করবেন জীবনে ? পারলে ভালোই। কিন্তু Roger Bacon-এর মতো সহ্যশক্তি কজনের হয় ?

লুইসের ব্যক্তিগত জীবন ছিল সুখী কবির জীবন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বার-বার তিনি আপন গৃহকোণ, স্ত্রী আর প্রতীক্ষিত সন্তানের কথা ভাবছেন।

And I—I pray my unborn tiny child
Has five good senses and an earth as kind
As the sweet breast of her who gives her milk
And waves me down this first clandestine mile.

কিন্তু এ-প্রার্থনা তাঁর পূর্ণ হোলো না। জীবনের প্রতি অসীম প্রেম, চিত্তের অসাধারণ সুস্থতা সত্ত্বেও আরাকানের জঙ্গলে নরহত্যার উন্মত্ততার কাছে হার মানতে হ'লো, আত্মহত্যা করলেন শেষ পর্যন্ত। অবশ্য দুর্ঘটনায়

মৃত্যু হয়েছে বলেই প্রকাশ।* ভর্জিনিয়া উলফ আর স্টিফান ৎসোইথ-এর মতোই যুদ্ধ আর সহ্য হ'লো না তাঁর, মুক্তি নিতে হ'লো আত্মহত্যায়।

প্রচণ্ড ইংরেজের কাছে সামান্য কবির তুচ্ছ মৃত্যুর মূল্য আর কতটুকু? কিন্তু কবির মৃত্যু জীবনেরই মৃত্যু। কেননা অন্তহীন দুঃখ পার হ'য়ে জীবন তবু সুন্দর, মধুর, অপরূপ হয় যে ক'জন অসামান্যের সাধনায়, কবি তো তাঁদেরই একজন। কবি এখনো মানুষের শেষ আশার অন্যতম, আর এখনো ইংলণ্ডের প্রধান গৌরব—এখনো কেন বলি, এখন সাম্রাজ্য-হারা ইংলণ্ডের প্রধানতম গৌরব কি কবিতাই নয়?

* অ্যালন লুইসের দুর্ঘটনায় মৃত্যুসংবাদ যে মিথ্যা, আসলে যে তিনি আত্মহত্যা ক'রে তাঁর যন্ত্রণার অবসান করেছেন, সে-কথা শুনলাম শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর কাছে।

সমালোচনা

সংকলিতা। সঞ্জয় ভট্টাচার্য। পূর্বাশা প্রেস (দ্বিতীয় সংস্করণ)　২৲

অকুন্তলা। প্রমথনাথ বিশী। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স ২৲

এমন কোনো-কোনো কবি আছেন, যাঁদের কবিতা সম্পূর্ণ আস্বাদ করতে হ'লে তাঁদের রচনার একটি চয়নিকা পেলে ভালো হয়। আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই শ্রেণীর। আজ প্রায় পনেরো বছর ধ'রে তিনি কবিতা লিখছেন। তাঁর প্রথম দশ বছরের রচনা থেকে নির্বাচন ক'রে এই বই বছর পাঁচেক আগে প্রকাশিত হয়েছিল, সম্প্রতি তার যে দ্বিতীয় সংস্করণ হোলো এটাই আমাদের পক্ষে সুখবর, কেননা কবিতার বইয়ের পুনর্মুদ্রণ বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বোধ করি সকল সাহিত্যেই।

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সঞ্জয়বাবু প্রবেশ করেছিলেন বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে। সংকলিতায় তাঁর দশ বছরের ফসলের যে সংগ্রহ আছে তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। কিন্তু তাঁর কবিতা উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে উত্তর-রবীন্দ্র কাব্যের অর্কেস্ট্রায় তিনি তাঁর নিজস্ব একটি বিষন্ন মধুর সুর লাগাতে পেরেছেন। বলব না সেটি বীণা-ঝংকার, কিন্তু আসরের এক কোণে তিনি তাঁর নিভৃত একতারাটি বাজিয়ে চলেছেন—সেই সুরে আগাগোড়া একটা দুঃখের প্রচ্ছন্ন ধারা প্রবাহিত। এই দুঃখের উৎস ঠিক ব্যক্তিগত প্রেম, কামনা, কিংবা ব্যর্থতাবোধ নয়। যে-পৃথিবীতে আমরা এসেছি, এ আমাদের মনের দেশ নয়। জীবনে কোনো রং নেই, সুর নেই, স্বাদ নেই, প্রাণে উৎসাহ নেই, চোখে আশাও নেই হয়তো। কাহিনীতে যে-পৃথিবীর কথা আমরা শুনি, পৌরুষে, প্রেমে, সৌন্দর্যে ও শান্তিতে ভরা সেই পৃথিবী আমাদের স্বপ্নেই থাকলো—এই তাঁর বেদনা।

> নিরুত্তেজ সমতল নদীর ধমনী
> শোনেনি হৃদয়ে কোনো পিপাসার ধ্বনি
> জানেনি যে মানুষের আরো আছে কথা,

পেশীতে অনেক চঞ্চলতা
দিয়ে গেছে বিদ্যুতের অগ্নিময় স্নায়ু
তাই আমাদের ভীরু ক্লান্ত পরমায়ু
নিস্তরঙ্গ নদী দিয়ে
ধানের নৌকার মতো পাল তুলে যায় শুধু দিগন্তে মিলিয়ে।

ঝড়ের মেঘ উঠলো দেশে দেশে, আমাদের নিস্তরঙ্গ হ্রদের জলে তার দোলা লাগলো না। পশ্চিমে ওরা জীবনের দুরন্ত আবেগে আকাশে পৃথিবীতে নিজের অধিকারের সীমা প্রসারিত করলো। হয়তো জ্ব'লে গেল তাদের ঘরসংসার, উপুড় হ'য়ে পড়লো তারা পথের পাশে, যার জন্যে বেরিয়েছে সেই জীবনকেই কঠিন হাতে মারলো, কিন্তু বেরিয়েছে তো। পলিমাটির দেশে শান্ত সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে আমরা শুধু বসেই আছি—

কোথায় সেই পাহাড়ের অরণ্যের গন্ধ।—
ভেসে গেল সবুজ শস্যের হাওয়ায়
মুছে গেল দ্রাবিড়ী ধানের স্বপ্নে।...

সহ্যাদ্রির দীর্ঘ, উদ্ধত ক্ষত্রিয়
কর্ণসুবর্ণের সোনালি মাঠে হারায় তার ঈগল চক্ষু।

এ-সব কথা বলতে গিয়ে সাধারণত যে বিপদ ঘটে সেটি সঞ্জয়বাবু এড়িয়ে গেছেন তাঁর স্বভাবের গুণে, গলা তাঁর কখনো চড়লো না। ব্যর্থতা পার হয়ে আশার কথাও আছে তাঁর রচনায়, কিন্তু আশাকেও তিনি সরবে ঘোষণা করতে উদ্যত হন নি—তাঁর এই সংযমেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

আসলে বাংলায় স্বপ্নের কবি যে-ক'জন আছেন সঞ্জয়বাবু তাঁদেরই একজন। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় তো বটেই, শুধু তাই কেন, আগাগোড়াই, যে-নিজস্ব পরিমণ্ডল তিনি রচনা ক'রে তোলেন তা এক নিভৃত ছায়াচ্ছন্ন দেশের।

রাত তিনটেয়
জেগে আছে পার্কে গ্যাসের নীল আলো
গাছের সবুজ আয়নায়, চুপি চুপি মুখ দেখবে বলে।

এ'শয়ার যে আকাশে পাহাড়ের পিঙ্গল আবাদ
সে আকাশ নেমে আসে মনে।

জীবনানন্দর স্বপ্নলোক সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে টানে, তাঁকে ডাক দেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভৌগোলিকতা; কিন্তু জীবনানন্দীয় বর্ণবৈভব তাঁর নেই, প্রেমেন্দ্রের আবিষ্কারক উল্লাসও না; তিনি ম্লান, শান্ত, ব্যথিত, আর নিজেরই মধ্যে সম্পূর্ণ ও সুন্দর। বৈচিত্র্য নেই তাঁর, পরিধি স্বল্প; কিন্তু সাহিত্য তো শুধু

ব্যাপ্ত বিশাল মহানকে নিয়ে নয়, রূপবানকে নিয়েও, চরিত্রবানকে নিয়েও। সঞ্জয়বাবু প্রশংসনীয় উপরন্তু এই কারণে যে তাঁর রচনায় একটি অনুক্রমিক পরিণতি দেখতে পাই—তাঁর শেষ বই 'যৌবনোত্তরে'র গভীরতা পূর্বে তাঁর ছিলো না—আর এই পরিণতির পরিচয়, দুঃখের বিষয়, আমাদের সাহিত্যে ব্যতিক্রমহীন নিয়ম নয়। 'সংকলিতা'র পরবর্তী সংস্করণগুলি ক্রমশই আরো সমৃদ্ধ হবে, তাঁর সাম্প্রতিক রচনা এই আশাই আমাদের মনে জাগায়।

প্রমথনাথ বিশী মহাশয় সাধারণ পাঠকের কাছে বিদ্রূপরসিক গল্পলেখক ব'লেই সমধিক পরিচিত। তার একটা প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এই যে তাঁর কবিতার বইগুলি অনেকদিন আর ছাপা নেই। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংগ্রহে তাঁর দুটি সুন্দর লিরিক পাঠকের মনে যে-তৃষ্ণা জাগায় যুদ্ধের এতদিন পরেও কোনো কবিতার বই প্রকাশ না-হওয়ায় তা অপূর্ণই ছিল। সম্প্রতি পয়ার ছন্দে রচিত কয়েকটি দীর্ঘ কাহিনী-কবিতা এবং স্পেন্সরিআন স্তবকে রচিত একটি দীর্ঘ নেপোলিয়ন-প্রশস্তি নিয়ে প্রকাশিত এই সুদৃশ্য গ্রন্থখানিকে তাই স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশ সুখ্যাত গীতিকাব্যের দেশ। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর খুব কম কবির লেখনীই কাহিনী-কবিতার ক্ষেত্র কর্ষণ করেছে। গদ্যের স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ রেখে কাহিনীর সৌরভটুকু কেমন ক'রে কবিতার দেহরূপের অন্তর্গত করা যায় তাও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন উত্তর জীবনে। গত কয়েক বছরের মধ্যে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কাহিনী-কবিতার দিকে ঝুঁকেছেন, কিন্তু পোএটিক ডিকশন-এর মৌতাত কাটাতে পারেননি। শুধু বুদ্ধদেব বসুর 'বিদেশিনীতে' আছে উত্তর-রবীন্দ্র-প্রবর্তিত বাক্‌ভঙ্গির সম্পূর্ণ অঙ্গীকরণ।

বিশী মহাশয়ের কবিতাগুলি একেবারেই অন্যরকম। সবগুলি রচনাই পয়ার ছন্দে, কিন্তু সে-পয়ার উত্তর-রবীন্দ্রের লেখনীসিদ্ধ পয়ার নয়। 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি বেলা দ্বিপ্রহর'—চিত্রা সোনার তরী যুগের এই পয়ারই প্রমথবাবুর আদর্শ। ভাষা ও ছন্দের এই ভঙ্গি পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে বর্জন করলেও প্রমথবাবু করেননি, বরং সর্বদাই বাক্‌রীতিকে সযত্নে পরিহার ক'রে চলেছেন। এ-যুগের হ'য়েও কেন অতীতের তিনি এমন অনুরক্ত এ-প্রশ্ন পাঠকের মনে বার-বার আসে। কবিতার শব্দচয়নে

তিনি বাস্তবানুগ যে দেশজ রীতির প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন, হৃদয়াবেগের কবিতাতেও তিনি যে-ভাবে রসিকতার আমেজ লাগিয়েছেন তার উৎস খুঁজতে হ'লে রবীন্দ্রনাথকে পার হ'য়ে আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শরণ নিতে হয়।

স্মৃতির মন্থনদণ্ডে চৈতন্য ঘোলালো
হিসাবে বুঝিনু যাবে দশদিন লেগে
এ রাগ ভাঙাতে। আছে অভিজ্ঞতা কিনা!
(প্রেয়সী ও মেকি টাকা বড় শক্ত চিনা!)
বিছানা নিলাম সাথে, নিলাম মশারী
(বিরহে মশার জ্বালা অত বাড়াবাড়ি
সবেনা আমার।)

কবিতার চরিত্রগুলি সবই এ-যুগের ; তাদের কেউ স্কুলের হেডমিস্ট্রেস, কারো পরনে সাহেবি পোষাক। অথচ ভাষার ঢং প্রাক্-রবীন্দ্র উনিশ শতকী ব'লে একটা অসংগতি সর্বদাই মনকে পীড়া দেয়। 'যদি 'পরে' 'গাড়ি ধায়' 'সম্বরিনু আপনারে; প্রশংসিনু মনে,' 'অতসীরে সংক্ষেপিয়া করেছিনু অসি' 'বাষ্পীয় শীকর পশিল নাসায় কর্ণে'—আধুনিক রচনায় এ-সব স্থান পেতে পারে একমাত্র mock-heroic-এর প্রয়োজনে, কিন্তু আকস্মিক হ'লেই mock-heroic সার্থক হ'তে পারে, পরিমাণে বেশি হ'লেই প্রয়োগে তীক্ষ্নতা থাকে না। তাছাড়া বিশী মহাশয়ের কবিতাগুলি বিশুদ্ধ ব্যঙ্গকবিতাও তো নয়। যেখানে হাসি আছে, সেখানে হাসির উদ্দেশ্য অন্য কেউ নয়, বক্তা নিজেই। বিরহে মশারি এবং মশার উল্লেখ অবশ্য সূক্ষ্ম নয় ; তবু বেদনায় পরিহাসে মেশা এই কবিতাগুলি এমন সতেজ ও চঞ্চল যে ভাষার পীড়ন সত্ত্বেও উপভোগ করতেই হয়। প্রমথবাবুর গীতিকবিতা ভাষা বিষয়ে অনেকটা নিষ্কণ্টক। আমরা সেগুলির একত্র প্রকাশের আশায় থাকবো। এই বইয়েরই 'ত্রিশঙ্কু' কবিতার শেষে তার একটি সুন্দর নিদর্শন আছে ; কিছুটা তুলে দিই :

যার
স্বপ্নও গেছে সুপ্তিও গেছে, যার
তার
সুখ গেছে হায়, স্মৃতি গেছে বেদনার
আর
জীবনে মরনে জীবন্মৃতের আছে কিবা অধিকার।

ছন্দের এই সুন্দর দোলা আমরা আরো প্রার্থনা করি কবির কাছে।

Indian Writers in Council. (Proceedings of the first All-India Writer's Conference, Jaipur, 1945.) Ed. K. R. Srinivasa Iyangar. P. E. N. All-India Centre, Rs. 7/|8-

The Indian Literatures of Today. Ed. Bharatan Kumarappa. P. E. N. All-India Centre, Rs. 5/-

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে জয়পুরে ভারতীয় P. E. N. পরিষদের প্রথম সর্বভারতীয় অধিবেশন একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। স্বল্পসংখ্যক স্বচ্ছদৃষ্টি মানুষের প্রয়াস ব্যর্থ ক'রে বার-বার যুদ্ধের দম্ভ যে পৃথিবীর বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন এবং সত্য-ও সুন্দর-ভাষণের মুখ বন্ধ করছে, গত চল্লিশ বছরের দিকে একবার তাকালেই সে-কথা আমরা বুঝতে পারি। রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার চেয়ে মানুষের মঙ্গল এবং কল্যাণের শুভ ইচ্ছায় যাঁরা অনুপ্রাণিত, রাষ্ট্ররণনীতিজ্ঞের মরণ-বাণের অন্যতম লক্ষ্য তাঁরাও। স্বেচ্ছায় রণরঙ্গে ভূমিকা গ্রহণ না-করলে সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের অশেষ দুর্গতি সহ্য ক'রে হয় কারাভোগ, না হয় সর্বস্ব হারিয়ে দেশত্যাগ করতে হয়েছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রম্যা রলাঁর মৃত্যু, দেশত্যাগী ৎসোয়াইগ-দম্পতির আত্মহত্যা রণোন্মাদ ইওরোপের বিবেকহত্যার সাক্ষী হয়ে রইল। আন্তর্জাতিক P. E. N. সাহিত্যিক এবং শিল্পীর অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ ও মানবিক সৌহার্দ্যের আদর্শে আস্থাবান। নাৎসি নিপীড়নে উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে যারা দেশত্যাগী হ'তে বাধ্য হ'য়েছিলেন এই সাহিত্যিক পরিষদের সহায়তা তাঁদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। মেশিন-গানের সামনে শান্তি-কপোতের কূজন বার-বার আমরা স্তব্ধ হতে দেখেছি। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্টকহলমে বার্ষিক অধিবেশন হবার কথা ছিল। গান্ধীজি বাণী পাঠিয়েছিলেন—'How I wish that literary men and women all the world over would combine to make war an impossibility.' কিন্তু অধিবেশনের আগেই যুদ্ধ লেগে গেল। তবু 'গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধজয়ের' অব্যবহিত পরে যখন কোনো-কোনো তথাকথিত অগ্রসর দেশে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই রকম হুকুম করা হচ্ছে যে স্বদেশের গুণকীর্তন ছাড়া শিল্পী-সাহিত্যিকদের আর কিছুই করণীয় নেই, আর কিছুই তাদের করতে দেয়া হবে না, তখন পৃথিবীর অন্তত কোথাও লেখকবৃন্দের সমবেত ভাবে আত্মার স্বাধীনতা ঘোষণার প্রয়োজন আছে।

আদর্শে আস্থাজ্ঞাপন ব্যতীত সাহিত্য-ব্যবসায়ীর পক্ষে আবশ্যক কতগুলি বিষয়ে অবহিত হওয়াও এই সাহিত্যিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য। সাহিত্যিকের কর্ম শুধু অবসর-বিনোদনের সাধু ইচ্ছা প্রণোদিত নয়, সাহিত্যিক বিশেষ অর্থেই ভাবাব্যবসায়ী। তার মানে এ নয় যে প্রতিভাও পণ্য বস্তু, কিন্তু সাহিত্যসাধনার গৌরবেই সাহিত্যিকের সুস্থ জীবিকার্জনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে আজ। এই-কাজটি যে কত দুরূহ তা ভারতীয় সাহিত্যিক মাত্রেই জানেন। স্বল্পশিক্ষিত, বহুভাষাসীমান্তে খণ্ডিত এই দেশে সাহিত্যিকের ন্যায়সংগত অধিকার সামান্যই রক্ষিত হয়। প্রকাশকদের দ্বারা অবহেলিত এবং প্রবঞ্চিত হননি এমন সৌভাগ্যবান জীবিত সাহিত্যিক ক'জন আছেন? স্বভাবতই নির্ঝঞ্ঝাট এবং শান্তিপ্রিয় ব'লে আইনের আশ্রয় গ্রহণ থেকেও আমাদের সাহিত্যিকগণ বিরত থাকেন। এবং সেই সুযোগে সংবাদপত্র-ব্যবসায়ী এবং অনতিবিবেকবান প্রকাশক মহল অবাধে দেশবিদেশের রচনার লুণ্ঠন কার্য চালাতে থাকেন। বাংলা লেখার উপরেও যে ডাকাতি চলছে ভারতের অন্যান্য ভাষায়, এমনকি অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে, এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর একটি চিঠি বেরিয়েছিলো কিছুদিন আগে স্টেটসম্যান পত্রিকায়। এই অনাচারের প্রতিকার করতে হ'লে সাহিত্যিকদের সমবেত প্রয়াস চাই।

আন্তর্জাতিক কিংবা ভারতীয় সাহিত্যিক পরিষৎ সাহিত্যিক সমাজের সর্ববিধ সুসংগত অধিকার রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই অনেক কিছু করতে পারেন। সাহিত্যের প্রকাশ এবং প্রচারের কার্যে তাঁদের সহায়তা মূল্যবান হ'তে পারে। না হ'লে ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যসাধনার প্রেরণা দানের ক্ষমতা কোনো পরিষদেরই নেই ; সে-রকম দাবি করাও অনুচিত।

জয়পুর অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সাহিত্যিকরা যোগদান করেছিলেন। বিদেশীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন ই. এম. ফর্স্টর ও আরো কয়েকজন। তিন দিনের অধিবেশনে সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। সাহিত্যিক এবং সাহিত্যে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেই সুসম্পাদিত এই অধিবেশনের বিবরণখানি সংগ্রহ করলে লাভবান হবেন।

ভারতীয় P. E. N. পরিষৎ-এর চোদ্দ বছর জীবনের বেশির ভাগই কেটেছে যুদ্ধের প্রচ্ছায়ে। তবু ভারতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য তাঁদের

প্রয়াস প্রশংসনীয়। ইংরেজি সাহিত্যের মহত্ত্ব সত্ত্বেও মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতেই আমাদের আশা, এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের সপক্ষে কানাড়ার গুণী সাহিত্যিক মাসতি বেঙ্কটেস আয়ঙ্গারের বক্তব্য আমাদের কাছে বাহুল্য ব'লেই মনে হয়। তাছাড়া 'মাতৃভাষা'র প্রতিশব্দ রূপে 'vernacular' কথাটি এখনো কি সহ্য করতে হবে? কথাটা ঐতিহাসিক দুর্গন্ধজড়িত, অথচ আমাদের শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রশ্নপত্র পবং পাঠ্যতালিকাকে এই অপশব্দটি দ্বারা কলঙ্কিত করছেন।

জয়পুর অধিশনের জন্য রচিত ষোলোটি আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দ্বিতীয় পুস্তকটি গ্রথিত হয়েছে। অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ভাষার ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য। P. E. N. সেই ব্যবধান দূর করার কাজে অগ্রসর হ'য়ে কৃতজ্ঞতার পাত্র হলেন।

এই গ্রন্থে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নাতিদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন কাজি আব্দুল ওদুদ সাহেব। আধুনিক সাহিত্যের পটভূমিকা তিনি সিদ্ধ হস্তেই বর্ণনা ক'রেছেন। কিন্তু 'অতি আধুনিক' (অর্থাৎ উত্তর-রবীন্দ্র) লেখকদের প্রতি সুবিচার তিনি করতে পারেন নি। এমনকি অযথা অভিযোগও করেছেন। আধুনিক সাহিত্যে যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ, অভিযোগ তাঁদেরই সম্পর্কে; তাঁদের পক্ষ থেকেই প্রত্যুত্তর এলে ভালো হোতো। তবু অন্তত পাঠকদের পক্ষ থেকে আমি বলব যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করার দাবি কোনো আধুনিক বাঙালি লেখক করেছেন ব'লে আমার জানা নেই। যে-'শেষের কবিতা'র উল্লেখ ওদুদ সাহেব করেছেন তার সম্পর্কেই একজন অগ্রণী আধুনিক বহুদিন পূর্বে কী-মত প্রকাশ করেছেন তার সামান্য অংশ তুলে দিই: 'আমরা যা-কিছু করবার চেষ্টা করছিলাম অথচ ঠিক পারছিলাম না, সেই সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন—কী সহজ, কী সম্পূর্ণ ক'রে, কী অনিন্দ্য-সুন্দর ভঙ্গিতে। মনে হ'লো বইটি যেন আমাদেরই, অর্থাৎ নবীন লেখকদেরই উদ্দেশ্য ক'রে লেখা, আমাদেরই শিক্ষা দেবার জন্য এটি গুরুদেবের একটি তীব্রমধুর ভর্ৎসনা।' এ-কথা অহমিকাপ্রসূত নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে অতিক্রম ক'রে আধুনিককে সম্মান দিয়েছিলেন, এটাই তো কথা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন আর-একজনকে 'অতিক্রম' করবেন,

এ-কথাই তো ওঠে না, কেননা কোনো লেখকই অন্য কাউকে অতিক্রম করতে চান না, চান শুধু নিজেকে প্রকাশ করতে। 'Honours in literature are not for those who repeat but for those who rise higher'—এ-ধরনের ধরা বুলি ওড্‌দ সাহেবের মতো সুধীজনের মুখ থেকে আশা করিনি।

আধুনিক কবিদের সম্পর্কেও তিনি নিশ্চয়ই খুব বেশি খবর রাখার সময় পান না। নয়তো প্রেমেন্দ্র মিত্রের

> 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের মুটে মজুরের—
> —আমি কবি যত ইতরের।'

এই পংক্তিকে আধুনিক বাঙালি কবির credo বলতে তিনি কখনোই পারতেন না। আর আমাদের ধূসর পাণ্ডুলিপির কবির নাম জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ দাশ

নরেশ গুহ

সহজ চিত্রশিক্ষা
আলোর ফুলকি } অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, ১৲, ১৷৹

প্রথমটি ছোটোদের ছবি-আঁকা-শেখার বই। ছবি কী ক'রে আঁকতে হয়, সে-বিষয়ে শিল্পাচার্যদের রচিত প্রামাণিক পাঠ্যবইয়ের বিশেষ প্রয়োজন এখন বাংলাদেশে। প্রয়োজন এইজন্য যে নানা কাজেই ছবি আমরা ব্যবহার করি আজকাল, কিন্তু সে-সব ছবি সাধারণত যাঁরা আঁকেন, অনেকেই তাঁরা আঁকতে জানেন না। কথাটার কোনো বড়ো অর্থ নেই, এর তাৎপর্য নিতান্তই আক্ষরিক, অর্থাৎ, পত্রিকা, ছোটোদের বই, পাঠ্যবই, বিজ্ঞাপন—এ-সবের প্রয়োজন অনুযায়ী ছবি আঁকাই আজকাল যে-সব বাঙালির পেশা, তাঁদের মধ্যে এমন প্রায় একজনও নেই যিনি যে-কোনো বস্তুর বা জীবের অবিকল প্রতিকৃতি আঁকতে পারেন। ছোটো ছেলে আর ছোটো মেয়ে, ছ' মাসের শিশু আর দু বছরের বাচ্চা, পাঁচ বছরের আর আট বছরের ছেলে, সতেরো বছর আর পঁচিশ বছরের যুবক, পঁয়ত্রিশ বছরের মা আর কুড়ি বছরের মেয়ে, ইংরেজ আর বাঙালি, খরগোশ আর ইঁদুর, গৃহস্থের বসবার ঘর আর ডেনটিস্টের অপেক্ষা-ঘর—স্পষ্ট প্রভেদ বুঝিয়ে দিয়ে এর প্রত্যেকটি আঁকতে পারেন, তার উপর বিভিন্ন ভাবে-ভঙ্গিতে একই মুখ বার-বার দেখাতে

পারেন, এমন কি একজনও আছেন এঁদের মধ্যে? না—একজনও নেই—মানে, যাঁরা আছেন তাঁরা এ-সব ছবি আঁকেন না; আর যাঁরা আঁকেন তাঁরা এ-সব পারেন না, দেশের যে-কোনো আর্ট-স্কুলের পাশ করাই হোন না। আমার এ-কথা তর্কসাপেক্ষ নয়, যে-কোনো ছোটোদের বই খুললেই তার মর্মবিদারক চাক্ষুষ প্রমাণ মিলবে ভূরিপরিমাণে। ছবি বিশেষভাবে চাই ছোটোদের বইয়ের জন্যই, অথচ বছরের পর বছর আমাদের তথাকথিত শিল্পীরা অমার্জনীয় প্রতারণা ক'রে যাচ্ছেন দেশের শিশুদের সঙ্গে, আর আমরাও চুপ ক'রে তা সহ্য ক'রে যাচ্ছি। ছবি ব'লে যা বাচ্চাদের সামনে ধরা হয়, তার অক্ষমতা কখনো-কখনো কুশ্রীতার পর্যায়ভুক্ত; নিতান্ত দৈবের দয়া না-হ'লে গল্পের সঙ্গে ছবি কখনো মেলে না; গল্পের রসকে কিংবা রচনার শিক্ষাকে সাহায্য না-ক'রে ছবি ঠিক উল্টো কাজটি করে, পড়তে-পড়তে মনে স্বতই যে-ছবি জেগে ওঠে, তার প্রবল বিরুদ্ধতা ক'রে রীতিমতো বাধা দেয় উপভোগে বা শিক্ষাগ্রহণে। প্রতি বছর ছোটোদের জন্য যে-ক'টি জমকালো বার্ষিকী বেরোয়, তাতে ছবির জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রমাণ থাকে পাতায়-পাতায়, কিন্তু ছবি আঁকাই যাঁদের কাজ, তাঁরা কিছুই আঁকতে পারেন না ব'লে সে-অর্থব্যয় ব্যর্থ হয় অনেকাংশেই।

অথচ ছবি আঁকায় এগুলোই শুনি প্রাথমিক শিক্ষা। ইংরেজিতে ছোটোদের (এবং বড়োদের) রাশি-রাশি বইয়ে-পত্রিকায় যাঁরা নিরন্তর ছবি আঁকেন, শিল্পীমহলে তাঁরা নিচু জাতেরই; স্রষ্টা নন, প্রতিভাবান নন, নামও তাঁদের জানে না কেউ, বড়ো কাজও তাঁরা করেন না কখনো, কিন্তু যেটুকু করেন, সেটুকুতে খুঁত থাকে না তো। তাঁদের ছবিতে বাস্তবসদৃশতা একেবারেই নির্ভুল; ছোটো ছেলে ঠিক ছোটো ছেলে, যুবক অবিকল যুবক, নিগ্রো হুবহু নিগ্রো। অথচ এ-কথা মনে করতে পারি না যে চিত্রাঙ্কনে বাঙালি স্বভাবতই অক্ষম; এর একমাত্র কারণ এই মনে হয় যে পাশ্চাত্ত্য দেশে চিত্রাঙ্কন বিদ্যাটা সম্পূর্ণরূপে শেখানো হয়, আর আমাদের দেশে কিছুই শেখানো হয় না। হয় না যে তা তো বোঝা যায় আর্ট স্কুলে ছাত্রদের প্রদর্শনী দেখলেই। তাছাড়া, কোনো বাংলা বইতে কখনো কি কেউ দেখেছেন ছোটো ছেলের কি ছোটো মেয়ের জীবন্ত কাঁচা মুখ? কার্তিকের মতো টেড়ি-কাটা এক-একটি কাষ্ঠমূর্তি, আর ফুলো-ফুলো গালের এক-একটি

ডলপুতুল—এর বেশি বিস্তে এগোয় না কিছুতেই। আবার আমাদের শিল্পীদের মধ্যেই যাঁরা ইওরোপে রীতিমতো শিক্ষা নিয়েছেন, অন্তত অঙ্কনে তাঁদের হাতটি সাফ। সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমাদের দেশের ছবি ড্রয়িং-এ অত্যন্ত দুর্বল; এই দুর্বলতা লুকোতে চেষ্টা করেন কেউ খুব খানিকটা টকটকে রং ঢেলে, কেউ বা তথাকথিত ইণ্ডিয়ান আর্টের অস্পষ্টতায়, কেউ বা তথাকথিত যামিনী রায়ের সরলতায়। পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় আমাদের চিত্রকলা যে এখনো এত ক্ষীণ, তার প্রধান একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে চিত্রকলায় বাস্তবিকতাকে আয়ত্ত করবার আগেই আমরা বাস্তবিকতাকে অতিক্রম করার কথা ভাবি। এখন তো দেশ স্বাধীন হ'লো; এখনও কি ছবির এই দুর্দশা থাকবে আমাদের, এখনো কি আমাদের আর্ট-স্কুল শুধু নামকোয়াস্তে একটা মস্ত খেলাঘর থাকবে চৌরঙ্গিতে জাঁকিয়ে?

অবনীন্দ্রনাথের এই ২২ পৃষ্ঠার বইখানা বাচ্চাদের শেখাবার পক্ষে কতটা কাজে লাগবে বলতে পারবো না, তবে বয়স্ক যাঁরা ছবি আঁকেন কিংবা আঁকতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই এ-বইটি বহুবার পড়া উচিত। আর পড়া উচিত তাঁদের, যাঁরা সাহিত্যিক, কিংবা সাহিত্য ভালোবাসেন, কেননা রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'র পর এখানে আছে এক সুন্দর ছন্দোবদ্ধ বালভাষিত গদ্য। একটু নমুনা দিই:

> ঘরের চালে যখন আলো, চালের তলায় তখন অন্ধকার। বাক্সোর উপরে পড়ল আলো, বাক্সোর মধ্যে রইলো অন্ধকার। গাছের আগায় উড়ে বসল আলো; গাছের তলায় লুটিয়ে পড়ল অন্ধকার। পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলো-অন্ধকার পাশাপাশি রইল। কাহিম রোদ পোহাতে বসল, পিঠে পড়ল তার আলো, পেটের তলায় গড়িয়ে গেল অন্ধকার।

এমন রঙিন ভাষায় যে-বইখানা লেখা, দুঃখের বিষয় তার ছবিগুলির একটিও রঙিন নয়। ভাষার অ-দেখা রং আমাদের জন্য, ছোটোদের চাই ছবির চোখে-দেখা রং। আর বইখানা যদি ছোটোদের জন্যই হয়, তবে এক টাকা দামও বেশি হ'য়ে পড়ে—কেননা ক-খ-গ-র হাসিখুশির মতো ছবি-আঁকার হাসিখুশিও একখানা ছিঁড়লে তক্ষুনি আর-একখানা জোগান দেয়া তো চাই।

চিত্রশিল্পী আর ভাষাশিল্পীর আশ্চর্য সংযোগ ঘটেছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরে। শুধু এ-অর্থে সংযোগ নয় যে তিনি আঁকন-লেখন দু-ই করেন; চিত্রশিল্পীর

চোখ নিয়ে তিনি ভাষা লেখেন, এখানেই এই সংযোগের বিশেষ সার্থকতা। ওঅর্ডস্বর্থ-এর বচনটি অভ্রান্ত; চোখে দেখে যাঁরা না-লেখেন তাঁদের লেখা লেখাই হয় না: লেখকদেরও চোখে দেখে লিখতে হয়; কিন্তু চিত্রীর চোখের সঙ্গে কেমন ক'রে পাল্লা দেবেন লেখক? চিত্রীর মতো দেখবেন, আবার কবির মতো লিখবেন, এমন যদি কেউ থাকেন, তিনি তো অবাক ক'রে দেবেন আমাদের।

সে-রকম একজন আছেন বাংলাদেশে, আর তিনি আমাদের অবাক ক'রেও দিয়েছেন, সত্যি। অবাক হ'য়ে গেছি 'আলোর ফুলকি' প'ড়ে। ভাবতে পারিনি, এ-রকম বই বাংলাভাষায় সম্ভব। পুরোনো 'ভারতী'তে চাপা-পড়া এই বইটি উদ্ধার ক'রে বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন ছোটোদের বই হিশেবে, কিন্তু বলা বাহুল্য, প্রচলিত অর্থে ছোটোদের বই এটি নয়। ছোটোদের বই সাহিত্যপদবাচ্য হওয়ামাত্র আর তা ছোটোদের বই শুধু থাকে না, এটা পুরোনো কথা; কিন্তু 'আলোর ফুলকি' সম্বন্ধে বিশেষভাবে এই কথাটাই বলবার যে এটি বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটি অনন্য উদাহরণ। এত ভালো গদ্য, আর এত ভালো গল্প অবনীন্দ্রনাথ নিজেও আর কখনো লেখেননি। কুঁকড়ো নামে যে-মোরগ, তাকে অবলম্বন ক'রে তিনি প্রকাশ করেছেন বিশ্বজীবনের বিশাল মহিমা, কবির প্রতিভা, শিল্পীর সহজাত আভিজাত্য, আর দেখিয়েছেন প্রেম, পূর্বরাগ, ঈর্ষা, বিরহ, বিবাহ। 'বুড়ো আংলা'য় যেমন ভাষা মাঝে-মাঝে চাপা দিয়েছে গল্পকে, 'ক্ষীরের পুতুলে' যেমন গল্পটা নিতান্তই ছেলেমানুষি—এখানে সে-রকম কোনো অতৃপ্তির কারণ নেই; 'আলোর ফুলকি'র গল্পটি উজ্জ্বল, উদ্দীপ্ত, ঘটনায় বিচিত্র, চরিত্রণে জীবন্ত, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে বিকম্পিত। কবিত্ব—বোধহয় কবিতাই বলা উচিত—আর কাহিনী চলেছে গলাগলি দুই সখী, বর্ণনার বুকে বাসা নিয়েছে নাটকীয় রোমাঞ্চন। হান্স অ্যাণ্ডারসেনের শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে 'আলোর ফুলকি' তুলনীয় তো নিশ্চয়ই; তার উপর এ-বইয়ের প্রণেতাকে বলতেই হয় ওঅল্ট ডিজনির অগ্রজ, পড়তে-পড়তে যেন চোখে দেখি আর কানে শুনি একটি পুরো মাপের ডিজনি ফিল্ম। 'ব্যাঙ্গী'র বন বার-বার ভেসে ওঠে চোখের সামনে; সেই মায়া, সেই স্বপ্ন, সেই আনন্দ, আবার সেই সঙ্গে প্রকৃতিবিজ্ঞানীর নির্ভুল বস্তুচিত্রণ। 'ব্যাঙ্গী'তে যেমন

ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি ঝ'রে পড়ছে পাতা থেকে ঘাসে, এখানে তেমনি বৃষ্টির ফোঁটা হিরের মতো চিকচিক করছে জোছনায়, 'ব্যাম্বী'তে যেমন শীতের ডালে শেষ দুটি পাতার পরস্পরে কথা, এখানেও তেমনি ঘাসে-ঘাসে কানাকানি বসন্তের আনন্দিত বনে। রূপকথার মাতৃক্রোড়ের, কিংবা মাতৃজঠরের, সুখ অক্ষুণ্ণ রেখেও বয়স্ক চিত্তের খাদ্য জোগাতে পেরেছেন হান্স অ্যাণ্ডারসেনের পরে ওআল্ট ডিজনি, আর বাংলাদেশে 'আলোর ফুলকি'তে অবনীন্দ্রনাথ। এমন সৌভাগ্য কি হবে যে আমার চোখ-কান থাকতে-থাকতে ডিজনির মতো কোনো প্রতিভা আসবেন আমাদের মধ্যে, আর তাঁর জাদুকরী প্ররোচনায় 'আলোর ফুলকি'কে সত্যি-সত্যি চোখে দেখবো, কানে শুনবো?

ইতিহাসপরিচয়। সম্পাদকসংসদ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, প্রবোধচন্দ্র সেন, সুধীরচন্দ্র রায়, ক্ষিতীশ রায়। বিশ্বভারতী, ১৸০.

আমাদের খবর-কাগজ আর পাঠ্যবই আর কতকাল একটা আধ-মরা তরজমা-করা ভাষাকে আঁকড়ে থাকবে, কোনোদিন কি ভদ্রসন্তানের পড়ার মতো বঙ্গভাষায় লেখা হবে না—এ-প্রশ্ন আমার মনে প্রায়ই ওঠে। সম্প্রতি নতুন বাংলা দৈনিক অনেকগুলি দেখা দিয়েছে কলকাতায়, কিন্তু তার কোনোটির ভাষাই পনেরো বছর আগেকার 'বলটি ঘোরাইতে ঘোরাইতে উদ্দেশ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইল' ছাড়িয়ে বেশি দূর অগ্রসর হ'লো না। পাঠ্যবইও এখনো বেশির ভাগ তাঁরাই লিখছেন, বাংলা লিখতে যাঁরা কখনো শেখেননি—কিংবা বাংলা লিখতেও শিখতে হয় এটা যাঁদের ধারণার অতীত—আর সবচেয়ে বড়ো কথা, চলতি ভাষা এখনো সেনেট হাউসের মতে অভব্য আর রাইটার্স বিল্ডিং-এ অভাব্য। বাংলা পাঠ্যবইকে অপাঠ্যতার অভিশাপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ দুই খণ্ড 'সহজ পাঠ' লিখে, তারপর শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের জন্য বিশ্বভারতী ঐ গ্রন্থমালায় আরো কিছু প্রকাশ করেছেন। যে-দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থবির, আর শাসনতন্ত্র উদাসীন, সে-দেশে বিশ্বভারতীর এই প্রচেষ্টা একটিমাত্র আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে।

'ইতিহাসপরিচয়' চলতি বাংলায় লেখা, রীতিমতো বাংলায় লেখা। আকারে-প্রকারেও পাঠ্যবইয়ের নিষ্করুণ নিষ্প্রাণতা নেই। কিন্তু বইখানা ঠিক

ইতিহাসপরিচয় হয়েছে কিনা, সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হ'তে পারলুম না। কালানুক্রম রক্ষা না-ক'রে কতগুলি সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রথিত হয়েছে। প্রথমে প্রাচীন ধর্মের প্রবর্তক, তারপর দার্শনিক, রাষ্ট্রপতি, রাজা-বাদশা, সর্বশেষে কয়েকজন মহিলা—এঁরা যে মহিলা, এ ছাড়া আর কোনো যোগসূত্র এঁদের মধ্যে খুঁজে পেলাম না। (ইতিহাসেও separate electorate?) এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, সংশ্লেষণ-বর্জিত জীবনীগুলি প'ড়ে উঠে পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে কী-ধারণা হবে ছাত্রছাত্রীর? তাছাড়া সবগুলি জীবনীও কি পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত শিশুপাঠ্য ইতিহাস উল্লেখযোগ্য? হঠাৎ সন্ত ফ্রান্সিস কেন? সক্রেটিস ও কনফুসিয়সএর পরেই রাজা রামমোহন রায়ের নাম দেখলে কেমন লাগে? আবার 'করুণাময়ী' ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল! এদিকে এমন অনেকেই বাদ গেছেন, যাঁরা ইতিহাসের জনক: কলম্বস, গ্যালিলিও, ডারুইন; এমনকি, সারা বইটিতে ইওরোপীয় রিনাসেন্সের নাম-গন্ধ নেই। বইখানা ছোটোদের উপযোগী কয়েকটি জীবনীর সংগ্রহ হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস কোথায়? এ-ধরনের সারসংক্ষিপ্ত বিশ্ব-ইতিহাসের নিপুণ নমুনা তো এইচ. জি. ওএলস দেখিয়ে গেছেন, তাঁর পরিকল্পনা—অন্তত বিদ্যার্থীর বইয়ে—নিশ্চয়ই অনুকরণযোগ্য।

ইংরিজি Joan নামটির উচ্চারণ 'জোআন' নয়, 'জোন'। বাংলায় কেউ কেন মূল ফরাশি নামটি লেখেন না, তার উপর সকলেই কেন জোয়ান অব আর্ক লেখেন, সেটা একটু আশ্চর্যই লাগে, এমননিতেও কোনো মেয়ের নাম 'জোয়ান' শুনতে কি ভালো?

বু. ব.

রবীন্দ্রনাথের নতুন সংস্করণ

'পথের সঞ্চয়', 'বন-বাণী', আর 'প্রান্তিক'—এ-তিনটি বইয়ের নতুন সংস্করণ সম্প্রতি হাতে এলো। বিশ্বভারতীকে ধন্যবাদ দিতে হয় এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর তাঁরা মাত্র পুনর্মুদ্রণ ক'রেই তৃপ্ত হন না; যেখানেই সুযোগ আছে বা প্রয়োজন আছে, প্রকৃতই নতুন সংস্করণের দিকে লক্ষ্য রাখেন। 'পথের সঞ্চয়ে' সাতটি প্রবন্ধ আছে, যা ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে গৃহীত হয়নি; 'বন-বাণী'র গ্রন্থপরিচয় আরো সম্পূর্ণ; 'প্রান্তিকে' ১৩নং

কবিতার দুটি পূর্বপাঠ মুদ্রিত হয়েছে। শেষ বই দুটি সুদৃশ্য, উপহারের উপযোগী ; 'প্রান্তিক' তো শুভ্র বিলেতি র‍্যাগ-পেপারেই ছাপা, আজকালকার দিনে চোখে দেখেও সুখ, গন্ধটাও বিলেতি বইয়ের মতো মনোহর, কিন্তু অত ভালো কাগজ সত্ত্বেও ছাপাটা এপিঠ-ওপিঠ দেখা যায়, আর ভালো কাগজের জন্য আরো বেশি চোখে ঠেকে। আমাদের ছাপার দাম তো কেবলই বেড়ে চলেছে, ছাপার হাল ফিরবে কবে ?

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ত্রয়োবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হ'লো। এ-খণ্ডে আছে প্রহাসিনী, আকাশ-প্রদীপ, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যের পথে, তাছাড়া সংযোজন, পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপরিচয়। 'সাহিত্যের পথে'র অন্তর্গত 'সাহিত্যধর্ম' আর 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধ দুটির ইতিহাস গ্রন্থপরিচয়ে না-দেখে অবাক হলুম। জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা-ভবনে 'কল্লোল' আর 'কল্লোল'-বিরোধীর দুদিন ধ'রে যে বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, তাতে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন তা-ই অনতিপরে প্রকাশিত হয় ও-দুটি প্রবন্ধের আকারে। সে-সভার কোনো উল্লেখ গ্রন্থপরিচয়ে নেই, যদিও সে-সভা ঐতিহাসিক—অন্তত আমরা তা-ই মনে করি।

সম্পাদক ও প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা থেকে
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত

কবিতা

ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা]　　পৌষ ১৩৫৪　　[ক্রমিক সংখ্যা ৫৬

ডায়েরি

অমিয় চক্রবর্তী

তিন

চৈতন্যের প্রত্যন্ত নীচুতে
　　যেখানে আদিমা তন্ময়ী
　　মৃন্ময়ীর প্রাণসত্তা,
　　তারি 'পরে তুমি
　　　　চোখে মেলে হাসো, প্রাণ,
　　　　প্রত্যহ আমার গানে।
　　সে চেতনা কেন আজ ঘোর,
　　মেঘ হয়ে আড়ালের দৃষ্টি দূরে আনে,
অনন্ত তোমার চেনা কাছে দাও ফিরে ॥

চার

দয়া মায়া মৃত্যু প্রেম
　　মাটিতে ফোটাও—
সে-মাটি এই তো দেহ, কোমল নশ্বর
　　তারি ফুল ফোটে ধন্য অনন্তের ধন।
　　এ মাটির দেহ সেই অম্লান সুন্দর।

পাঁচ

একবার শুধু আলোর হাতুড়ি
মেরেছ তীব্র ভোরে
অন্ধ চেতনা চূর্ণ চূর্ণ ক'রে—
প্রোজ্জ্বল সেই চেতনা তখন
মৃত্যু পারায়ে আসে
প্রাণের আলোকে হাসে।
চেনা প্রীতিময় তোমার বাহুতে
তোমার নয়নে তোমার অধরে
নূতন মায়ায় ভরে ॥

ছয়

ধুয়ে যায় পৃথিবীর ধাপে ধাপে সিঁড়ি
মরণের নীল ঢেউ, প্রাণ জলধারা,
সোনালি শুভ্র বালি যেমন তটের।
অকূলের চাঁদ লাগে, তারা ওঠে ঐ,
ওরা চিরদিন স্নাত সূর্যের জলে
আলোর প্লাবনে রয় অচেতন দূরে,—
জীবনের ধন শুধু মাটির শ্যামলে
অশ্রুজলের এই খেলাঘরে জাগে।
শোনো বধূ, ধরণীর ধূলিময়ী তুমি
অসীমের ধন তবু চিরবাসরের,
অমরাবতীর বাঁশি বাজে এই ঘাটে।
বারেবারে এই পারে খেয়া আসে যায়,
হাসির সিঁদুর শাঁখে দাঁড়াও এখানে ॥

সাত

হে ঘরণী,
তোমারই এ সংসার ধরণী,
তুমি এ আকুল ঢেউ গুনো না, গুনো না
প্রাণের গর্জন ঝড়ে সুদূরে শুনো না,
বেয়ে চলো সংসার তরণী ॥

অ

হে চেতনা স্বপ্নস্থিতা এসো ফিরে চেনার আলোকে
চেয়ে দেখ চোখে।
ফেল তব কোমল নিঃশ্বাস।
বিশ্ববসুন্ধরা আছে প্রতীক্ষায় তোমারি নিত্য-বাস,
মেলে তার দিনময় ক্ষণ।
হে চেতনা, জেনো বধূ, একান্ত তাহারি তুমি ধন।
অপার আনন্দ তব দেখেছি এ প্রাণ লোকালয়ে
তরুলতা মানুষের উৎসবের সুখে দুঃখে ভয়ে,
চেয়ে আছে সংসার আপন ;—
হে চেতনা, দেহে তব সর্বস্ব আলোকে এসো ধন ॥

কাকে নিয়ে ঘর করো, দেখ চেয়ে ঐ
অনন্ত হৃদয়লক্ষ্মী শায়িতা মা ধরণীর কোলে,
যেন শিশুসম
নির্ভরিতা মৃত্তিকার, অজানা দেবতালোক হতে
স্বরূপিণী আমাদের মাঝে।
তাকে দেখ জ্যোতিঃ প্রেম অভ্রান্ত করুণ তাঁরি বুকে
নির্ভীতা সে তাঁহারি সম্মুখে একাকিনী।—

সে চৈতন্যময়ী এসে মানুষের প্রত্যহের ঘরে
শঙ্খ সিঁদুরের ক্ষণে দেখা দিল বধূ মহান্বিতা
জীবনের আনন্দ সুন্দরী ॥

যাকে চাও, ভালোবাসো, ভাবো যাকে চেনো
ঘরণী তোমার,
তীর্থের সঙ্গিনী সে কে ?
তোমার ভুবনধন তবু
ভাবো ঐ নিঃসঙ্গিতা কে তব রয়েছে,
লাবণ্যের আড়ালেতে সে প্রাণ কুসুম
অম্লানের মন্দিরে যে ফুটেছে তাঁহারি।
দিব্যের ললিতা তাকে এসো পূজা করো,
ভালোবাসা মিলে যাক্ ছলছল,
সৌর শুভ্রতায়।

পৌষপূর্ণিমা

বুদ্ধদেব বসু

কিশোর-ঈষৎ-শীত কোনো রাত্রে যদি-বা দৈবাৎ
সচ্ছল শরৎ সাজে, আশ্বিনের ইচ্ছারে যদি-বা
পূর্ণ করে অপুষ্পক অঘ্রানের প্রচ্ছন্ন প্রতিভা

রাশি-রাশি সেই ফুলে, যে-ফুলে কখনো কোনো হাত
আনেনি স্পর্শের জরা, যার স্পর্শ, যত বাড়ে রাত,
তত নামে নারী হ'য়ে, রক্তমাংসহীন, অপার্থিবা,

অসীমচুম্বনী, তবু চুম্বনের অতীত, অতীবা ;—
যে-গাছের সেই ফুল, তার নীল উল্লাস হঠাৎ
আকাশের শিরা দেয় ভ'রে :—তাতে কী ? কেউ কি দ্যাখে ?

...বালিগঞ্জে বাড়ির গম্ভীর ভিড় যদি কোনো ফাঁকে
মেলে দেয় একটু সবুজ, ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে
অচন্দ্রচেতন যুবা ঘণ্টা দুই ব্যাডমিন্টন খেলে,

রক্তমাংস তৃপ্তি খোঁজে খাদ্যে, তাপে, ব্যায়ামে, আরামে,
সর্বশেষে ঘুমের ঘনিষ্ঠ কোলে ; একই নিদ্রা নামে
বস্তির ফুর্তিতে আর প্রাসাদের মর্মর বিষাদে :

আকাশে অসীম চাঁদ কলকাতায় শুধু বাদ সাধে
কুখ্যাত পাখির ঘুমে, কর্কশ চীৎকারে দিয়ে ডাক
ফুটপাতের গাছের বিছানা ছেড়ে উড়ে যায়, নীড়

খোঁজে মেঘের নরম মোমে, ব্যর্থ হয়ে তীক্ষ্ণ শাঁখ
বাজায়ে নিখাদ কণ্ঠে—উতরোল, উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির,

চাঁদেরে বন্দনা করে শুধু কাক—শুধু কাক—কাক।

পৌষসংক্রান্তি

বুদ্ধদেব বসু

যদিও ঈষৎ দীর্ঘ দিন তবু কী দীর্ঘ শীত।
যদিও ক্কচিৎ দক্ষিণের ক্ষীণ কম্পনে হঠাৎ হাড়ে
বাতাস লাগে, তবু উত্তরে হাওয়ার হাত
এখনো গাছের কাপড় কাড়ে, সবুজ সোনায় পড়ে ডাকাত,
রুদ্ধ রাত, শীর্ণ দিন। কৃষ্ণচূড়ার শূন্য ডালে
যদিও একটি ছোট্ট পাতা দিয়েছে উঁকি
তবু তো শীত, এখনো শীত, কৃষ্ণচূড়ার অনেক দেরি,
গ্রীষ্ম এখনো অনেক দূর।

কাল থেকে, যাক, পড়লো মাঘ।
আজ দেখি তাই সকাল থেকে
দল বেঁধে পাতা ঝ'রে-ঝ'রে দিলো
আঁচল পেতে, আসবে ব'লে বাংলাদেশের বিয়ের ঋতু
রঙিন দিন, উতল রাত। যুগল রাত, মাঘের রাত
শীতের নয়, দীর্ঘ নয় ;— পৃথিবীর যৌবনের দিন
যাদের হৃদয়ে অন্তহীন, জীবনের উন্মাদ নবীন
গ্রীষ্ম যাদের বাহুতে বাঁধা— সেই সব নব দম্পতীরা
সুখী হোক, আহা, সুখী হোক।
জীবন যখন গ্রীষ্মহীন,
কৃষ্ণচূড়া ফোটে না আর ;
পৃথিবী শুধু ছড়ায় জরা,
ঝরায় পাতা, তখনো তারা
সুখী হোক।
যখন শীত বাড়ায় হাত, একলা রাত, শুকনো বুক,
তখনো হাতে একটু থাক একটু তাপ একটু সুখ।

একটি শীতের দ্বিপ্রহরে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাদুর বিছিয়ে নরম ঘাসের 'পরে
আজকে শীতের শান্ত দ্বিপ্রহরে
তোমকে ভাবার ভাবনা জাগলো মনে—
বাঁচবো কি শুধু তোমাকে আঁকড়ে ধ'রে ?
রৌদ্ররঙিন অদূরে অশথ-শাখা
আহা কী মায়ায় পাতার বসন খুলে
রিক্ত দেহকে আকাশে দিয়েছে তুলে—
রোদের মমতা গভীর আবেশে মাখা।

আজকে শান্ত শীতের দ্বিপ্রহরে,
আয়ুহারা ঝরা লক্ষ পাতার রাশি
হালকা হাওয়ায় সকরুণ মর্মরে
কেন যে শোনায় গান-ফুরানোর হাসি ?
আমার মনের সপ্তমহল জুড়ে
খাপছাড়া এই আবছা ভাবার দিনে
যে-সুর বাজলো নম্র কম্প্র সুরে,
আহা সুমধুর ঐ যে অদূর গাছে
আমারি মনের সেই সুর বুঝি নাচে ॥

এমনি সে কোন দুপুরবেলায় কেন
শুনিয়েছিলে সে-কাঁকনের রিনিরিনি
সেই সুরে ঝরা পাতাগুলি উড়ে-উড়ে
ব'লে যায় যেন আমরাও তাকে চিনি।

ওদিকে শীতের রৌদ্র আকাশ জুড়ে
ডাকলো আমাকে গানের নিমন্ত্রণে,
সে-গানের সুর দুখানি চিকণ হাতে
বেজে ওঠে যদি সকরুণ কঙ্কণে,
হেসে ওঠে যদি দুটি কথা-ভরা চোখ
জানবো পেলাম তোমার স্বর্গলোক।

তারপরে যদি এমন দ্বিপ্রহর
মুছে ফেলে দেয় বৈশাখী কালো ঝড়,
তারপরে যদি ভেঙে মর্মরতান
শকুনি-চঞ্চু-আঘাত অতি প্রখর
ভাবনাকে করে কালি-মাখা অপমান,
উল্লসি' ওঠে মেঘের উচ্চস্বর,
তবু সব ঢেকে সে-মধু মুখর গান
হে সোনার মেয়ে, স্বপনসঞ্চারিণী ,
বাজবে তোমার কাঁকনের কিনিকিনি ॥

এখন ক্লান্ত দুপুর

অশনি গুপ্ত

এখন জীবনে ঘনায় ক্লান্ত দুপুর,
দুমুঠো আবীর, চকিত গানের নূপুর।
ভোরের আলোয় স্বপ্নখচিত সোনা
সুরের টানেই সুরের আলিম্পনা
মিলবে কোথায়? মিলবে না এই ধুলোয়;
এখানে দুপুর ক্লান্ত জীবন উড়োয়।
আর
উষ্ণ হাওয়ায় শুকনো পাতাই কুড়োয়।

এখন আকাশ ঝলসানো চোখে চায়
রুক্ষ দৃষ্টি, মনের গভীরে ছায়
আরেক ক্লান্তি তোমাকে আমাকে ঘিরে
এইখানে এই ভাঙা বন্দরে তীরে :
দুচোখে পাইনে সবুজ স্বপ্ন থরোথরো কালো মেঘ,
তোমার আঁখির ছায়াকম্পিত বেগ,
তোমার চুলেও তোমার হৃদয়কূলে
এখন জীবনে রুক্ষ ধুলোই, মূলে
পীড়িত স্নায়ুর, অন্ধকারের নির্বিরোধেই পাওয়া;
ক্লান্ত দুপুরে রোদে ঝলসানো হাওয়া
জগতে জীবনে এনেছে অবোধ মিল
কোথায় সবুজ কোথায় আকাশ নীল?

এইখানে এই ভাঙা জীবনের হাটে
শুকনো ঘাসের পীঠভূমি এই মাঠে
বোশেখী হাওয়ায় চকিত পাওয়ার মতো
বাসনাসিক্ত মনের স্বপ্ন যত
উড়িয়ে দাও তো ক্লান্ত হাওয়ায় হাওয়ায়
দ্বিপদী ছন্দ, স্বপ্নে কুড়োনো নূপুর
এখন ক্লান্ত দুপুর ॥

রেখাগুলি ঝ'রে গেলে পর…

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়সের রথে চেপে সেই সব রেখার প্রস্থান
দিনে দিনে আমি দেখে যাই,
তোমার ও-দেহতটে তাই
ভীরু প্রেম কাঁদে ম্রিয়মাণ !
চোখ মোছো, চেয়ে ছাখো, শীতে পীত…পাতা-ঝরা গাছ,
তুমি, আমি…সবাই সমান।

এসো ভাঙি স্মৃতি-বৃতি দেহ-কামনার
এসো ছিঁড়ি রঙচঙে নির্ব্বয়নী ;
ফেলে রেখে গেছে যেটা ক্ষুধার নাগিনী
দু'জনেই যাকে খুব ভালো ক'রে চিনি
একদা যা ঘিরে ছিলো দেহ দুজনার।

তনু ভ'রে একদিন শুনেছি তো রেখার ক্রন্দন
ঝ'রে গেছে সেদিনের সে-অভিনন্দন।
লাবণির লালিম লোভনি
থাকে না তো ; তুমি জানো, আমিও তা জানি।
স্থূল রেখা চ'লে যায় মেদ-বসা-ত্বকের বাহনে
তবে কেন…তবু কেন কান্না জাগে প্রাণে ?

দেহাশ্রয়ী আলেখ্যের এই সব রেখার আড়ালে
আত্মা আছে জানে না যা মৃত্যুর নিদান।
ক্ষিপ্রগ যৌবনের যাযাবর রেখারা পালালে
থাকে তবু অন্য এক প্রাণ।
এসো আজ সেই পুঁজি নাড়াচাড়া করি
সেও—সেও নয় ছোটো দান।

এ-সব স্খলিত রেখা চ'লে যায় যৌবনের দেশে,
অন্য সব তনুপটে ওঠে গিয়ে অনুরাগে হেসে।
তা ব'লে কি আমাদের নেই আর পৃথিবীতে স্থান ?
আছে, আছে, উপায়ন আছে,
অন্য মূল্য নিরিখের অন্য কোনো মান।

জীবন সমুদ্রে জাগে নিত্য নব যৌবনের দ্বীপ
ক্ষণেক উজ্জ্বল থেকে ক্ষীণ হয় প্রেমের প্রদীপ
এ তো জানা কথা।
তা ব'লে কি বলা যায় প্রেম শুধু রেখার মমতা ?
নইলে কেমন ক'রে শেষ হ'লে রৈখিক জীবন
আত্মায়-আত্মায় হয় অতিক্রান্ত যৌবনের তন্তর সীবন ?

বনমানুষের ছা

বারীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সূয্যি ওঠে পুবগগনে, ঝলসে ওঠে গলি,
টুকরি মাথায় দিনের কাজে নামলো ঘুঁটেওলি।
গা ঢাকবে এমনতরো কাপড়টা না জোটে,
খাওয়া পরার দোটানাতে লজ্জা গেছে টুটে।
ছেঁড়া ট্যানাও লজ্জা দিতে এখন পারে না,
না-খেয়ে তার নেই কিছু আর ঢাকার মতো গা।

থপথপাথপ পাঁচ আঙুলে দেয়ালে দেয় ঘুঁটে,
তারি সঙ্গে বকরবকর খইয়ের মতো ফোটে।
উলঙ্গ তার ছেলে ছুটো গোবর তুলতে এসে
সারা গায়ে গোবর মেখে খেলছে হেসে-হেসে।
তাই দেখে সব বাছা-বাছা দিচ্ছে গালি মা,
পিতৃকুলে জ্যান্ত-মরা বাকি রইলো না।

ক্ষুণ্ণ চোখ ফিরায়ে নিই পুব জানালার দিকে,
নিচে আকাশ টকটকে লাল, উপরটাতে ফিকে।
উষা-বধূর সজল ঠোঁটে লক্ষ সোহাগ-রেখা,
ঝলকে ওঠে শিশিরকণায় চুমোচুরির লেখা।
ঝিরিঝিরি ঠাণ্ডা হাওয়ায় শিউরে ওঠে গা,
জীবনটা যে এত ভালো, ভাবতে পারি না।

ঘরের মধ্যে ব'সে আমি, খোলা বইয়ের পাতা,
শাদার বুকে এই যে কালো, কী-ই বা আছে হেথা।

কোন সাগরে জাল ছড়ালো যুগের চাওয়া পাওয়া,
কিসের খোঁজে এই অকূলে মনের খেয়া বাওয়া।
ভোরবেলারই আলোর মতো ছড়ায় ভাবনা,
কত মধুর, কত মহান ভাবতে পারি না!

এদিকে ঐ ঘুঁটেওলির ছেঁড়া ট্যানার ফালি
তারি গলায় দিচ্ছে সারা জগৎটাকেই গালি।
তবু ভোরের আকাশ ভ'রে সোনার মতো আলো,
কত মধুর, কত মহান বইয়ের শাদা-কালো।
এরই মধ্যে ব'সে আছি বনমানুষের ছা
জীবনটা যে কেমনতরো ভাবতে পারি না।

মডার্ন কবিতা

প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু

এক শীতের দুপুরে সুকান্ত আমার হাতে নীল সৌখীন কাগজে তৈরি সুদৃশ্য একখানা খাতা এনে দিয়ে বললো—'কবিতাগুলো পড়বেন। কাল আবার যখন আসবো বলবেন কেমন লাগলো।' গোটা-গোটা অক্ষরে বহু যত্নে লেখা গুটিকয় গদ্যছন্দের কবিতা। প্রথম প্রয়াসীর অনিশ্চয়তাজনিত দুর্বলতা প্রায় সব কবিতাতেই। কিন্তু এত যত্নে, এত দরদ দিয়ে কপি করা যে একটিমাত্র কাটাকুটিও কোনোখানে নেই। দেখেই বোঝা যায় রচনা কটি রচয়িতার কত আদরে লালিত। কয়েকটি কবিতা আমার বেশ লাগলো। পরদিন সুকান্তকে জিগেস করলুম—'কার লেখা?' অত্যন্ত ব্যথিত হলুম শুনে যে কবিতাগুলি যাঁর রচনা তিনি আর বেঁচে নেই। মৃত্যুর চার-পাঁচ মাস আগে খাতাখানি তিনি সুকান্তকে দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল কবিতাগুলি আমি পড়ি। প্রভাতকুমারকে আমি চোখে দেখিনি, তিনিও আমাকে না। তবু কেন তাঁর এই ইচ্ছে হয়েছিল আমি জানি না। সুকান্ত অসুস্থ থাকায় খাতাখানি যথাসময়ে আমার হাতে পৌঁছয়নি; এবং তাঁর কাব্যের প্রতিশ্রুতি যে উৎসাহজনক, এ-কথা পাঠকের হ'য়ে আমার মুখ থেকে শোনার আগেই তাঁর মৃত্যু হোলো।

তাঁর জীবন সম্পর্কে সুকান্তর কাছে এইমাত্র শুনেছিলুম যে বয়সে তিনি নবীন এবং খিদিরপুরের জাহাজের ডকে জীবিকার জন্য কাজ করতেন। খিদিরপুর তাঁর অন্নের সংস্থান ব'লে সেটাকেই জীবনের পরম সত্য তিনি যে কখনো ভাবেননি এইটেই তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যে সুন্দরের সপক্ষে, এ-কথা স্পষ্ট স্বরে ঘোষণা করতে আধুনিক তরুণ হ'য়েও দ্বিধা ছিলো না তাঁর।

সুকান্তও নেই। প্রভাতকুমারের এই একটি কবিতারই কপি করে সে আমাকে দিয়েছিল। কবিতাটি আপনার কাছে পাঠাই।

নরেশ গুহ

তোমাদের সাহিত্যের আসরে
যখন আমাকেও বললে
কবিতা লিখে আনতে
এবং তা পড়ে শোনাতে
তখন 'না' বলতে পারিনি সবার সামনে
(কারণ কবিতা লেখা শক্ত হতে পারে
কিন্তু তার চেয়েও শক্ত মান খোয়ানো।)

অন্তরালে অবশ্য ভেবেছিলাম
কবিতা লেখা এমন কী শক্ত হবে,
যখন মডার্ন কবিতা পড়লেও
অপাংক্তেয় হব না?
মডার্ন কবিতাই না-হয় লিখব।
নেহাৎই পুরোনো দলের লোক বলে
যদি ঠিক মডার্ন হতে না পারি
তা হলে না হয় "কেতকী, করবী"র
স্যাচেলে মারব টান।
তাদের পুরোনো থলি থেকেও
নতুন অনেক কিছু বেরোবে
যা জোড়াতাড়া দিয়ে খাড়া করা যাবে
আমার মহিমময় মডার্ন কবিতা।

আর তাও যদি না পারি?
যদি স্যাচেল টানতে পিঠে
স্যাণ্ডাল পড়ার ভয় থাকে?

তবু ভয় করি না, কারণ
এখনও তো চৌরঙ্গিতে মার্কিন সৈনিক
বুক ফুলিয়ে ঘোরে
ইঙ্গ গণিকার কটিবেষ্টন ক'রে ;
"চীনা গণিকা"র নগ্ন উল্লাস
এখনও তো থেমে যায়নি
জাপান হার মেনেছে বলে।
"হাওড়ার বাসে বাসে সংঘর্ষ"
আর উন্মত্ত জনতার "রলরোল"
এখনও তো শান্ত হয়নি।

এ-সবে সুবিধা না হলেও
অসুবিধা হবার তত কারণ নেই
বিশেষ এখনও যখন আশা আছে ইনটেলেকচুএল হবার।
না, আমি ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান সাহিত্যের ধার
ঘেঁষেও যাব না
যেহেতু সেখানে নাক ঢোকানো তত সহজ নয়,
নানা রকম পণ্ডিতরা তা বুঝে ফেলবে।
আর রাশিয়ান সাহিত্য ?
(ওরে বাবা, লাল রক্ষীবাহিনীর
উঁচোনো সঙিন রঙিন করে দেবে।)

তার চেয়ে বরং হেড 'পেডেণ্ডা'কে ডাকব
তাঁর কাছ থেকে শুনব ঐতিহাসিক কাহিনী
আর কবিতায় লাগাব "উথ্‌ংসিত" আর
"ভিরভ্রিংগট্রে"র ভীড়

কিংবা আকবরের "হাবারফ্লুয়াস ইনফ্যাচুফুয়েশনের"
কাহিনী শোনাব নবীন ভাবায়
যাতে ক'রে "চীনে ভাষার একদম সোজা সোজা অক্ষরে"র মত
কিছুটি বোঝবার উপায় না থাকে
তবে তো অন্তত কবিতা তৈরি হবে—
মডার্ন কবিতা—আর ইনটেলেকচুএল নাম রটতেও
হয়ত দেরি হবে না।

আর "স্টালিনগ্রাড"—নির্মম নির্ভীক—
সেও তো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে
সেখানে উঁকি মারব না হয়
(শেকস্‌পিয়র যেমন মারিআনের রান্নাঘরে)
আর "সারা দুনিয়ার জনজাগরণের ফলে
যে সমাজতন্ত্রমূলক নূতন সাহিত্যে"র সৃষ্টি হচ্ছে
আমার লেখায় তার ইঙ্গিত থাকবে।
আমার লেখায় স্পষ্ট ভাষায় থাকবে প্রতিবাদ
"ডেকাডেন্ট বুর্জোআ" লেখকদের বিরুদ্ধে।
তাহ'লে তো সাহিত্যের আসরে পড়বার মত
কবিতার সৃষ্টি হবে।
তাহ'লে তো দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতা নিয়ে
তোমরা প্রতিবাদ জানাবে না।
লেখার মধ্যে চাবুকের তীব্রতা না থাকলেও
উদ্দীপনার উন্মাদনা তো অনুভব করবে ?
তা হলেই হল, তবেই তো সার্থক হল আমার সহিত্যসৃষ্টি,
কারণ সে তো আমার জন্য নয়
সে যে দশজনকে আনন্দ দেবার জন্য।

কামানের গোলা, আর ট্যাঙ্কের আগুন,
আর ভাঙা বাসন, আর পচা ইঁদুর
আর আরও অনেক কিছু—এরাই ত কেবল
বাস্তবতার প্রতীক।
আর বাস্তবতাই যদি না থাকলো
তবে কি সাহিত্য সাহিত্য হ'তে পারে ?
সে তো দাঁড়ায় রচনায়।
এ খবর তোমাদের ভালো ক'রেই জানা আছে
আমার চেয়েও বেশি ভালো ক'রে!

কিন্তু ভাবানুষঙ্গ ?
তার কথাও ভুললে চলবে না,
সে-ও 'মডার্ন' কবিতার প্রতীক
তারও স্থান আছে বিশিষ্ট সাহিত্যে :
"সামনেই স্লিট ট্রেঞ্চ
লোকটা কি ফ্রেঞ্চ ?
আহা খাসা ফরাসীর দেশ।"
তেমনি আজ রাশিয়ার মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে
লাল লালফৌজ, রক্ত মেখে লাল ;
লেনিন আর স্টালিন আর
মলোটোভ আর পটসডাম
আর ইয়াল্টা আর বিশ্বের শান্তির
সমাবেশের সমবায়
ঢোকাতে হবে আমার কবিতার বিষয়বস্তুতে,
তবেই হাততালি পাওয়া হবে সোজা।

কিন্তু এ সব ছেড়ে
যদি আমি কবিতা লিখি তাকে নিয়ে
যাকে নিয়ে সব চেয়ে বেশি লিখতে ইচ্ছে করে,
কলম নিয়ে কাগজের কাছে বসতেই
মনের মধ্যে গুনগুন ক'রে উঠছে যার হাসি, কথা, চাউনি,
কলকাতার কঠিন পিচের রাস্তা
যার কথা ভেবে অলকনন্দা হ'লো,
হাওয়ায় যার চুল গালে এসে পড়লে
চোখের তারার প্রতিবাদ কবিতা লিখে দেয়,
তাকে নিয়ে যদি কবিতা লিখি,
তাহ'লে ?
তাহ'লে তো তোমরা আসবে সঙিন উঁচিয়ে,
বলবে আমি এস্কেপিস্ট, বাস্তবে নাস্তিক।
আর পৃথিবীটা শুধু চাঁদ আর তারা আর রোমান্স নয়,
এবং
আরও নানারকম বাছা-বাছা বিশেষণ
নিক্ষেপ করবে আমার ব্যক্তিগত জীবন লক্ষ্য ক'রে।
অতএব থাক
তোমাদের সাহিত্য-আসরের জন্য কবিতা লেখা
না-হয় আমার না-ই হ'লো।

বলো, বলো, বলো

প্রমথনাথ বিশী

তুমি আমার মনের কথা জেনে ফেলেছো
ওইখানে তোমার জিত।
আমি তোমার মনের কথা
জানতে পারলাম কই ?
আপন অন্তরের অগাধ রহস্যের মধ্যে বসে' আছো
অমাবস্যার করপুটে
দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলটির মতো,
ঠিক এতটুকু আলো
যাতে দেখা না দিয়েও দেখতে পারো অনায়াসে।

সত্যি তোমায় জানতে পারলাম কই ?

যদি বলি তোমায় ভালোবাসি,
তুমি হাসো।
যদি শুধাই আমায় ভালোবাসো ?
বলো—না।
এত নিশ্চিত, এত অসংশয়।
মরুভূমির সূর্যোদয়ও বুঝি
এত নিষ্কলুষ নয়।
যদি বলি কেন ভালোবাসো না ?
অমনি বলো কেনর উত্তর নেই।

এত দিনেও ওই প্রশ্নটির উত্তর পেলাম না।
ছোট একটি প্রশ্নের কি মহতী সম্ভাবনা।

কেবলি শুধাই, কেন, কেন, কেন ?
কেবলি উত্তর পাই, কেনর আবার উত্তর কি ?

ওই উত্তরহীন উত্তর দেবার সময়ে
কখনো মুখ তুলে চাওনি।
হঠাৎ একদিন চোখে চোখে গেল ঠেকে,
প্রত্যাশিত উত্তর গেল বেধে,
শুধু বললে—তুমি না কবি ?
বললে, কবিরা নাকি অন্তর্যামী।

না গো না, তবে আমিও বলি,
আমি কবি নই, শিল্পী নই,
আমি অন্তর্যামী নই।
আমি মনের কথা মুখে শুনতে চাই,
মনের কথাকে দেখতে চাই
তোমার দুই চোখে প্রস্ফুটিত
মানস সরের অন্তর্ভেদী
উদ্যত, উদগত উদ্ধত পূর্ণায়ত পদ্মটির মতো।

আমি মনের কথাকে দেখতে চাই
তোমার সর্বাঙ্গে প্রতিফলিত,
তোমার বসনে ভূষণে,
নয়নে অধরে,
তোমার সাঁথির সীমান্ত থেকে
পায়ের নখাগ্র অবধি
সূর্য্যকিরণে কচি নারিকেলগুচ্ছ
যেমন চোখ ঝলসিয়ে দিতে থাকে, তেমনি।

প্রসারিত পদ্মপত্রের মসৃণ নীলিমায়
সেই কথাটি টলোমলো ক'রে উঠুক
তোমার অন্তরের শুক্তিনিঃসৃত
একটিমাত্র মুক্তার মতো।
বলো, বলো, বলো ॥

এত দূর

মৃণালকান্তি দাশ

পোড়ো বাড়ির কাঁঠাল গাছে ডাকে হলুদ পাখি,
আর ডালে লেজ নাড়ে কাঠবিড়াল।
বেড়ায় ঝুমকো লতায় বেগনি ফুল,
বেগনি রঙের অনেক ফুল—
আলো ছায়া কাঁপে কচি পাতায়,
উড়ন্ত প্রজাপতি ঘাস গাছ পাখি—
এক অলস স্বপ্নের ছুপুরে
বাইরে চেয়ে আছি।
তোমাকে মনে পড়ে—
তোমার গান দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে
আমার মনকে কতবার ছুঁয়ে গেছ,
কিন্তু আজো খুঁজে পেলাম না
তোমার মনকে।

সেদিন আকাশের বুকে যখন চাঁদ,
ছোট ঘরে আমরা :
তোমার কোলে এস্‌রাজ, লুটিয়ে পড়েছে খোঁপার ফুল,
আর ম্লানাভ রাত্রির অন্ধকারে ছড়িয়ে গেছে
এক অপরূপ সুরের ইন্দ্রজাল।

তোমার নয়নে নির্জন নক্ষত্রের স্বপ্ন,
তোমার চুলে কত রাত্রির জমাট অন্ধকার
তোমাকে ঘিরে অনেক, অনেক
বিস্মৃত যুগের মায়া,—

এমনি কাটলো কত জাগর মধু রজনী
আর স্বপ্নের দুপুর
কিন্তু আজো ছুঁতে পারলাম না
তোমার মনকে,
এত কাছে থেকেও তুমি এত দূর।

হে আকাশ

বিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কথা হয় পরস্পর
হাওয়ার তরঙ্গে আর পল্লবমর্মরে।
জলের স্রোতের মতো ঘুরে ফিরে
মনের অরণ্যে কাঁপে সে-কথার স্বর।
হে আকাশ
ক্ষণের বনের
ক্লান্ত রিক্ত যদিও সময়,
তোমার মনের নীল
নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের তীরে
অধীর উচ্ছ্বাসে বাজে
ছলছল কথার কম্পন।
কী বিস্ময় তুমি!
মনের অরণ্যে ডেকে আনো
কথার তরঙ্গ আর পাতার উচ্ছ্বাস।
ভাঙো রুদ্ধ ঘরের স্তব্ধতা
ক্ষণের বনের
মনের মর্মরে, হে আকাশ,
আশ্চর্য আকাশ।

দুটি কবিতা

অরুণাচল বসু

১

কত নীল রাত হাওয়ায় হারালো,
কত স্বর্ণাভ দিন,
কত স্বপ্নের কুরঙ্গ-খুর
দূরান্তে হ'লো লীন :

শ্যাম অরণ্যে সুরু সরণীর
লাল প্রান্তরে ছাড়া
শুক্লা পরীকে বেঁধেছে আমার
খর সূর্যের কারা ;

কৃষ্ণা, তোমার দু'চোখ তবু তো
আজো অম্লান দেখি,
ধুলোয় হারানো দিনেরা অমর
স্মরণের বর্মে কি ?

শুধু কি স্মরণ, কালের দলিলে
রাখো নাই স্বাক্ষর ?
দু'হাতে যদি না দোলাও স্নায়ুকে
তোলে তবে কিসে ঝড় ?

যদি না আমার মনের মাটিতে
ভূমিচম্পার মতো
ফুটে থাকো একা অন্তর্লীন,
সৌরভ কিসে হ'তো ?

কৃষ্ণা, তোমার কৃষ্ণ পক্ষ
মর্মের নভলোকে
চির-উড্ডীন, চক্ষুষ্মান
জীবনের নির্মোকে :

তুমি শরীরিণী কাব্য আমার,
অপরিশোধ্য ঋণ ;—
যত নীল রাত হাওয়ায় হারাক,
যত রৌদ্রালু দিন।

২

তুমি তো আকাশ আজ
আমি স্তব্ধ মাটি,
মাঝখানে দোলায়িত
অবশিষ্ট স্বপ্নের ছায়াটি।

আকাশে বজ্রের শব্দে
বিস্মৃতির ডাক,
আবেগের শীর্ণ শাখা
তাও বুঝি পুড়ে হয় খাক :

অতীতের রাত্রে ডাকে
উজ্জ্বল আগামী—
তুমি শূন্যে থাকো মূক,
সাড়া দিতে চ'লে যাই আমি।

ট্রেন

নরেশ গুহ

স্বর্গের করিনি আশা।
অলকার অলীক বৈভব,
স্বর্ণপারিজাত আর বাসবের অমৃত আসবে
ভাবিনি যে কোনোকালে একতিল অধিকার হবে।
ত্রিলোকবাঞ্ছিতা নটী উর্বশী রম্ভার
অপরিবর্তন রূপ কখনো ভাবিনি।
যে-স্বপ্নসম্ভার
মৃত্যুর সীমান্তগামী সুদীর্ঘ ট্রেনের
খোলা জানালার ফাঁকে দেখা দিয়ে তখুনি মিলায়
আশায় উজ্জ্বল চোখে ক্ষণিকের বিস্ময় বিলায়,
কখন পেরিয়ে গেছি শেষরাতে আলোজ্বলা ঘুমে অচেতন
সেই সব স্বপ্নময় অজানা স্টেশন।
কখন ছেড়েছে গাড়ি, থেমেছে কোথায়,
ঝুড়ি ও জলের কুঁজো হাতে ক'রে কে উঠলো, কারা নেমে যায়,
করবীর ডালে ব'সে ডেকে যায় যে-পাখীটা কী যে ওর নাম,
আনমনে ছাড়িয়ে এলাম।

প্রকাণ্ড সূর্যের নিচে শ্রমে তিক্ত, জ্বরে মূর্ছাতুর
আকাশ-পৃথিবী-ভরা প'ড়ে আছে নির্বাক দুপুর।
আদিগন্ত রেলপথ—অনিশ্চিত অনন্ত সময়—
জীবনের লৌহচক্র অক্লান্ত ইচ্ছায় পার হয়।

মুহূর্তের বনপথ, মুহূর্তের মাঠ,
জ্যোৎস্নায় কুঞ্চিতরেখা হ্রদের ললাট,
গোধূলিতে হাটফেরা মানুষের ভিড়—
পার হ'য়ে মধ্যরাতে অজানা নদীর
নির্জন পাড়ির 'পরে চিরতরে থেমে যাবে ট্রেন :
প্রশ্ন শুধাবে না কেউ—'কোথায় যাবেন ?'
আকাশ দেবে না আলো, স্বর্গ পাঠাবে না
অমরার করুণার সেনা।

যেতে-যেতে চেয়ে দেখি, অবসন্ন মহানগরীর
ওপারে পোহায় রোদ আকাশের আশ্চর্য শরীর
আলোর সমুদ্রে সেরে স্নান।
অতলান্ত নীল তার চোখে ভরা প্রাণ।

আমার সামান্য রুটি, সামান্যই জল।
ট্রেনের সম্বল
কর্কশ কম্বলে ঘেরা অপ্রসর শয্যা-ভরা রাত,
তাই নিয়ে জেগে ব'সে আছি। অকস্মাৎ
ছবির মতন ছোটো কোনো এক ইস্টিশানে ওঠে যদি সেও
যারে ভেবে এতকাল হৃদয়ে তুলেছি এত ঢেউ
এসেছে যে কতদূর আপনার ঘর থেকে তার
মাঠের শিশির ভেঙে, ফেলে তার মায়ের সংসার,
ফেলে তার দীঘি-ভরা ছলছল গলাগলি জল,
ট্রেনের বাঁশির সুরে উতলা চঞ্চল ;
সুন্দর কপালে আঁকা বিন্দু-বিন্দু ঘাম,
ভোরের ঘুমের মতো স্নিগ্ধ যার নাম ;

যে আছে অপেক্ষা ক'রে সহস্র নিদাঘে ভরা যেন এক ছায়া
স্নুশীতল,
—তারে নিয়ে তবে আমি ভাগ ক'রে খাই
তৃষ্ণার পবিত্র তীর্থে সামান্য পাথেয় এই জল।
কর্কশ কম্বলখানি—মমতা চিত্তের—ছেড়ে দিই তারে,
জীবনের অপরূপ সীমান্ত-ট্রেনের
উন্মোচিত জানালার ধারে।

তখন পাহাড়তলে বিকেলের ছায়া নামে   না-হয় নামুক
এদিকে ওদিকে,
সূর্যের জ্বলন্ত চোখ পশ্চিমের মেঘে
হয় হোক ফিকে।
চোখে তার চোখ রেখে জীবনের জানালায়
আমি শুধু বসি দণ্ড কয়:
না-হয় সে নেমে যাবে পরের স্টেশনে,
—যাবেই না-হয়।

কবিতার প্রদর্শনী

অপর্ণা চক্রবর্তী

গত জুন মাসে লণ্ডনে এক অভূতপূর্ব প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেল। প্রদর্শিত বিষয় ছিল ইংরেজি কবিতার বইএর প্রথম অথবা প্রাচীনতম সংরক্ষিত সংস্করণ—আর এতে স্থান পেয়েছিল 'ক্যাণ্টরবরি টেলস' থেকে 'ব্লাইণ্ড ফায়ারওয়ার্কস' পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের অসংখ্য উল্লেখযোগ্য ও অনুল্লেখযোগ্য কবিতার বই। এ সব প্রাচীন সংস্করণ বহু আয়াসে সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

কলেজের পুরোনো লাইব্রেরি থেকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক অখ্যাতনামা পুস্তকাগার—বাকিংহাম প্যালেসের অসূর্যম্পশ্যা বিরাট গ্রন্থশালা থেকে সাধারণ পাঠকের খামকা খেয়ালে কেনা আধ আলমারি বই—সব কিছুতেই হানা দিয়েছিলেন জন হেওয়ার্ড, এবং এই ডাকাতির ফলস্বরূপ জনসাধারণের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে স্থান পেয়েছিল এই বিচিত্র সংগ্রহ।

মনে হতে পারে যে কবিতার বইএর প্রথম সংস্করণ বিনষ্ট হয়েছে না সযত্নে রক্ষিত হয়েছে তাতে উৎসাহিত হওয়া কাব্যের সমাদর করা ত নয়ই বরং তার বিপরীত। কাব্যের স্থায়িত্ব নিশ্চয়ই বইএর প্রথম সংস্করণের উপর নির্ভর করে না। তবুও দুষ্প্রাপ্যতার যারা মূল্য দেয় সেই একটু খামখেয়ালী সংগ্রহকারী ছাড়াও সাধারণ দর্শকেরও এ প্রদর্শনী থেকে আনন্দ ও উত্তেজনা পাবার কারণ আছে।

প্রথম সংস্করণগুলির সান্নিধ্যে এসে মনে নানারকম প্রশ্ন জাগে। যে পাঠক ক্যাক্সটনের কাছে প্রথম চসর কেনে সে কি বুঝেছিল সে ইংরেজি ভাষার প্রথম কবিতার বই কিনছে? যে পাঠক এক নতুন কবির সূচনা পেয়ে সেণ্ট পলের গির্জার কাছে "Sign of the Greyhound"-এর খোঁজ করে "Lucrece" নিয়ে বাড়ি ফেরে সে কি বুঝেছিল যে কাব্যাকাশে এক অত্যুজ্জ্বল তারকার আবির্ভাব হয়েছে?

কোনও সূর্য যখন পূর্বদিগন্তে তখনই যে পাঠকসমাজ তার ভাবী দীপ্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল এ-রকম মনে করবার কোনও কারণ নেই, এমন কি সে সূর্য যখন মধ্যাহ্নগগনে তখনও হয়তো পাঠকের দৃষ্টি মেঘাচ্ছন্ন। হয়তো

৩

স্যর ফ্রান্সিস কাইন্যাস্টন (Kynaston)-এর কবিতা তাঁর সময়ে স্যর জন সকলিংএর চেয়ে বেশি লোকপ্রিয় ছিল। জন ক্লীভল্যাণ্ডকে কে মনে রেখেছে? অথচ তাঁর বইএর কুড়িটা সংস্করণের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধ্য ছিল না জন মিল্টনের 'Minor Poems'-এর মাত্র দুটো সংস্করণের। তখনকার কবিতারসিক পাঠকমণ্ডলী চাইত অ-সাধারণকিছু, যত দুর্বোধ্য তত বেশি আকর্ষণীয়। মিল্টনের

"Haste thee nymph and bring with thee
Mirth and youthfull jollity"র কাছে
"Eyes like Astronomy
Straight-limbed Geometry"

মনে হতো কত জ্ঞানগর্ভ আর অভিনব। প্যারাডাইস লস্টের বিনিময়ে তার রচয়িতা যে পাঁচ পাউণ্ড পেয়েছিলেন, সে কথাও মনে পড়ে।

শেলি, কীটসের বন্ধু লী হণ্টের আজ সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো এই যে তিনি শেলি কীটসের বন্ধু, অথচ তাঁদের জীবিতাবস্থায় লী হণ্টের কদর ছিল বেশি।

কীটসের ১৮১৭ সালে প্রকাশিত প্রথম বই "Poems"-এর উপর এত বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছিল যে প্রকাশক বিরক্ত হয়ে কীটসের ভাইকে জানিয়েছিল, "We have, in many cases, offered to take the book back rather than be annoyed with the ridicule which has, time after time, been showered on it."

কবিতার বইয়ে প্রথম সংস্করণই বোধহয় কবির জীবনে সবচেয়ে শিহরণময় ঘটনা। নতুন কবির হয়ত কোনও সমাদরই হবে না—বিরাট কাব্যপ্রতিভাকেও হয়ত বিপুলা পৃথ্বী আর নিরবধি কালের ভরসায় অপেক্ষা করতে হবে। তাই প্রথম সংস্করণের কবি আশা আশঙ্কায় উদ্বেলিত—অনিশ্চিত লোকমতের প্রত্যাশায় অপেক্ষমান—সেই সময়েই তিনি সাধারণ মানুষের সব চেয়ে কাছে; আর যখন তিনি শত সংস্করণের কবি হয়েছেন তখন সে খ্যাতির উত্তুঙ্গ চূড়া সাধারণের চোখের অনেক দূরে। প্রথম সংস্করণের কবিকে তাই আত্মীয় বলে মনে করতে পারি—তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাবোধের উত্তেজনা লাভ করতে পারি—এ প্রদর্শনীর দরজা দিয়ে প্রায় তাঁদের কাছে

ঘেঁষে দাঁড়াতে পারি। তাই দুষ্প্রাপ্য জিনিষ দেখে মনের যে শিশুসুলভ অংশ আনন্দ পায় তা ছাড়াও মনের প্রবীণতর অংশকেও এই প্রদর্শনী আকৃষ্ট করে।

এই প্রদর্শনীতে যে সব বই আছে তার একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেটি ইংরেজি কবিতার অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সমাদর লাভ করবে। তবে তালিকাটি প্রধানত পুঁথিতত্ত্ববিদের জন্য রচিত। বইএর ছাপা, মুদ্রণ আর টাইপ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত পাঠকের সংখ্যা কম—এঁরা শুনে উপকৃত হতে পারেন যে জন হেউডের* গ্রন্থ হলো "early 19th century polished calf, sprinkled edges, marbled end-papers," অথবা গ্রের এলিজি প্রথম বার হয় তখনকার ফ্যাশন অনুসারে "unbound, restitched, wholly uncnt" কিন্তু সাধারণ পাঠক "contemporary sheep" অথবা "modern purple calf" সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

প্রদর্শনীর প্রথম বই হলো ১৪৭৮ সালে ক্যাক্সটনের প্রকাশিত চসরের ক্যান্টরবরি টেল্‌স্। ইংরেজি কাব্যানুরাগী পাঠকের কাছে প্রথম ইংরেজী কাব্যগ্রন্থের মূল্য কম নয়। চমৎকার ছাপা এই Folio সংস্করণ আরম্ভ হয় সেই পরিচিত লাইনে "Whan that Apprile with his shoures sote" আর শেষ হয় যীশু খৃষ্টকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে "Now pray I to hem alle that hearken this litil tretyse or rede...... that thereof they thanke our lord Jhesu Crist." বইটি খোলা রয়েছে Wyfe of Bathes-এর গল্পের পৃষ্ঠায়। চিত্রিত সংস্করণ এটি, দেখা যাচ্ছে অশ্বারূঢ়া সেই শুঁড়িখানার কর্ত্রীকে।

চসরের আশেপাশে রয়েছে তাঁর সমসাময়িক গাওয়র, লিডগেট, ল্যাংল্যাণ্ড, স্কেল্টন—নীরবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন পঞ্চাদশ শতকের কাব্যের ইতিহাস। কবিদের মনে তখন ইংরেজি ও ল্যাটিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গাওয়র "কনফেসিও আমান্টিস"ও লিখছেন আবার ইংরেজিকেও উপেক্ষা করতে পারছেন না। চসর ল্যাটিন সম্পূর্ণ বর্জন করে মাতৃভাষার চর্চায় মন

* John Heywood ষোলো শতকের কবি, কিন্তু তাঁর বইএর বাঁধাই উনিশ শতকী হবার কারণ এই যে বইয়ের মালিক সেটি নতুন ক'রে বাঁধিয়ে নিয়েছিলেন। যদিও প্রদর্শনীর বইগুলি প্রাচীনতম সংরক্ষিত সংস্করণ, তবু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাঁধাইটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রদর্শনীতে এমন গ্রন্থও আছে যাতে বেশ কিছুদিনের ব্যবধানে প্রকাশিত বই একসঙ্গে বাঁধানো।

দিয়েছেন। তিনি যে ভাষায় লিখলেন সে ভাষা কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে আধুনিক ইংরেজিতে পরিণত হলো। অথচ ল্যাংল্যাণ্ড যে প্রাদেশিক ভাষা অবলম্বন করলেন কালের বালুরাশিতে সে-ভাষা অবলুপ্ত হয়ে গেল। তাই সাধারণ পাঠকের কাছে তুলনায় আজ ল্যাংল্যাণ্ডের অনেক কম সমাদর। কিন্তু সম্প্রতি "পিয়ার্স প্লাওম্যান"কে সম্পূর্ণভাবে আধুনিক ইংরিজিতে অনুবাদ করার আন্দোলন চলছে। এর যে-সব অংশের অনুবাদ হয়ে পণ্ডিতেতর জনসাধারণের অধিগম্য হয়েছে—তাতে বুঝতে পারছি যে এতদিন আমরা ইংরিজি সাহিত্যের প্রথম প্রলেটারিয়েট কবির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দিইনি।

আবার এই সময় থেকেই আভাস পাওয়া যায় ইংরিজি সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখার। "The Widow Edyth"-এ দেখি হাল্কা হিউমরের উন্মেষ, আর রাজনৈতিক ব্যঙ্গকাব্যের জন্ম স্কেলটনের "Why came Ye not to Courte ?"-এ।

পাঠকসাধারণ চসর গাওয়রের চেয়ে রেনেস াঁর পরের কবিদের সঙ্গে পরিচিত বেশি। ১৭৯৮ অথবা ১৯২২ সালের মতই ১৫৫৭ সাল ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসে লাল অক্ষরে চিহ্নিত দিন। স্বভাবতই চোখ খোঁজে সেই সালে প্রকাশিত "Tottlell's Miscellany" (দুঃখের বিষয় সেটি নেই), ১৫৫৯ সালে প্রকাশিত একটি সংস্করণ আছে। এই বই ছাড়া ১৬শ ও ১৭শ খৃষ্টাব্দের পরিচিত অন্যান্য কবিদের গ্রন্থগুলি দেখে দর্শক তৃপ্তি পেতে পারেন। কোনও বই খোলা রয়েছে শিরোনামার পৃষ্ঠায়, আবার অনেক বইএর দিকে তাকালেই চোখে পড়ে কোনও একটি অত্যন্ত পরিচিত কবিতা। শেক্সপিয়রের চিত্রসহ আছে তাঁর Lucrece আর Poems, আর আছে মার্লোর Faustus-এর দ্বিতীয় সংস্করণ (১৬০৯ সালে প্রকাশিত)।

"Tottlell's Miscellany"-র পরে যে বহুসংখ্যক সনেটসংগ্রহে বাজার ছেয়ে গিয়েছিল তার আভাস দেয় টমাস প্রক্টরের 'A Gorgeous Gallery of Gallant Inventions' (১৫৭৮ সালে প্রকাশিত) অথবা রবর্ট অ্যালটের (Allot) "England's Parnassus" (১৬০০ সালে প্রকাশিত)। "মডার্ন" কবিদের সংকলিত রচনার উচ্ছ্বসিত বিবরণ বইএর প্রারম্ভে দিয়ে সম্পাদক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায় আছেন—

ও-সময়ের প্রায় সব বইতেই এ প্রচেষ্টা স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যায় "England's Parnassus"—ভূমিকায় লেখা হয়েছে, "The choysest flowers of our Moderne poets, with their poeticall compositions. Description and Beutes, personages, pallaces, mountains, groves, seas, springs, rivers, etc. Whereunto are annexed other various discourses both pleasant and profitable." (এখন ক'জন পাঠক ওয়্যাট (Wyatt) কিম্বা ক্যাম্পিয়ন (Campion) পড়েন নদীপর্বত আর প্রাসাদের বর্ণনায় প্রলুব্ধ হয়ে ?) ক্যাম্পিয়নের চারটি 'Books of Ayres' এর স্বরলিপিও কি প্রচলিত ? এই নদনদী গুহা আর সুন্দরীদের কথাশিল্পীদের মধ্যে শেক্সপিয়রও আছেন। ফিলিপ সিডনির "Poesie" প্রথম প্রকাশিত হয় "Shephard's Calendar"-এর সঙ্গে ১৫৯৭ সালে।

সপ্তদশ শতাব্দীর পাঠকমণ্ডলী কি সচকিত হয়ে উঠেছিল যখন প্রথম বেরুলো বেন জনসনের নিজের নির্বাচন করা তাঁর গ্রন্থাবলী, অথবা লিসিডাস, প্যারাডাইস লস্ট, স্যামসন এগোনিস্টিজ্ ? তারা কি দেখতো "with calm mind all passion spent" অন্ধ স্যামসনের বিপুল আকাঙ্ক্ষা, প্রচণ্ড উদ্যমের নিষ্ফলতা ? তারা কি চঞ্চল হয়ে উঠতো না পড়তে-পড়তে "I wonder, by my troth, what thou and I did till we loved" ? এলিজাবেথের যুগের রেশমচিক্কণ চাটুকারী এমন গভীর প্রেমের কাছে মনে হত না নিষ্প্রভ, পানসে ? না তারা "আধুনিক" বলে ও-কবিতা অগ্রাহ্য করতো, "Silex Scintillas"-এর 'I saw Eternity the other night"-এর উপর চোখ বুলিয়ে সরিয়ে রেখে দিত—মিস্টর জন মিল্টনের চেয়ে বেশী পছন্দ করতো ফ্রান্সিস কোয়ার্লস্ (Francis Quarles) আর হেনরি লক (Lok) ?

এর পরে দেখা যায় যে-সব কবিদের রাজনৈতিক মতামতের জন্য একসঙ্গে ক্যাভেলিয়ার কবি বলে উল্লেখ করা হয় তাঁদের কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ। টমাস্ কেরু (Carew) "One of the gentlmen of the privie chamber and sewer ordinary to His Majesty" থেকে আরম্ভ করে এ্যাণ্ড্ মার্ভেল পর্যন্ত সবাই স্টুয়ার্ট রাজাদের দাবী স্বীকার করেছিলেন। অনেকে

যুদ্ধ করেছেন, কারারুদ্ধ থেকেছেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে রচিত লভলেসের 'To Lucasta' অধিকাংশ পাঠকেরই সুপরিচিত। এ-সব কবিদের প্রথম বই তাঁদের জীবিতাবস্থায় সাধারণের অধিগম্য ছিল না, কোনও-কোনও কবির বইএর পাণ্ডুলিপি শুধু বন্ধুমহলে পরিচিত ছিল,—যেমন সকলিংএর "Fragmenta Aurea" প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর এক বন্ধুর প্রচেষ্টায় ১৬৪৬ সালে।

এ-সব বইএর অধিকাংশ সংস্করণেই কবির ছবি পাওয়া যায় (মনে রাখতে হবে তখনো ক্যামেরার যুগ আসেনি), কোনও কোনও বইএ আছে সুন্দর প্রচ্ছদপট—ক্রশ-র (Crashaw) "Steps to the Temple"-এ ওই বিষয়ক সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। সকলিংএর বন্ধু আবার কবির চিত্রের নীচে কয়েক লাইন কবিতা লিখিয়েছেন,

"Suckling, whose number could invite
Alike to wonder and delight
And with new spirit did inspire
The Thespian scene and Delphic lyre
As thus exprest in either part
Above the humble reach of art :
Drawn by the pencil here you find
His forme, by his own pen his mind."

এখনকার দিনে রবর্ট হেরিকের লোকপ্রিয়তা স্মরণ করে আশ্চর্য্য হতে হয় দেখে যে "Hesperides"-এর প্রথম সংস্করণ ১৬৪৮ সালে বার হলেও ১৮১০ সাল অবধি দ্বিতীয় সংস্করণের চাহিদা হয়নি। আবার এব্রাহাম কৃলি (Cowey) যাঁকে স্বয়ং মিল্টনও মনে করেছিলেন শেক্সপিয়রের সমকক্ষ, তাঁর কাব্যিক খ্যাতি আজ লুপ্তপ্রায়।

১৮শ শতাব্দীর লেখকদের জমকালো বইয়ে সে যুগের নিয়মানুবর্তিতা সুস্পষ্ট। থরে থরে সাজানো রয়েছে সব—গে (Gay), ব্লাংক (Blanc) ওয়াল্শ্ (Walsh) পম্‌ফ্রে (Pomfret) কন্‌গ্রীভ আর তার পরবর্তী পোপ, সুইফ্‌ট্, ড্রাইডেন, উইকারলি, (Wycherley)। বিরাট সব Quarto সংস্করণ, খুব চওড়া মার্জিন দুদিকে ছাড়া, বড় ছাপা, কাগজের

অভাব ছিল না তখন। এমন অনেকের বই আছে, যাঁদের নাম আজ অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু পাঠক ছাড়া কেউ জানে না : যেমন ফ্ল্যাটম্যান, হেরিক (Heyrick), কটন—যাঁদের কবিতা দেখলে মিল্টন মন্তব্য করতেন যে "They are of the most free zing mediocrity"—মেটাফিজিকাল কবিতার দিন অবসান হয়ে আসছে তার আভাস পাই "Ayres" এর ভূমিকায়। ওয়ালর (Waller) আর ড্রাইডেনের ঝকঝকে মাজাঘষা ভাষার সামনে মেটাফিজিকাল কবিদের কুয়াশাচ্ছন্ন উপমা আর রূপক দূরীভূতপ্রায়। কাজেই দেখি "Ayres"-এর ভূমিকা আরম্ভ, "I have little reason to expect credit form these my slight miscellanies." আরো কয়েকজনের বই আছে যাঁদের শুধু এই কবিতার বই থাকলে তাঁরা বহুপূর্বেই বিলুপ্ত হতেন। উইলিয়াম কন্‌গ্রীভকে "The Way of the World'-এর রচয়িতা হিসেবেই জগৎ মনে রাখবে, রাণী অ্যানের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত "The Mourning Muse"-এর লেখক হিসেবে নয়। অ্যাডিসনের খ্যাতিও তাঁর সময়োপযোগী "The Campaign" এর উপর নির্ভর করে না।

পোপের নানা কাব্যগ্রন্থ সগৌরবে বিরাজমান। তবে কৌতুক হয় দেখে ড্রাইডেনের ম্যাকফ্লেক্নো—এই "Satyr upon the True-Blew Protestant poet T (homas) S (hadwell)"-এর পাশেই তীব্র বিদ্রূপের কশাহত সেই হতভাগ্য টমাস শ্যাডওয়েলের "The Tory Poets"-দের গালাগালি দিয়ে নিজের মান বজায় রাখার প্রচেষ্টা। সে-যুগে, যখন মিল্টনও তর্কের খাতিরে প্রতিদ্বন্দ্বীর দাম্পত্যজীবনের উপর কটাক্ষপাত করা অভদ্রতা মনে করতেন না, যখন রাজনীতির সঙ্গে কাব্যের সংকটজনক সন্ধি হয়েছিল, তখনই শ্যাডওয়েলের কবিতা উৎরে গিয়েছিল, কিন্তু ড্রাইডেনের ম্যাকফ্লেক্নো অত্যন্ত সময়োপযোগী হওয়া সত্ত্বেও কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এবার আমরা প্রায় আধুনিক যুগের কাছাকাছি এসে পড়ি। এর পরে যে-সব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তারা মূল্যবান দুষ্প্রাপ্যতার দিক দিয়ে বেশি নয়, তাদের সঙ্গে কবিদের জীবনের নানা স্মৃতি বিজড়িত ব'লেই। তবু অবাক হতে হয় দেখে যে কোনও-কোনও প্রায়-আধুনিক কবিদের বইয়ের প্রথম সংস্করণ বিলুপ্ত হ'তে চলেছে—সে সব সংগ্রহ করা যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। যেমন

উইলিয়ম বার্নসের (Barnes)-কবিতা খনন করতে হয়েছে সে-সময়কার খবরের কাগজের কলাম থেকে, আর ট্রাহর্নের কবিতার পুনরুদ্ধার হওয়ার কারণ শুধু একটি দৈব ঘটনা। ট্রাহর্ন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যে কবিতা লিখেছিলেন তার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি গ্রোসার্ট (Grosart) ক্রয় করেন কয়েক পেনির বিনিময়ে। গ্রোসার্ট-এর মৃত্যুর পর ভাগ্যক্রমে সে-পাণ্ডুলিপি বর্ট্রাম ডবেলের (Dobbell) হাতে পড়ায় তিনিই ট্রাহর্নকে পুনর্জীবিত করেন।

বায়রন, শেলি, কীটসের বইএর প্রথম সংস্করণ তত দুষ্প্রাপ্য নয়। বায়রনের অনেক গ্রন্থের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে "Hours of Idleness"-অগাস্টা লে-র নামস্বাক্ষরিত বই, ১৮০৭ সালের তারিখ দেওয়া। শেলির "Laon and Cynthia," "Revolt of Islam" ইত্যাদি যে থাকবে এ তো ধরে নেওয়াই যায়। "Adonais" যে প্রথম প্রকাশিত হয় পিসাতে তার জন্ম হ্যারল্ড নিকলসন ছাড়া বিশেষ কারুর মনস্তাপ হয় না। "Lamia, Isabella & the Eve of St. Agnes" কীটসের শেষ বই, এ-বইএর একটি কপি—লীহন্টের সম্পত্তি—পাওয়া যায় শেলির পকেটে তাঁর মৃত্যুর পর, আর তাঁর দেহের সঙ্গেই ভস্মীভূত হয়। এ-বই প্রকাশিত হবার মাসখানেক পর কীটস শেলিকে লিখেছিলেন, "Most of the poems in the volume I send have been written above two years, and would never have you been published but for the hope of gain". কীটস "hope of gain"-এর জন্য প্রকাশ করেছিলেন কিনা এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও তাঁর রচনা প্রকাশিত হওয়ার বছর কুড়ি আগে আর-একটি দুঃসাহসী ছেলে তার প্রথম বই "The Execution of Charles Bawdin" প্রকাশ করে "for hope of gain" সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই—আর তাতে অকৃতকার্য হয়। তার সে-প্রচেষ্টা আর তার ব্যর্থতার প্রমাণও রয়েছে। বাঁধাই ছাড়া এই বইএর প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা তখনকার দাম—দু শিলিং ছ' পেনি।

ব্রাউনিং, টেনিসন, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, প্যাটমোর, আর্নল্ডের কাব্যগ্রন্থ দেখে দর্শকের নিজস্ব রুচি অনুসারে সম্পাদকের চয়নশক্তির প্রশংসা অথবা নিন্দা করা স্বাভাবিক। টেনিসনের "Poems by Two Brothers"

দেখে মনে হতে পারে দুই রচয়িতার মধ্যে এক ভাইএর পক্ষে "Rubicon" পার হওয়া দুঃসাহসিক হয়েছিল।

Poems by Curren Ellis and Acton Bell ব্রন্টে বোনেদের জীবন আর প্রতিভা সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকমাত্রেরই উত্তেজনার কারণ হবে। ছোট গ্রামের সামান্য ধর্মযাজকের মেয়েদের ছদ্মনামে ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করার এই প্রথম প্রয়াস যে কতদূর ব্যর্থ হয়েছিল শার্লট ব্রন্টের একটি চিঠি থেকেই বোঝা যায়। তিনি লিখছেন, "In the space of a year, our publisher has disposed of but two copies (1000 were printed). Before transferring the edition to the trunk-maker, we have decided on distributing as present a few copies of what we cannot sell." টমাস লভেল বেডোস (Thomas Lovell Beddoes)-এর "Imprivisiatore" দুষ্প্রাপ্য নিঃসন্দেহ, কিন্তু কবির যথার্থ গুণবাচক নয় তাঁর লিরিক, ব্ল্যাংক ভর্স কিছুই প্রদর্শিত হয়নি।

কিপলিংএর "Departmental Ditties" যে উৎসর্গ করা হবে "To all Heads of Departments and all Anglo-Indians," তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ-বই প্রকাশিতও হয় লাহোরে। প্রদর্শিত বইখানি কিপলিংএর মেয়ের।

বিংশ শতাব্দীর কবিদের প্রথম প্রকাশিত বইয়ের প্রাচীনতার দাবী থাকতেই পারে না। তবু ওয়লটর ডে লা মেয়ারের "Songs of Childhood" দেখে মনে হয় এ-বই তাঁকে অমর করতে সাহায্য করবে সবচেয়ে বেশি, এমনকি তাঁর সদ্যপ্রকাশিত "Traveller"-এর চেয়েও বেশি সাহায্য করবে এই অনবদ্য শিশুকাব্যখানি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম যুগের কবিদের মধ্যে হাউসম্যানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাঁর নিজের খরচে (ম্যাকমিলান "A Shropshire Lad" প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেননি), ডব্লিউ. এইচ. ডেভিসের কবিতা প্রথম বার হয় এক doss-house-এ। জুতোর ফিতে, মাথার রিবনের সঙ্গে ফেরিওয়ালা বিক্রি করেছিল "A Soul's Destroyer", আর সে-বইএর গ্রহিত্রীরা নিশ্চয়ই মাথার রিবন পেলেই বেশি খুসী হতেন। হপকিন্সের "Poems" থেকেও তাঁর গ্রীক ও ল্যাটিন অনুবাদ বাদ দিতে হয়েছিল। কারণ রবর্ট ব্রিজেসের ভাষায়—"(a) expense

(b) delay (c) complication of form, for I thought the book already queer enough for the venture."

পাউণ্ডের কবিতা নেই দেখে একটু আশ্চর্য্য লাগে কিন্তু মনে পড়ে যে সংগ্রহটি মূলত ইংরেজ কবিদের কাব্যগ্রন্থের। এমনকি, এতে রবর্ট বর্নসেরও (Burns) স্থান নেই। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে ইংরেজ না হলেও ইংরেজী কাব্যগ্রন্থের যে-কোনো সংগ্রহে ইয়েটস ও এলিয়টের স্থান অবশ্যম্ভাবী। তাই দেখি "Mosada" (প্রথম প্রকাশিত ১০০ কপির অবশিষ্ট অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ), "Wanderings of Oisin," আর "Words for Music perhaps, এবং সম্পাদককে প্রদত্ত, এলিয়টের নামস্বাক্ষরিত Prufrock & Other Observations আর The Waste Land.

✓ কবিরা যে শুধু কবিই নন, তাঁদেরও যে পারিবারিক, সামাজিক জীবন আছে তা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। তাঁরাও যে পিতা, পুত্র, স্বামী, তাঁদের কবিতার সফলতা অথবা বিফলতা যে তাঁদের প্রিয়জনের কাছে অত্যন্ত দরকারী প্রশ্ন, এ-সত্য হঠাৎ বুঝি, যখন দেখি এডমণ্ড ব্লণ্ডেনের প্রথম প্রকাশিত বই। তাঁর নিজের হস্তাক্ষরে লেখা তাঁর স্ত্রীকে 'To Claire—Christmas greetings—It being most definitely my first book of verse.' আবার রুপর্ট ব্রুকের মার হাতের লেখা তাঁর "Pyramids"-এর প্রথম পৃষ্ঠা—তাঁর ছেলে যে রগবি প্রাইজ পায়নি কিন্তু "Pyramids" লিখে অন্য প্রাইজ পেয়েছে, "it being so nearly equal to the prize-winner" সে-কথা তিনি লিখে রেখেছেন। রচয়িতার বয়স যে মাত্র ১৬ বছর ৬ মাস সে-কথারও উল্লেখ করেছেন—রুপর্ট ব্রুকের জননীর ক্ষোভ মিটেছিল, তার পরের বছর ছেলে রগবি প্রাইজ পায়।

আধুনিক কবিদের প্রথম সংস্করণ অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য, কিন্তু তাই বলে সম্পাদক অযথা প্রদর্শনী ভারাক্রান্ত করেন নি। পরিচিত জনতার মধ্যে ইতস্তত পদচারণ করতে করতে তাঁদের কবিতার বই দেখে নানারকম ভাঙা-ভাঙা খাপছাড়া কথা মনের মধ্যে ঘুরতে থাকে। মেসফীল্ড পঞ্চম জর্জকে "Reynard the Fox" উপহার দিয়েছিলেন, রাজার এই সযত্নরক্ষিত বই দেখে সে-কথা মনে হয়—আবার অডেনের প্রথম কবিতার প্রকাশক হলেন স্টিভন স্পেণ্ডর—টমাস হার্ডি নিজের নাম লেখার পর বরাবর ফুলস্টপ দিতেন।

অবশেষে আমরা আধুনিক কালের সীমান্তে এসে পৌঁছই। ডেভিড গ্যাসকয়েন (Gascoyne) এর ১৯৩৭-১৯৪২ সালে লেখা 'Poems'-এ। এমনি করে শেষ হয় আমাদের ইংরিজি কাব্যের ইতিহাস-পরিক্রমা।

এ-প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেল। অভূতপূর্ব তো নিঃসন্দেহ, হয়তো অভাবিত। ইংল্যাণ্ডের সব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অ্যাটলান্টিকের পরপারে চলে যাচ্ছে। পুরানো বই সংগ্রহ করার আগ্রহ ও সামর্থ্য ক্রমশই ক'মে আসছে ইংরেজের, বনেদি পরিবারের বিলুপ্তির সঙ্গে অনেক বই নিলামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এর পরে এ-রকম প্রদর্শনী করতে হলে নিউ ইয়র্ক অথবা বস্টনে যেতে হবে। আর হয়ত তার আগেই পুরোনো বইএর রংচটা মলাটে সোনার জলের ছাপ পড়ে যাবে।

সমালোচনা

মাটির কন্যা। মতিউল ইসলাম। মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরি। দু টাকা।
স্তূপ। বীরেন্দ্র মল্লিক। পনের আনা।
আয়তি। লোকনাথ ভট্টাচার্য। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। এক টাকা।

অল্পদিনের ব্যবধানে মতিউল ইসলাম সাহেবের আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হোলো। এবারের কবিতাগুলি প্রেমের কবিতা। সেইজন্যই বিশেষ মন দিয়ে পড়লুম। কেননা, বিষয়বস্তু চিরকালের হ'লেও অথবা চিরকালের বলেই নতুন কবিরা আজকাল এ-বিষয়ে কাব্য রচনা করতে বিশেষ কুণ্ঠা বোধ করেন। তাঁরা কি মনে করেন যে সামাজিক কি অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ের জন্য আমাদের জীবন থেকে নরনারীর আদিম প্রবৃত্তি-প্রসূত প্রেমের উৎস একেবারেই শুকিয়ে গেছে? কিন্তু তাহ'লে যে জীবনের শুকনো শাখায় আর পাতাই ধরতো না, যে-কোনো রকমের কবিতাই বা লেখা হতো কী করে? জীবনের পরিবেশের সঙ্গে-সঙ্গে প্রেমেরও রূপ বদল হয় এ-কথা তো আমরা সকলেই জানি এবং রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলায় সার্থক প্রেমের কবিতা যাঁরাই লিখবেন, প্রেম ও জীবনের এই রূপ-বদলের উপলব্ধি তাঁদের রচনায় ধরা পড়বেই। সেই আবেগ, আকুতি, বেদনা, বিরহ, ঈর্ষা, সবই থাকবে, কেননা এই সব বৃত্তি মানুষের আত্মার মহৎ উত্তরাধিকার। কিন্তু তবু বিশ বছর আগেকার ভাষায়, কি ত্রিশবছর আগেকার ভঙ্গিতে সে-কথা বললে মনে সেইরকম অনুরণন আর জাগবে না। অথচ যে-সামান্য পরিমাণে প্রেমের কবিতা এখনো লেখা হয় তা পাঠকের এই প্রত্যাশা প্রায়ই পূরণ করে না।

মতিউল ইসলাম সাহেবের কয়েকটি কবিতায় আমি সেই অন্তরঙ্গ সুরটি খুঁজে পেলাম প্রেমের কবিতায় যা একান্তই অপরিহার্য্য। মিলনের উজ্জ্বল উচ্ছল আনন্দ থেকে কবিতাগুলি জন্ম নেয়নি, বিরহের দীর্ঘনিশ্বাসই এদের উপকরণ। সংস্কৃতানুগ বহু-ব্যবহারে ক্ষয়-পাওয়া শব্দের মায়া কাটিয়ে তিনি যেখানেই নিতান্ত স্বাভাবিক সরল ভাষায় কথা বলেছেন সেইখানেই এই প্রাণের সুরটি এসে লেগেছে।

আমি যার একান্ত শিকার
নির্বাক বুকের মাঝে যে জাগালো প্রদীপ্ত সাহারা
নগরে বন্দরে ফের যদি কভু দেখা পাই তার
সে আশায় বুক বেঁধে উত্তাল সমুদ্র হই পার।

কিন্তু এ-ধরণের আন্তরিকতা প্রায় কবিতাতেই তিনি হারিয়ে ফেলেছেন-বলে মন বার বার আহত হ'য়ে ফিরে আসে। ভাষা ব্যবহারে তিনি মাঝে মাঝে এমন অনবহিত হ'তে পারেন যে

লায়লী তোমারে ডাকি
আমার আশার মৃত অরণ্যে
আবার আসবে নাকি।

এই রকম ভালো পংক্তির পরেই তিনি 'অসীম নীলের নিঃসীম নীল বুকে'র মতো শব্দসংযোজনা ক'রে বসেন। 'প্রকম্পিত ওষ্ঠাধর অপরূপ রূপে নিরুপমা', 'আঁখির ভ্রূভঙ্গে বিভঙ্গিয়া সমীরণ', কিম্বা 'যামিনীর অর্দ্ধভাগে কুসুমকোমল করাঘাত'—এ সব পংক্তির দুর্বলতা তো এইখানেই যে উদ্দেশ্যসাধনে সম্পূর্ণ সজাগ না-হ'য়ে যথার্থ কথাটি আবিষ্কার করতে কালবিলম্ব না-ক'রে ধরা-বাঁধা শব্দের তিনি শরণ নিয়েছেন। তাঁর এই শ্রমকাতরতাই অনেক কবিতার ব্যর্থতার কারণ। 'অনুভবি', 'সন্ধানিয়া', 'ভানুর উদয়সনে শয্যা ত্যাজি', 'কুতূহলে', 'বিমন্থিয়া', এ-সব শব্দ দিয়ে প্রেমের কবিতায় বিশ্বাসযোগ্য আবেগ কিছুতেই এখন আর আনা যাবে না, এই আমার বিশ্বাস। আলোচ্য লেখক সম্বন্ধে এই আশাই রাখলুম যে তাঁর কবি-মনের স্বাভাবিক অনুভূতি কালক্রমে প্রকাশের যথার্থ ভাষাটি খুঁজে পাবে। বইয়ের ভূমিকাটি অপসারণযোগ্য; জীবিত কবির কাব্যগ্রন্থে অপরের লেখা ভূমিকা আমি অবান্তর বলে মনে করি।

বীরেন্দ্রবাবুর ক্ষুদ্র গ্রন্থের মাত্র দশ-এগারোটি কবিতার মধ্যেই সুন্দর প্রতিশ্রুতির এবং পরিণতির চিহ্ন আছে,—কবিতাগুলি পড়ে তাই মন খুশি হ'য়ে উঠল। ছন্দোবদ্ধ মিলহীন এই রচনাগুলিতে তাঁর নিঃসঙ্গ কবি-মনের ছাপ পড়েছে। জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি গম্ভীর অথচ সরস, বুকের মধ্যে চাপা একটি দীর্ঘশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়। পড়তে-পড়তে একটা বিষন্ন সুরের আমেজ লাগলো।

ঝাঁ ঝাঁ করে দুপুরের মাঠ।
শীতের বাতাস এসে ঢলিয়া পড়িছে গাছে গাছে
ধানক্ষেত পোহাইছে রোদ।

শীতের দুপুরের এক টুকরো ছবি। এই চিত্রবহুলতার জন্মই তাঁর 'চোখ' কবিতাটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। তাঁর পরবর্তী রচনা যে আরো গাঢ় সংহত হবে তার নিদর্শন এই গ্রন্থেই আছে।

সুন্দর দেখতে লোকনাথবাবুর 'আয়তি' গ্রন্থখানি। তাই আশা ক'রে পড়তে বসেছিলুম। ভূমিকায় লেখক নিজেই বলেছেন যে বারো থেকে উনিশ বছর বয়সের লেখা বলে কবিতাগুলিতে 'অপটু হাতের নিদর্শন নিশ্চয়ই আছে।' বিনয় করেও তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে দ্বিমত হ'তে পারলুম না। এ রকম স্বচ্ছ দৃষ্টি থাকতেও তিনি বইখানি প্রকাশ করেছেন এইটেই আশ্চর্য। এত দুর্বল ছন্দ, এত অসংযত শব্দযোজনা!

সে যে ফিরে এসে সন্ধ্যা ঘনায় আমার দুর্বল চোখে ঘন মায়াজাল সংক্রমি'
নিরঙ্কুশের সন্ধ্যা নামায় গর্বিত কাল—নিয়মী।'

প্রথম কবিতা থেকেই দুপংক্তি তুলে দিলুম। আবার এরই মধ্যে দুএকটি রচনা মন্দ না, যেমন—

নীরব তোমার নয়ন দুটি আমার পানে
কোন কথা কয়
কে তা জানে

কিম্বা

নীল আকাশতলে
ব'সে নিরালা নেশায়
আমি দেখেছি তোমায়
দুর পথের পরে…

কিন্তু পাঠকের উপর এ-ধরনের দুচারটি পংক্তি খুঁজে বের করার ভার দেওয়া কি সংগত?

পথে-বিপথে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। আড়াই টাকা।

অবনীন্দ্রনাথের আরো একখানি বই বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রিত করলেন প্রায় আটাশ বছর পরে। রূপকথার গল্প নয়, ঠাকুর-পরিবারের স্মৃতিকথাও নয়, এ হচ্ছে বাংলাদেশের সেই চিরতরে ফুরিয়ে যাওয়া দিনগুলোর টুকরো-টুকরো দিনপঞ্জী যখন পর্যন্ত প্রাচীন জমিদার বংশের আভিজাত্য এবং

বিলাসিতার গোলাপি আতর মাখানো কিংখাবের গন্ধ আকাশে-বাতাসে লেগে রয়েছে; কিন্তু ফুরলো বলে, আর দেরি নেই। আবশ্যকের চেয়েও বড়ো মাপে তখনকার আমলে জীবনের প্রয়োজনের সীমারেখা টানা হোতো। কর্তারা বৈঠকখানা সাজাতেন ঝাড়লণ্ঠন, ইরানি গালচে, ভেনিসীয় আয়নায়—মানুষের প্রতিদিনের বসবাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে। আর সেখানে যে অন্তহীন গান, গল্প, রসিকতার ঢালাও মজলিস বসতো এখনকার অজীর্ণরোগগ্রস্ত কেরানীকুল সমাকীর্ণ উর্দ্ধশ্বাস শহরবাসী আমাদের পক্ষে তার ধারণা করাও দুঃসাধ্য। আমাদের সামান্য অবকাশ এবং রুচি-রঞ্জনের জন্য আমাদের হ'য়ে অন্যেরা যা ভেবে রেখেছে, তৈরি ক'রে রেখেছে তা নিয়েই আমরা তৃপ্ত, আমাদের আর কিছুই করবার নেই, ভাববার নেই, শুধু রাষ্ট্রের বৃহৎ যন্ত্রটার চাকায় কাঁধ লাগানো ছাড়া।

অতীতকাল তার চিহ্ন রেখে যায় ভাঙা ইমারত, অট্টালিকা, মন্দির কি প্রাচীন দীঘির বুকে। জাতির প্রাণের সম্পদ হ'য়ে থাকে সেই সব জিনিষ। কিন্তু বাংলাদেশের পলিমাটির ভাঙা-গড়ার মধ্যে সেই চিহ্ন লুপ্তপ্রায়। তার কোনো চিহ্ন যদি থাকে তবে তা আছে সাহিত্যের পাতায়। বিশ্রামে আলস্যে আনন্দে সরসতায় ভরা বাংলাদেশের উনিশ শতকের কয়েকটি ছিন্নপত্র অবনীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য রক্ষা করেছেন এই বইয়ের পাতায়, এজন্য আমাদের বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তের সাধুবাদ না-জানিয়ে পারি না। পর-ঈ-তাউস্ শাল, কি গোলাপজলের স্নানের ফোয়ারা আমরা দেখলুম না, কিন্তু তাঁকে দেখলুম যিনি সেই শাল মুড়ি দিয়ে অনায়াসে রামধনুকের মটকা থেকে ঝুপ করে লাফ দিতে পারতেন।

রচনাগুলি তিন অংশে। কলকাতার প্রান্তশায়ী আজকের বাণিজ্যগন্ধী গঙ্গার বুকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার সকাল-সন্ধ্যায় নিত্যভ্রমণকালে রচিত কয়েকটি সরস ছিন্নপত্র নিয়ে প্রথম অংশ। আজগুবি আকারে গল্পের ছড়াছড়ি; পাতায় পাতায় চিত্রশিল্পীর খেয়ালী মনের আশ্চর্য্য নিখুঁত ছবি ভাষার বর্ণে চিত্রিত; এক-একটি রচনা সুন্দর ছোটোগল্প হ'য়ে উঠতে-উঠতে হঠাৎ মোড় বেঁকে অন্যপথে চলে গেছে। সুন্দর করে বলাটাই যেন উদ্দেশ্য, গল্প হ'য়ে উঠলো কি উঠলো না তার দায়িত্ব যেন তাঁর নয়। দ্বিতীয় অংশ কনারক ভ্রমণের বৃত্তান্ত; শেষ অংশ মণ্ডরি ভ্রমণের দিনপঞ্জী।

সমস্ত গ্রন্থটিকেই আমি ভ্রমণের ডায়েরি বলে নিলুম, প্রথম অংশের গল্প-হয়ে-উঠতে-উঠতে-মিলিয়ে-যাওয়া অংশগুলিকেও। জন্মশিল্পী বলেই দুচোখ ভরে যা-কিছু তিনি দেখেছেন তাই কাহিনী হ'য়ে উঠেছে, গল্প হ'য়ে উঠেছে। বাস্তবের সাদৃশ্য রক্ষার কোনো প্রয়াসই তিনি করেন নি। ঠিক এই উপায়েই বিষয় কাব্য হ'য়ে ওঠে; এবং ভাষার অলংকার বাহুল্য আর-একটু যদি কম হোতো তাহলেই যে অবনীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যের শুধু অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকই নয়—গদ্যকাব্যের একজন শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হ'য়ে উঠতেন—রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ প্রকাশেরও অনেককাল আগে—তাতে সন্দেহ নেই।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে বৃষ্টি নেমেছে; পাহাড়ের হাওয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মুখে এসে লাগছে বরফের মতো। দূর দূরান্তরে একটিমাত্র ঝিল্লি অন্ধকারে শব্দের একটা উৎস খুলে দিয়ে ক্রমাগত গেয়ে চলেছে। একটা পান্থশালার প্রদীপ জলে-ধোয়া পৃথিবীর মসৃণতার উপরে আপনার আলোটি অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়ে অনিমেষ রাত্রির দিকে চেয়ে রয়েছে।

পথে-বিপথের পাতায়-পাতায় এ-রকম কবিত্বমণ্ডিত পংক্তি ছড়ানো রয়েছে। ভাষাশিল্পে যাঁদের আগ্রহ তাঁরা মুগ্ধ হবেন।

'ঘরোয়া' কি 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র মতো 'পথেবিপথে' মুখে-বলা রচনা নয়। সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করে হঠাৎ আবার বহুকালের মতো অবনীন্দ্রনাথ যখন অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন এ-রচনাগুলি সেই সময়কার। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র হাওয়ায় বাংলা সাহিত্যকুঞ্জ তখন নিশ্চয়ই সজীবতায় মর্মরিত হ'য়ে উঠেছে। কেননা প্রমথ চৌধুরী আর রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই ছায়া পড়েছে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার এই রচনাগুলিতে। তাতে অবনীন্দ্রনাথের গৌরবের হানি হয় না, কেননা 'আলোর ফুলকি' কি 'বুড়ো আংলা'য় তাঁর অনন্যতাকে স্পর্শ করবে কে? তাছাড়া মৌখিক ভাষার এমন কাব্যমণ্ডিত ব্যবহার প্রমথ চৌধুরীও করেন নি, সে-কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। ভাষার এই মৌখিক রীতিকে অনুসরণ করেই 'ঘরোয়া' কি 'জোড়াসাঁকোর ধারে' অননুকরণীয় হ'য়ে দেখা দিয়েছে পরবর্তী কালে। তার সঙ্গে মিলেছে শিল্পীজনোচিত চেয়ে দেখার চোখ। সূর্যাস্তের আকাশের, কি পাহাড়ের কুয়াশার ঈষৎ বর্ণবৈষম্যও তাঁর উপলব্ধি এড়ায় না, এবং সবচেয়ে আশ্চর্য যে তুলির মতো ভাষার টানেও অনায়াসে সেই ছবিগুলি তিনি জীবন্ত ক'রে তোলেন।

নরেশ গুহ

রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা

রবীন্দ্র-জীবনী এবং রবীন্দ্র-সমালোচনা লেখবার একটি বাধা আছে আমাদের। সে-বাধা অদ্ভুত, অসাধারণ এবং পর্বতপ্রমাণ, কেননা সে-বাধা রবীন্দ্রনাথ। একে তো আত্মজৈবনিক গ্রন্থ ও পত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের মতো প্রাচুর্য, তার উপর নিজেই নিজের মল্লিনাথের কাজ করেছেন এত বহুবার যে বর্তমান বাংলাদেশে তাঁর জীবনীকার বা সমালোচককে মনে হয় সংগ্রাহক মাত্র, বড়ো জোর সম্পাদক; অর্থাৎ তাঁরই রচনার ও পত্রের সুবিস্তৃত উদ্ধৃতি, আর সেই উদ্ধৃতিরই রোমন্থনে তাঁদের ক্রিয়াকলাপ আবদ্ধ। বস্তুত, রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থের সাধারণ সুখপাঠ্যতার কারণই হ'লো আদি উৎস থেকে উদ্ধৃতির বহুলতা: আর যদিও তার কোনো-কোনোটি, যেমন সদর স্ট্রিটের স্বপ্নভঙ্গের বর্ণনা, পুনরুক্তির শরশয্যায় শতছিন্ন, তবু কখনো-কখনো এমন-কোনো পংক্তি বা পত্রাংশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যা তৎপূর্বে তেমন ক'রে আমরা লক্ষ্য করিনি, আর তারই জন্য গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাতে লুব্ধ হই। কিন্তু পাঠকের ধন্যবাদ পাওয়াই এক কথা, আর পাঠককে ধন্য করাই আর, এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে রবীন্দ্র-সমালোচকের সিদ্ধি দুঃসাধ্য, কেননা প্রণয়নের পদে-পদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিযোগী। ছিন্নপত্রের বা ছেলেবেলার কোনো অনুচ্ছেদের পর লেখকের স্বাধীন রচনার অতিপ্রকটিত খঞ্জতা অন্তত আমার মতো পাঠকের পক্ষে দুঃসহ; আমি তাই মনে না-ক'রে পারি না যে এই স্বতোবৈপরীত্য অতিক্রম করতে না-পারলে রবীন্দ্র-সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করাই উচিত নয়; অর্থাৎ, মননশীলতায় না হোক, অন্তত রচনা-নৈপুণ্যে সমালোচককে সমালোচ্যের সমকক্ষ হ'তেই হবে। আর তা যতদিন না হয়, ততদিন বই লেখা মুলতুবি রাখলেও ক্ষতি নেই, যেহেতু রবীন্দ্র-রচনায় অন্তরঙ্গ হ'লেই রবীন্দ্র-

জীবনের সঙ্গে পরিচয় হয়; শুধু তা-ই নয়, তাঁর চিন্তার সঙ্গে আমাদের উপলব্ধির সেতুনির্মাণ করে তাঁর নিজেরই পত্রাবলী, প্রবন্ধাবলী। রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের যত বড়ো ব্যাখ্যাতা, এমন-আর পৃথিবীর কোনো কবিই নন; এমনকি, তাঁর জীবন সম্বন্ধে যে-সব তথ্য সত্যই জ্ঞাতব্য, অথচ তিনি প্রকাশ করেননি, অন্য-কোনো লেখক অদ্যাবধি তার ধার দিয়েও ঘেঁষেননি; কিংবা তিনি পরোক্ষে যেটুকু জানিয়েছেন, অন্য-কোনো লেখক প্রত্যক্ষ-ভাষণেও পৌঁছতে পারেননি সেখানে, সুবৃহৎ রবীন্দ্র-জীবনীর প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও না।

এতৎসত্ত্বেও এ-কথা সত্য যে ভালোবাসা ভাষার প্রত্যাশী; অতএব স্বর্গত অজিতকুমার চক্রবর্তী থেকে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী পর্যন্ত * রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থকর্তারা এইজন্যই আমাদের শ্রদ্ধেয় যে তাঁদের পরিশ্রম তাঁদের রবীন্দ্র-প্রেমেরই প্রতিমূর্তি। এ-কথা অজিতকুমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কেননা এই স্বল্পায়ু রসজ্ঞ তাঁর বই দু-খানা যখন লিখেছিলেন, তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রবাবু বলা হ'তো, এবং রবি-ভক্তি ভব্যতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ ব'লে গণ্য হয়নি। যদিও রবীন্দ্রনাথ তখন বয়ঃক্রমে পঞ্চাশোত্তর আর গ্রন্থসংখ্যায় শতাধিক, তবু সরবে তাঁর পক্ষপাতী হওয়া তখন পর্যন্ত দুঃসাহসিক ছিলো; উপরন্ত, ব্রাহ্মসমাজের বন্ধ্যাত্ব আর হিন্দুসমাজের অন্ধতা অতিক্রম ক'রে তাঁর প্রতিভার স্বরূপ চেনা সহজ ছিলো না। এই উভসংকট অতিক্রম করেছিলেন অজিতকুমার, উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন; তাঁর কৃতিত্ব শুধু

* কাব্যপরিক্রমা : অজিতকুমার চক্রবর্তী। বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৸৹
রবীন্দ্রনাথ : " " ১৷৹
রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক। পরিবর্ধিত সংস্করণ, প্রথম খণ্ড। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী, ৮৷৹
রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর : প্রমথনাথ বিশী। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স, ৩৲

এই নয় যে তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রতিশ্রুত রবি-পূজকদের অন্যতম, তাঁর সম্বন্ধে প্রধান উল্লেখ্য এইটেই যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পেয়েছিলেন স্থানীয়, অস্থায়ী এবং সাময়িকের পরপারে, কোনো-এক ধ্রুব আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে। সে-আদর্শ রবীন্দ্রনাথ থেকেই গৃহীত, এ-আপত্তি অবান্তর না-হ'লেও এ-ক্ষেত্রে অনুত্থাপ্য, কেননা বাঙালির সাধারণ সাহিত্যচিন্তার সংকীর্ণতা থেকে রবি-প্রতিভার সার্বভৌমতা এতই সুদূরে যে তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে হ'লে আজও অনেককেই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সারতে হয়। অজিতকুমারের অনেক কথাই রবীন্দ্রনাথের কথা, আর তাঁর ভাষাও অবশ্যতই তৎকালীন রবীন্দ্র-রীতির নিস্তেজ সংস্করণ। এ-অবস্থায় উজ্জ্বলতা আশাতীত হ'লেও লেখকের পরিচ্ছন্নতা প্রশংসনীয়, আর যদিও বিশ্বচেতনার ক্ষীণতার ফলে এমন কথা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে যে '"উর্বশী"র ন্যায় সৌন্দর্যবোধের এমন পরিপূর্ণ প্রকাশ সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে কোথাও আছে কি না সন্দেহ', তবু অন্তত এটুকু তিনি অনুভব করেছিলেন যে রবীন্দ্র-কাব্য 'বিশ্বের জন্য বিরহবেদনা'য় চঞ্চল।

উপরন্ত অজিতকুমার এও বুঝেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবন 'একই রচনার অন্তর্গত'; তাঁর লক্ষ্য ছিলো ইংরেজি লাইফ এণ্ড লেটর্স গ্রন্থমালার পদ্ধতিতে জীবনের সঙ্গে কাব্যের অন্বয়। তবু-যে জীবনীর দিকে তাঁর আগ্রহ জাগেনি, সেটা তাঁর ভাগ্য; কেননা রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থরচনার পূর্বোল্লিখিত সাধারণ বাধা ছাড়াও জীবনীবিন্যাসে বিশেষ বিপত্তির কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ-যে একবার একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু বলবার নেই, সে-কথা সত্যই; একদিক থেকে তাঁর জীবন নিছক গতানুগতিক, মধুসূদনের মতো নাটকীয় নয়; কীটসের মতো হৃদয়বিদারক বা শেলির মতো বেদনার্দ্রও না; আবার বীটোফেনের নিয়তির নিষ্ঠুরতা কিংবা টলস্টয়ের সমুদ্র-মন্থনের

উত্তালতাও নেই তাতে। শিল্পীজীবনের প্রথাগত বৈশিষ্ট্য কিছুই বর্তায়নি তাঁর জীবনে : তীব্র দারিদ্র্যে প্রহৃত হননি কখনো, ব্যর্থতার শৈত্যসঞ্চার অনুভব করেননি, অস্থির হননি কোনো পারিবারিক অনিয়ন্ত্রণে কি সাংসারিক দুর্বিবেচনায় ; কোনো বয়সে, কোনো অবস্থাতেই উন্মত্ততার কোনো লক্ষণ দেখাননি, উচ্ছৃঙ্খলতারও না। শান্ত, সংযত, সমতল তাঁর জীবন একটি স্থির লক্ষ্যের দিকে তীরের মতো তন্ময় ; লক্ষ্যের যত কাছে আসছেন ততই গভীর হ'য়ে তার রেখা পড়ছে পার্থিবের মানচিত্রে ; নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-উপলব্ধি আর সমানুপাতিক জাগতিক স্বীকৃতি তাঁকে উপহার দিয়েছে রাজকীয় উত্তরজীবন, মহিমান্বিত মৃত্যু। এদিক থেকে, তাঁর সুন্দর সম্পূর্ণ বৃত্ত জীবনীকারের পক্ষে ততটা উৎসাহজনক হ'তে পারে না, যতটা উন্মাদ অসমাপ্ত শেলির, কিংবা তরঙ্গসংকুল টলস্টয়ের। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্র-জীবনের কর্মসূচী এমন বহুল-বিচিত্র, ব্যক্তিগত জীবনে মৃত্যুশোক আর সাহিত্যিক জীবনে নবজন্ম এমনই পৌনঃপুনিক, তাঁর পৃথিবী-ভ্রমণের আর সমসাময়িক বরেণ্যদের বন্ধুতালাভের তালিকা এমনই সুদীর্ঘ, এমনই নিঃসংশয়ে তিনি বিশ-শতকের প্রথমার্ধের পৃথিবীর অন্যতম প্রধানপুরুষ—আর তা শুধু কবি ব'লে নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই—এক কথায়, তাঁর সর্বতোমুখী মহত্ত্ব এমনই তুলনাহীন যে তাঁর প্রতি জীবনী-কারের পক্ষপাত অনিবার্য। কিন্তু এই শ্রীক্ষেত্রে অসংখ্য আহূত হ'লেও নির্বাচিত হবেন দু-একজন ; কেননা এখানেও রবীন্দ্রনাথ অন্তরায়, অন্তরায় তাঁর কর্মের আয়োজন বিস্তৃতি। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত লিখতে গেলে পৃষ্ঠাসংখ্যা তো পাঠক ভাগাবেই, তার উপর সেই বহু-বিভক্ত বহু-বিক্ষিপ্ত উপাখ্যানের বিশৃঙ্খলতায়, অতএব অপাঠ্যতার আশঙ্কাও অনেকখানি।

সাহসী প্রভাতকুমার সে-চেষ্টাই করেছেন ; আলোচ্য খণ্ডের সুবৃহৎ ঘনমুদ্রিত চারশো পৃষ্ঠায় তিনি পৌঁচেছেন মাত্র ১৩০৮

সালে, অর্থাৎ কবির চল্লিশ বছর পর্যন্ত। অথচ, তথ্যের এই আধিক্য সত্ত্বেও, কিংবা সেইজন্যই, রবীন্দ্রনাথ কোনো-একটি পৃষ্ঠাতেও জীবন্ত হ'য়ে ওঠেননি, কোথাও নিশ্বাস পড়েনি তাঁর, একবারও শুনতে পেলাম না তাঁর হৃৎস্পন্দন। ভিক্টরীয় ইংলণ্ডের 'সরকারি' জীবনীর অনুসরণে প্রভাতকুমার অধিগম্য সকল তথ্যই একত্র করেছেন, তার উপর নায়ককে অবতীর্ণ করেছেন প্রথম থেকেই মহত্ত্বের ইস্পাত পরিয়ে ; গ্রন্থটি ক্রমবিকশিত নয়, নির্মিত, অর্থাৎ লেখক প্রকৃতির অনুকরণে তাঁর পাত্রকে উদ্ঘাটন করেননি, প্রথম থেকেই ধ'রে নিয়েছেন, এবং পাঠককে বুঝতে দিয়েছেন, যে তিনি মহাপুরুষ, তার উপর একটি মহৎ বংশের রত্নোত্তম। অথচ এ-বিষয়ে প্রভাতকুমার সচেতন যে জীবনীকারের অতিভক্তি জীবনীর অভিব্যক্তির প্রতিকূল ; তিনি প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন অভিভূত না-হ'তে, সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রনাথের মতের বিরুদ্ধে তর্ক তুলেছেন, রচনার দুর্বল অংশগুলিকে দুর্বল ব'লেই ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি—তবু কিছুতেই পারেননি বিগ্রহে প্রাণসঞ্চার করতে। তাব'লে তাঁর অধ্যবসায় অনর্থক নয় ; কেননা যদিও ইংরেজিতে যেখানে 'is' কিংবা 'are' বসে, সেখানে তিনি 'হইতেছে' লেখেন ('বাল্যকালের যেসব স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের খুবই স্পষ্ট, তাহাদের অন্যতম হইতেছে…', 'অন্য দুইখানি পত্রিকা হইতেছে…'), এবং 'প্রেরণা ও প্রতিক্রিয়া ব্যতীত গীতি-কবিতা রচিত হয় না', এই ধরনের সূত্র রচনা ক'রে মাঝে-মাঝে পাঠককে শাস্তি দেন, তবু তাঁর বইখানা মূল্যবান, রবীন্দ্র-জীবনের তথ্য-ভাণ্ডাররূপে প্রয়োজনীয়। আর এ-কথাও নিশ্চিত যে বৃহৎ-কথা সাধারণ পাঠকের বিরক্তিকর হ'লেও মহৎ-কথা জিজ্ঞাসুর শ্লাঘ্য।

প্রভাতকুমার তাঁর সূচনায় জানিয়েছেন যে 'রবীন্দ্র-জীবনী' প্রথম প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেন বইখানা রবীন্দ্রনাথের জীবনী নয়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের কাহিনী।

এই আর্ষ বাক্য মেনে না-নিয়ে উপায় থাকে না, যখন অতি বিস্তৃত বংশপরিচয়ের পরেও প্রভাতকুমার ঘন-ঘন দ্বারকা-দ্বারস্থ হন, এমনকি রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে 'সামাজিক আর্থিক আধ্যাত্মিক কোনো দিক "হইতেই" অভিজাত ঠাকুর-পরিবারের সহিত ইহাদের [অর্থাৎ কবিপত্নীর পিত্রালয়ের] তুলনা হইতে পারে না।' সত্যি বলতে, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে এখনও অনেকটা আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি; রবীন্দ্রনাথ যেন ঠাকুরবাড়িরই কৃতিত্ব, কিংবা ঠাকুরবাড়ির ব'লেই তিনি রবীন্দ্রনাথ, এই মোহপ্রসূত বাক্য মাঝে-মাঝেই শোনা যায়; 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথে'র লেখিকা এক জায়গায় কবির 'আভিজাত্য' ইত্যাদি নিয়ে উচ্ছ্বসিত; এমনকি শ-ভক্ত প্রমথনাথ বিশীও এ-কথা ভেবে রোমাঞ্চিত যে 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র' এমন অনেকের সঙ্গে বনভোজনে বেরিয়েছেন, যারা 'দ্বারকানাথের পৌত্রের চেয়ে ধন ও বংশমর্যাদায় অনেক নিচে।' একেই ইংরেজিতে বলে স্নবিশ।

বিশী-মহাশয় যদি ভুলতে পারতেন যে রবীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র; যদি কবির উপর প্রত্যেক পারিবারিক ও সাহিত্যিক অগ্রজের 'প্রভাব' অন্বেষণে পরিশ্রান্ত না-হ'তেন; যদি 'serious' অর্থে 'গুরুত্বপূর্ণ' এবং 'seriousness' অর্থে 'গুরুত্ব' না-লিখতেন; বাংলা সাহিত্য তাঁর অধিকার যত নিশ্চিত, ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর আনাগোনা যদি ততই স্বচ্ছন্দ হ'তো (অনেকগুলি যদি হ'য়ে গেলো, কিন্তু আমার দোষে নয়), তাহ'লে 'রবীন্দ্র-কাব্যনির্ঝরে' বালার্ক-বর্ণনার কাহিনীর অংশ আরো রমণীয় হ'তো তাঁর হাতে, সমালোচনার অংশ আরো গ্রহণীয়। সাহিত্য-শাস্ত্রে পারদর্শিতা সারদর্শিতারই নামান্তর নয়, আর রবিজ্ঞতাও বৃহত্তর অভিজ্ঞতার মুখাপেক্ষী; তাই বিশী-মহাশয় এই আজব খবর আমাদের শুনিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ শেলির সগোত্র আর

শেলি কীটস নাকি 'আদিপর্বে' কাহিনী-কাব্য লিখে থাকলেও শেষে বুঝেছিলেন যে দীর্ঘ কাব্য তাঁদের 'যথার্থ বাহন' নয়, উপরন্ত কাহিনীকাব্যে তাঁরা 'সাফল্যলাভ' করতে পারেননি 'বাস্তব সংসারের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে।' এ-কথা বলতেই হয় যে তথাকথিত 'রোমান্টিক' কবিদের তথাকথিত সমালোচনার চোরাবালি এড়াতে না-পেরে লেখক এখানে প্রমাদে মজেছেন; কেননা কীটসের কবিপ্রকৃতির প্রবল উন্মুখতা ছিলো দীর্ঘ কাব্যেই, শুধু কাহিনী-কবিতায় নয়, নাটকে এপিকেও সুস্পষ্ট; এমনকি শেলির সর্বশেষ অসমাপ্ত ট্রায়াম্ফ অব লাইফ, যেটি তাঁর গভীরতম কবিতা ব'লে প্রসিদ্ধ, সেটি অস্ত্যর্থেই দীর্ঘ, শেষ হ'লে সুদীর্ঘ হ'তো। যেখানে কীটসের বৈশিষ্ট্য, আর শেলিরও কৃতিত্ব, ঠিক সেখানেই তাঁদের 'সাফল্যে'র অভাব কারণসুদ্ধু কেউ দর্শিয়ে দিলে আমরা তাজ্জব বনি।

বস্তুত, ইংরেজ 'রোমান্টিক' কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্যের কিংবদন্তী কুসংস্কার মাত্র। শেলি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবি ছিলেন এ-কথায় কিছুই প্রমাণ হয় না; রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবি ওঅর্ডস্বর্থও ছিলেন, ব্রাউনিংও ছিলেন, হাইনেও ছিলেন; আমাদের সকলের মতোই তাঁকেও মুগ্ধ করেছে জীবনের ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ভিন্ন-ভিন্ন বিদেশী কবি। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এবং সম্পূর্ণ সুখের বিষয়ও নয়, তাঁর রচনায় প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রত্যেকটিই ভারতীয়; উপনিষদ, কালিদাস, বৈষ্ণব কবিতা, বাউল-গান আর বাংলার ছড়া, এই ক'টি ছাড়া আর-কোনো প্রভাব আবিষ্কার করতে হ'লে পাতা ওল্টাতে হয় তাঁর বাল্যরচনার, প্রভাবের প্রসঙ্গই যেখানে অবাস্তব, আর সেখান থেকে পংক্তি তুলে-তুলে প্রমাণ করা একেবারেই শক্ত হয় না যে তিনি কখনো বিহারীলালের প্রভাবে চিহ্নিত, কখনো হেমচন্দ্রের, কখনো শেলির। কিন্তু স্বভাব যতদিন প্রতিষ্ঠা না-পায়, প্রভাব ততদিন অনুকরণেরই

সমার্থক, এবং যে-বয়সে পূর্বগের অনুকরণ অবশ্যম্ভাবী, এমনকি অনুকরণই শুধু সম্ভব, সেই বয়সের রচনাকে 'প্রভাব' কিংবা 'সাদৃশ্যে'র সাক্ষ্যরূপে দাঁড় করানো অন্যায়, অযৌক্তিক আর নীতিবিরুদ্ধ উভয় অর্থেই। উদাহরণত, কবি-কাহিনী আর অ্যালাস্টরের সাদৃশ্যের তাৎপর্য এর বেশি কিছুই নয় যে প্রথমোক্ত শেষোক্তের অনুকরণ; অতএব এমন ধারণা যদি প্রশ্রয় পায় যে ও-দুই কবিকে বিধাতা 'একই ছাঁচে' গড়েছিলেন, তাহ'লে এই সত্যটাই চাপা পড়ে যে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় শেলি শিশুমাত্র হ'লেও শেলির আত্মহারা আত্মময়তা রবীন্দ্রনাথের অতীত। যদিও আমাদের দেশজ সাহিত্যের ক্ষীণ ধমনীতে পাশ্চাত্ত্য প্রাণসঞ্চার রবীন্দ্রনাথই করেন, তবু তাঁর রচনায় প্রতীচীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি তো নেইই, তার চেয়েও যা আশ্চর্য, তাঁর প্রবন্ধাদি প'ড়ে স্পষ্ট বোঝা যায় যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুকম্পা তাঁর কখনোই ছিলো না। তাঁর কৈশোরক পঠন-পাঠন এবং তৎপ্রসূত অনুবাদ ও নিবন্ধাদি বয়সোচিত সাহিত্যিক ব্যায়ামের পর্যায়ভুক্ত; কিন্তু প্রভাতকুমার আর প্রমথনাথ দু-জনেই তাকে তদধিক মূল্য দিয়েছেন, প্রভাতকুমার তত বেশি না যতটা প্রমথনাথ।

মূলত, অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এই দুই লেখক পরস্পরের সমর্থক; বিশী-মহাশয় যে কবির বালভাষণকে 'গুরুত্বপূর্ণ' মনে করেন, তাঁর গ্রন্থই তার প্রমাণ, আর প্রভাতকুমারের মতেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'precocious child'। অথচ রবীন্দ্র-জীবন মনে-মনে চিন্তা করলে এ-কথা উপলব্ধি করতে একটুও দেরি হয় না যে তিনি ছিলেন অকালপরিণতির পরপারে, 'precocious'-এর ঠিক উল্টো। যদি কীটসের বয়সে তাঁর মৃত্যু হ'তো তাহ'লে তিনি বাঙালি গৌণ কবিদের মধ্যে কোনোরকমে গণ্য হ'তে পারতেন; শেলির বয়সে হ'লে, তিনি হতেন আমাদের রম্য

কবিদের অন্যতম, বিবিধ কাব্যচয়নগ্রন্থের বিশেষ উপযোগী, পরবর্তী কবিরা কুড়ি বছর পর-পর নতুন ক'রে তাঁকে 'আবিষ্কার' করতেন। যদিও তিনি নিজেই একবার নিজেকে 'quick-witted' আখ্যা দিয়েছিলেন—আর সেই সঙ্গে এ-কথাও জুড়তে ভোলেননি যে সেটা সদ্‌গুণ নয়—তবু ঈশ্বরের তাঁর উপর অসীম দয়া এই যে তিনি দ্রুতধী ছিলেন না, চতুর ছিলেন না; যৌবনে কোনো বিদ্রোহ-বহ্নি বিকীর্ণ করেননি, অগ্রজের অনুসরণে আর প্রচলিত রীতিপালনেই তৃপ্ত ছিলেন; জীবনের অর্ধেক বয়স পর্যন্ত গদ্য লিখছেন বঙ্কিমি রীতিতেই, 'মানসী'র আগে পর্যন্ত স্বাক্ষর স্পষ্ট করতে পারেননি কবিতাতেও। ছেলেবেলার রবীন্দ্রনাথকে মনে হয় ধীর, অশান্ত এবং দ্রুত উভয়েরই বিপরীত অর্থে ধীর, ভীরুস্বভাব, মৃদুকথন, নমনীয়। ধীরে, অতি ধীরে তিনি এগিয়েছেন, কেননা তাঁকে পৌঁছতে হবে দূরে, বহুদূরে; বেড়েছেন গাছের মতো, শিকড় যার বিস্তৃত পৃথিবীর হৃদয়ের অন্ধকারে, যে-গাছ বিশাল, ঘনবঙ্কিত, শাখা-প্রশাখায় জটিল, কিন্তু সমগ্র রূপে সহজ, শত শতাব্দীর জীবনের অধিকারী। কীটস বলতে গেলে বালকবয়সেই মহাকবি, শেলি তিরিশে অসমাপ্ত হ'লেও কৃতকর্ম; আবার ওঅর্ডস্বর্থের দীর্ঘজীবন অনর্থক; কিন্তু যেমন ইএটসের, তেমনি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দীর্ঘজীবন শুধু যে সার্থক হয়েছিলো তা নয়, প্রয়োজন ছিলো, কেননা মুখমণ্ডলের প্রতিটি কালকুঞ্চনের সঙ্গে আরো বড়ো হয়েছেন এ-দু'জন; ইএটস পঁচাত্তরে আর রবীন্দ্রনাথ আশিতে না-পৌঁছলে বর্তমান যুগের দুই বাণীমূর্তি অপরিপূর্ণ থাকতেন, আর মহত্তম কিছু কবিতা লেখাই হ'তো না।

মনোবিজ্ঞানীর মতে মানুষের শৈশবই তার জীবন-নিয়ন্তা; তবু প্রতিভা অদ্যাবধি কোনো বিজ্ঞানের বশবর্তী হয়নি, তার হেতু অনিশ্চিত, উৎপত্তি অজ্ঞাত, বিবর্তন তারই ক্রিয়াকলাপ থেকে অনুমেয় মাত্র। ঈশ্বরের এই একটিমাত্র সৃষ্টি এখনও এতখানি

রহস্যময় আছে যে তার সম্বন্ধে যে-কোনো গণনাই ফেল পড়ে; সংখ্যাতত্ত্ব বা সুজনবিদ্যা, ধনবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান, কোনো শাস্ত্র প্রয়োগ ক'রেই প্রতিভার প্রকৃতিকে নিয়মাবলীতে বিন্যস্ত করা যায় না, তার উৎপাদন তো অসম্ভব। তাই আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিভাবানের বাল্যজীবন অনেক সময় রমণীয় উপাখ্যান হ'লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাৎপর্যহীন; অর্থাৎ, প্রতিভা যখন দেখা দেয়, তখন থেকেই প্রতিভার আরম্ভ; আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিভাবানের পূর্বপুরুষ, পিতামাতা, আত্মীয়, বা বাল্যসঙ্গীতে তাঁর আভাস বা অঙ্কুর বা উপাদানের অন্বেষণ বিড়ম্বনা; বিশ্বাস করি যে রবীন্দ্রনাথ বস্তিতে জন্মালেও রবীন্দ্রনাথই হতেন, আকারে-প্রকারে অন্যরকম, কিন্তু ফলত একই। শীতের শেষরাত্রে লেপের তলা ছেড়ে ঠাকুরবাড়ির আর-কোনো ছেলে যায়নি নারকেল গাছের মাথায় প্রথম-রোদের ঝিকিমিকি দেখতে, আবার এমন অনেকে হয়তো গিয়েছে যারা বড়ো হ'য়ে কিছুমাত্র কবি হয়নি। বাল্যে আর বয়ঃসন্ধিতে অনেকেই কবিতা লেখে, তাদের মধ্যে কোনোরকমে কবিনামের যোগ্য হ'য়ে উঠবে একশোতে কোন-একজন, তাও যখন নিশ্চিত বলা দুরূহ, তখন ক্ষণজন্মার জন্মক্ষণ শুনতে বসে কে? ...কার্যত কেউ তা বসেও না; সমালোচকরা ঘটনার ঘোটকে মন্তব্য-শকট জুড়ে নেন, অর্থাৎ, যাঁর মহত্ত্ব ইতিমধ্যেই সংশয়াতীত, তাঁরই বাল্যজীবন ও বাল্যরচনা থেকে মহত্ত্বের লক্ষণাবলী উদ্ধার করেন—আর তা যে ইচ্ছে করলেই পারা যায়, তার উল্লেখ্যতম প্রমাণ তো এই যে, যদিও গ্রন্থরচনার সংকল্পরহিত পাঠকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় তাঁর ভবিষ্যৎ মহিমার প্রতিশ্রুতি দেখতে পাওয়া অসম্ভব, তবু সম্প্রতি বাংলাদেশে শিশু-সূর্যের দিকেই গবেষকের আকর্ষণ যেন বেশি।

অজিতকুমারের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাতা, তাঁরা সকলেই তাঁর মর্ত্যরূপের পরিচয় পেয়েছিলেন,

কেউ-কেউ ঘনিষ্ঠভাবে। এটা সুবিধে, কিন্তু অসুবিধেও, বোধহয় অসুবিধেই বেশি। তিনি-যে কত বড়ো—শুধু কবিত্বে নয়, ব্যক্তিত্বেও—সে-কথা চেষ্টা ক'রেও ভুলে থাকা বর্তমানের লেখকদের পক্ষে দুঃসাধ্য, আর এই আনুক্ষণিক মহত্ত্বচিন্তা রচনার স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায়। অন্তত জীবনীতে, যেখানে প্রকৃতিপন্থী উপন্যাসের মতোই নায়কের চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়; আগে কিছু ব'লে না-দিয়ে, কিছু ধ'রে না-নিয়ে, একটু-একটু ক'রে প্রত্যয় জন্মাতে হয় পাঠকের মনে, সেখানে আশু ভবিষ্যতে লক্ষ্যভেদের আশা বেশি দেখি না। লিটন স্ট্রেচি সত্য বলেছিলেন যে জীবনীরচনাও শিল্পরচনা; জীবনীকারকে নির্মম হ'তে হয়, নির্লোভ হ'তে হয়, ভূরিপরিমাণে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে ফেলে দিতে হয় অনেকটাই, বাছাই ক'রে-করে সাজাতে হয় একাধারে সত্য আর সুষমার দিকে লক্ষ্য রেখে; মনে রাখতে হয় যে ভালো ক'রে বলাই সবচেয়ে বেশি বলা, আর সার কথা মানেই সব কথা। অবশ্য নায়কের জীবদ্দশায়, কিংবা মৃত্যুর অনতিপরে, এ-আদর্শে জীবনী রচনার সম্ভাবনা কিঞ্চিৎ মাত্র, কেননা একজন অমৃত-পুত্রকে আমরা তখনই আবার সহজভাবে তাঁর মর্ত্যরূপে ভাবতে পারি, যখন তাঁর মৃত্যুর পরে অন্তত পঞ্চাশ বছর কেটেছে, তাঁর চোখে চোখ রেখেছিলো এমন-সব চোখ বুজে গেছে চিরকালের মতো; আর তার আগে জীবনীর সমস্ত তথ্য সাধারণত প্রকাশিত হয়ও না বা হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথকে তাই অপেক্ষা করতে হবে, হয়তো দীর্ঘকাল, অন্তত যতদিন-না 'রবীন্দ্র-জীবনী' পরিবর্ধিত হবার পরেও অনুরূপ গ্রন্থ আরো অনেক বেরোয় অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যাবলী নিয়ে—কেননা সব না-জানলে সার বোঝা যায় না—আর সেখানেই-যে অপেক্ষার শেষ তা-ই বা কে বলবে, এখন পর্যন্ত এটা শুধু আশা, যদিও দুরাশা নয়, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ

যেমন জানাতে ভোলেননি, 'তুমি মোর পাও নাই পরিচয়', তেমনি উল্টো আশাও তিনিই দিয়ে গেছেন, 'একদিন চিনে নেবে তারে।'

আলোচনা

কবিতার আশ্বিন সংখ্যায় ত্রয়োবিংশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরিচয়প্রসঙ্গে, রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত বিষয়কেও সমালোচক অনুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন; এবং গ্রন্থ-পরিচয়ের 'ঐতিহাসিক' অসম্পূর্ণতা দেখাতে গিয়ে, ঐ আটছত্রপরিমিত সমালোচনাতে নিজেই একটি ঐতিহাসিক ভ্রমে পতিত হয়েছেন।

১। "'সাহিত্যের পথে'র অন্তর্গত 'সাহিত্যধর্ম' আর 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধ দুটির ইতিহাস গ্রন্থপরিচয়ে না দেখে অবাক হলুম।"

উক্ত খণ্ড রচনাবলীর ৫৫১ পৃষ্ঠায় সাহিত্যধর্মের এবং ৫৫৭ পৃষ্ঠায় সাহিত্যরূপের 'ইতিহাস' লিপিবদ্ধ আছে।

২। "জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে 'কল্লোল' আর 'কল্লোল'-বিরোধীর দুদিন ধরে যে-বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, তাতে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন তা-ই অনতিপরে প্রকাশিত হয় ও-দুটি প্রবন্ধের ['সাহিত্যধর্ম' আর 'সাহিত্যরূপ'] আকারে"

১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধকে সমালোচক যে ১৩৩৪ সালের চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত বিতর্ক সভায় কথিত বলে বর্ণনা করেছেন এ সম্ভবত সাময়িক বিস্মৃতি-বশতই — কারণ সমসাময়িক অনেকেরই জানা আছে 'যে 'সাহিত্যধর্ম' ঐ বিতর্কসভায় কথিত বা পঠিত নয়,—বস্তুত এক অর্থে ঐ বিতর্কের মূল।

৩। "সে-সভার কোনো উল্লেখ গ্রন্থপরিচয়ে নেই, যদিও সে-সভা ঐতিহাসিক—অন্তত আমরা তা-ই মনে করি।"

সমালোচকের সঙ্গে গ্রন্থপরিচয়-লেখকের যে এ বিষয়ে মতান্তর নেই তার প্রমাণ রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৩) থেকে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে পাওয়া যাবে।—

"সাহিত্যরূপ" ও 'সাহিত্য-সমালোচনা' বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার দুইটি বিশেষ অধিবেশনের রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বিবরণ। 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে সাহিত্যিকদের মধ্যে যে-আলোড়ন জাগিয়াছিল...তাহার পরিণামে বাংলার প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের একত্রে আলোচনার উদ্দেশ্যে এই সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। ১৩৩৪ সালের চৈত্র মাসে যথাক্রমে ৪ ও ৭ তারিখে বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উপরোক্ত দুইটি অধিবেশন জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রাভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচনায় সূত্রধারের কর্তব্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্পাদন করেন।"

অমিয়কুমার সেন
শান্তিনিকেতন

সম্পাদক ও প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা থেকে
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত

কবিতা

ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]　　চৈত্র ১৩৫৪　　[ক্রমিক সংখ্যা ৫৭

অসম্ভব আজীবন শোক করা। স্তম্ভিত পাথর
কান্নার তৃষ্ণায় ভাঙে; পাথরের প্রচ্ছন্ন, অথচ
স্ফীত, তীব্র, অসহ্য শিরায় নামে, কান্না নামে; হৃদয়ের
　　আরক্ত অধরে
ক্লান্তির করুণা নামে, কান্না থামে।...তারপর?

পথে-পথে পায়ে-হাঁটা লক্ষ-লক্ষ শব্দহীন শোক;
গঙ্গাতীরে নম্র, শান্ত, সমতার সূর্যাস্ত-মমতা;
মুদ্রাযন্ত্রে আর্ত রোল; রেডিওতে ধ'রে-আসা গলা—
থেমে যাবে, শেষ হবে, শেষ হ'লো: তারপর?

দুঃখ তার দয়ার সুন্দর হাতে ধ'রে আছে এই
রাত্রির পবিত্র রক্ত; যত ঝরে, তত ধরে হাতে।
কিন্তু রক্ত ফুরাবে-তো; কিন্তু এই কান্নার পরেও
আবার অব্যর্থ ভোর ঘরে-ঘরে জাগাবে :—তখন?

জাগাবে আবার জ্বালা, বাঁচার ভীষণ জ্বালা, যার
যন্ত্রণায় ঘরকন্না গুঁড়ো হয়, রাজত্ব ধুলোয় মেশে, কাঁপে মন্ত্রী,
　　গৃহিণী, মজুর;
ক্ষমাহীন এই বাঁচা আবার পাঠাবে প্রশ্ন, যার
উত্তর দিতেই হবে: তখন?...তখন?

১ ফেব্রুয়ারি
১৯৪৮

সম্পাদকীয়

শিল্পী রূপকার। রমণীয় রূপের নয়, চারিত্ররূপের। ইআগো ইমোজেন তাঁর কাছে অভিন্ন; আর এ-পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানীর সধর্মী। কিন্তু এ-পর্যন্তই। এর পরেই বিজ্ঞানের পরপার: যখন যুধিষ্ঠিরকে অবজ্ঞা ক'রে হনুমানে তাঁর আনন্দ। তবে তাঁর আনন্দ আছে, তার মানে, আনন্দের তারতম্যও আছে। অর্থাৎ, পক্ষপাত আছে।

পক্ষপাত দার্শনিকের স্বভাব। কোনো-একটা ধারণায় তাঁর আস্থা; অন্য-সব ধারণায় সন্দেহ। কিংবা সর্বত্রই সন্দেহ। তিনি বিচার করেন, তর্ক করেন, সত্য শোনান। সেই সত্য, যাতে তিনি বিশ্বাসী। যদি অবিশ্বাসেই তাঁর বিশ্বাস হয়, সেই অবিশ্বাসই শোনান। শিল্পীও বিচার করেন—যদিও তর্ক করেন না, অন্তত স্বভাবত করেন না—; শিল্পীও সত্য শোনান। সেই সত্য, তিনি যাতে বিশ্বাসী। কেউ, রবীন্দ্রনাথের মতো, স্পষ্ট ক'রে বলেন তাঁর দর্শন, লক্ষ কথায় বলেন; কেউ, স্তঁধালের মতো, বলেন একেবারে কোনো কথাই না-ব'লে। আর, এ-দুই চরমের মধ্যবর্তী অসংখ্য বিচিত্র স্তর অবশ্য-আছেই। আর, সাহিত্যের বাহন যেহেতু ভাষা, আর ভাষা যেহেতু চিন্তার শরীর, তাই দর্শনের সংযোগ সাহিত্যে যেমন প্রত্যক্ষ, যেমন অপরিহার্য, তেমন নয় চিত্রকলায় বা সংগীতে বা অন্য-কোনো কারুশিল্পে।

শুধু সুর শুনিয়ে, শুধু রূপ বানিয়ে কবির ছুটি নেই; তাঁকে কিছু 'বলতে' হয়।

দর্শন পক্ষপাতী, কিন্তু সেই পক্ষপাতিত্বে একটি নিরপেক্ষতা আছে। ভালোতে তার যেমন আগ্রহ, মন্দতেও কখনো-কখনো তার তেমনি নৈপুণ্য। বিশ্বময় ঈশ্বরের আভা কোনো-এক দর্শনের যেমন উপলব্ধি, তেমনি বিশ্বব্যাপী নরহত্যারও অন্য-কোনো দর্শনই

উৎপত্তিস্থল। মানুষ যা করে, যা-কিছু করে, মূলে তার চিন্তা আছেই। কোনো দর্শন অখণ্ডতার পরিপোষক; তার আশ্রয়ে মানুষ নিজেকে অন্য-সব মানুষের এবং সকল মানুষকে বিশ্বসত্তার অন্তর্গত ব'লে জানে; ফলত, তার ক্রিয়াকর্মও লক্ষ্য রাখে ঐক্যে, অতএব শান্তিতে; আবার কোনো দর্শন বিচ্ছিন্নতার সমর্থক, তার প্রভাবে মানুষ নিজেকে, নিজের গোষ্ঠীকে, শ্রেণীকে, জাতিকে বিশ্বের কেন্দ্র ব'লে ভাবতে শেখে, আর অন্য-সব মানুষকে, গোষ্ঠীকে, জাতিকে সে-কথা স্বীকার করাবার জন্য লিপ্ত হয় মিথ্যায়, ক্রূরতায়, হত্যায়। অর্থাৎ, দর্শন নীতিনিরপেক্ষ, অন্তত অবশ্যতই নীতিসাপেক্ষ নয়।

সাহিত্যও কি তা-ই? ইমোজেন সৃষ্টিতে কবির যত আনন্দ, ইআগো সৃষ্টিতেও ততই, কিন্তু তাই ব'লে ও-দুয়ের মূল্য কি তাঁর কাছে এক? শুধু এঁকে, শুধু 'দেখিয়ে' তো তাঁর দায় মেটে না, তাঁকে 'বলতেও'ও হয়। কী বলেন তিনি? কখনো কি বলেন: 'এই ইআগো, আর এই ইমোজেন; দু-জনেই আছে; কে ভালো, কে মন্দ আমি জানি না।'? না-কি বলেন: 'ইমোজন ভালো, আর ইআগো মন্দ; কিন্তু একজন ভালো ব'লেও আমার কিছু এসে যায় না, অন্য জন মন্দ ব'লেও আমার কিছু এসে যায় না।'? না-কি এমন কথা বলেন: 'যেহেতু ইআগা ইমোজেন দু-জনেই পৃথিবীতে আছে, সেইজন্য ইমোজেনের ভালো হওয়াটা যত ভালো, ইআগোর মন্দ হওয়াটাও ততই ভালো।'?

না; কবি এর কোনোটাই বলেন না। হোক পরোক্ষভাবে, সুদূরতম-পরোক্ষভাবে, তবু নিঃসংশয়, তর্কাতীত, অদ্ব্যর্থরূপে কবি বুঝিয়ে দেন কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, সেই সঙ্গে এ-কথাও, যে তিনি ভালোর সমর্থক। যদি কখনো ভালোতে তাঁর অবিশ্বাস জন্মায়, তাহ'লে সেই অবিশ্বাসকে তিনি বিশ্বাস করেন না, আর করেন না ব'লেই হতাশা তাঁকে আচ্ছন্ন করে।

এর কোনো ব্যতিক্রম নেই ; আর নেই ব'লেই দার্শনিকের সঙ্গে কবির সাদৃশ্য এখানেই ঘুচলো। দার্শনিকের পক্ষপাত নিরপেক্ষ, ভালোতে মন্দতে সমভাবে অর্পণীয় ; কবির পক্ষপাত পক্ষপাতী, একমাত্র ভালোর দিকেই তার উন্মুখতা।

(ভালো কাকে বলে ? মন্দ কাকে বলে ? তা-তো আমরা সকলেই জানি। আমরা প্রত্যেকেই, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অবতরণ করলে, আমাদের জৈব জীবনের মত্ততা থেকে মুহূর্তের জন্যও হৃদয়ের নির্জনতায় অবতরণ করলে তখনই উপস্থিত হই একেবারে ভালোর, একেবারে মন্দর মুখোমুখি। জৈব জীবনে, যূথ-জীবনে আমরা যতই তার বৈপরীত্য করি, আমাদের নির্জনতা, আমাদের হৃদয়ের নির্জনতা কখনো এ-কথা ভোলে না যে হিংসা মন্দ আর ভালোবাসা ভালো। ভালো-মন্দের সংজ্ঞা আমাদেরই শিরার তারে-তারে প্রবাহিত, আমাদেরই হৃৎস্পন্দনে উচ্চারিত।)

সাহিত্য-যে অব্যতীতরূপে ভালোকে লক্ষ্য করে, তার প্রমাণ-তো এই যে বিষয়ের অফুরন্ত বৈচিত্র্য আর রূপের বহুল ভিন্নতা সত্ত্বেও সকল সাহিত্যেরই ফল চিত্তশুদ্ধি, আর চিত্তশুদ্ধি শুধু সাহিত্যেরই ফল, দর্শন বা বিজ্ঞানের নয়। যে-কোনো উপায়ে হোক, হোক সুখ, দুঃখ, ব্যঙ্গ বিষণ্ণতা ; হোক নাটকীয় নৈর্ব্যক্তিকতা কিংবা গীতিকাব্যের স্বগতোক্তি ; উপায় যে-কোনোটাই হোক না, সাহিত্য চিত্তশুদ্ধিরই জনক। মানবসমাজে কবির স্থান এইজন্যই দার্শনিক বৈজ্ঞানিক রাজনৈতিকের উপরে যে শেষোক্তরা আমাদের বুদ্ধির বিকাশে, জ্ঞানের সম্প্রসারণে সহায়ক, কিংবা জৈব সুখবর্ধনের, যৌথ স্বার্থরক্ষণের যন্ত্রী ; অর্থাৎ বিভিন্ন উপায়ে আমাদের ভালো করতে সচেষ্ট ; আর কবি আমাদের কোনো ভালো করেন না, কিন্তু আমাদেরই ভালো বানান, যেহেতু ভালো একটি কবিতা পড়লে তখনকার মতো হৃদয় আমাদের পবিত্র হয়, তখনকার মতো মানুষ আমরা

ভালো হ'য়ে যাই। রাজনীতি তো স্বভাবতই নীতিনিরপেক্ষ ; বিজ্ঞান প্রধানত আর দর্শন অংশত তা-ই ; শুধু সাহিত্য অবশ্যতই নীতিনির্ভর।

এই কথাটাকে তত্ত্বহিশেবে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন কোনো-কোনো সাহিত্যগোষ্ঠী, যেমন ঘটেছিলো ইংলণ্ডের 'নব্বুই'য়ের যুগে ; আবার হঠাৎ কোথাও কারো মধ্যে সাহিত্যের নীতিচেতনা অত্যন্তই প্রবল হ'য়ে জেগে উঠেছে, যেমন উঠেছিলো একই সময়ে টলস্টয়ের শেষজীবনে। এ-বিষয়ে অচৈতন্য আর অতিচেতনা দুটোরই প্রমাদপ্রসূ হবার আশঙ্কা : জর্জ মূর টলস্টয়েকে ভুল বুঝেছিলেন, আর টলস্টয় শেক্সপিঅরকে। কিন্তু চেতনা থাক আর না-ই থাক, তত্ত্বহিশেবে এ-বিষয়ে যে যা-ই বলুন, এর সত্যকে কার্যত অস্বীকার করতে পারেননি পৃথিবীর কোনো লেখক, পারেননি, পারেন না, যদি-না তিনি সায় দেন তাঁর লেখকত্ব বাজেয়াপ্ত হওয়ায়। উদাহরণত, পৃথিবীর কোনো দেশে, কোনো সময়ে, কোনো মতবাদের প্রভাবেই এমন সাহিত্য জন্মায়নি, যা হিংসার, হিংস্রতার, নরহত্যার সমর্থক—না, জন্মেছে জড়বাদী দর্শনের প্রভাবে আধুনিক রুশদেশে, কিন্তু সেই নখদন্ত-রক্তিম অক্ষরবিন্যাসকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, এত বড়ো ব্যাপক কোনো সংজ্ঞা সাহিত্যের নেই। চিত্তশুদ্ধির গভীরতার অনুপাতেই সাহিত্যের স্তরভেদ ; আর যেখানে চিত্তশুদ্ধি একেবারেই নেই, পক্ষান্তরে যা বিষাক্ততার বীজাণু-ভাণ্ডার, সেখানে আমরা নিশ্চয়ই সাহিত্যের শিল্পলোক অতিক্রম ক'রে চ'লে এসেছি কোনো দল-পাকানো চক্রান্তে, কোনো সেপাই-বানানো আপিশে, কিংবা একেবারে রণক্ষেত্রেই।

শেক্সপিঅর সম্পর্কে বর্ণান্ধতা সত্ত্বেও এ-সূত্র টলস্টয় ঠিকই দিয়েছিলেন যে সে-শিল্পই ভালো মানুষের সঙ্গে মানুষের যা মিলন ঘটায়, আর সে-শিল্পই মন্দ, মানুষে-মানুষে যা বিচ্ছেদ আনে।

সংস্কৃত সাহিত্য শব্দটাতেও এই কথাই প্রচ্ছন্ন আছে। মানুষকে বিভক্ত ক'রে দেখেছিলেন ব'লে, স্বজাতিকে বিশ্বের কেন্দ্র ভেবেছিলেন ব'লে, রডিআর্ড কিপলিং-এর এত বড়ো লিপিনৈপুণ্যও ব্যর্থ হ'লো, নির্মাণ থেকে সৃষ্টিতে উত্তীর্ণ হ'তে তিনি পারলেন না। সব দেশেই এমন কিছু-কিছু লেখক জন্মান, যাঁদের বিশ্বলোক স্বদেশের সীমা দিয়েই তৈরি; আর যেহেতু স্বাদেশিকতা মানেই প্রাদেশিকতা, কিংবা বিদেশ-বিদ্বেষ, তাই সাহিত্যের প্রতিভূ এঁরা নন, স্বদেশের সাহিত্যেরও না। সাহিত্যের উপর আমাদের কি শুধু এই দাবি যে সে আমাদের অবসরের সুখসঙ্গী হবে? কিংবা আজ এই মুহূর্তে আমরা যা ভাবছি, করছি, চাচ্ছি, তারই একটা জলজ্যান্ত ছবি এঁকে খুশি করবে? কিংবা সাংসারিক জীবনে আমাদের যত কষ্ট, বিপদ, দুশ্চিন্তা, তা থেকে রক্ষা পাবার রাস্তা বাৎলাবে?... কিন্তু না;—সাহিত্যের কাছে এই আমাদের দাবি যে সে আমাদের উপলব্ধি করাবে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ঐক্য, বিশ্বসত্তার সঙ্গে আমাদের এই ক্ষুদ্র, খণ্ডীকৃত, আত্ম-সীমান্ত জীবনের ঐক্য, মানবিক বিশ্বের সঙ্গে, আবার প্রাকৃতিক বিশ্বের সঙ্গেও; আর এ-দাবি সাহিত্য মেটাতে পারে না, যদি-না তার নিজের মধ্যেই থাকে বিশ্বব্যাপ্তির অসীমতা, কালাতিক্রমী অমৃত। সেই সাহিত্যই, তাই, বরেণ্য, যে-সাহিত্য কোনো-এক দেশের মাটিতে জ'ন্মে, কোনো-এক কালের হাওয়ায় বেড়ে উঠেও সকল মানুষকে সকল মানুষের কথা শোনায়, চিরকালের কানে গান গায় চিরকালের।

কিন্তু কোন কথা এমন? এমন কোন কথা, যা কখনোই পুরোনো হয় না?...কিন্তু কোন কথাই-বা পুরোনো হয়? রোজ ভাত খাই, ভাত কি কখনো পুরোনো হয়? ঘরে-ঘরে বার বার শিশু জন্মায়, তবু যেন, তবু কেন প্রত্যেক শিশুই অভূতপূর্ব? পৃথিবীর একটিমাত্র উপগ্রহকে আশ্রয় ক'রে পৃথিবীর রাত্রির

আকাশে আলো-অন্ধকারের একই খেলা চলে প্রতি মাসে, প্রতি মাসেই তো নতুন দেখি। জীবনের এই সহজ, গভীর আর সহজেই সুন্দর যত কথা, তা-ই তো সাহিত্যের কথা। কিন্তু এ-সব কথাও শুধু আধার; যত্নে, ধৈর্যে, প্রাণান্ত পরিশ্রমে, অক্লান্ত আকাঙ্ক্ষার নৈপুণ্যে বানানো সেই আশ্চর্য আধার, অমৃতের আধার। বিষয় যা-ই হোক, উপায় যা-ই হোক, মানুষের কাছে সাহিত্যের শেষ কথা এই: 'ভালো হও। ভালোবাসো।' শুধু এই। আর যেহেতু মানুষের মধ্যে ভালোর প্রতি ভালোবাসা, ভালোবাসার প্রতি ভালোবাসা প্রবৃত্তিগত, তার ক্ষুধার মতো, তার কামের মতোই সাহজিক, স্বাভাবিক, এইজন্য এ-কথা সে কখনো পুরোনো শোনে না; আর সেইজন্যই মানুষের মনে সাহিত্যের প্রভাব—ব্যাপ্তিতে বা নিবিড়তায় নিশ্চয়ই নয়—কিন্তু চারিত্রে, অন্তত চারিত্রে, ধর্মের প্রভাবেরই মতো। সাহিত্য অন্তত এটুকুতে ধর্মের অনুরূপ যে ধর্মও—অবশ্য সাহিত্যের মতো অংশত অচেতনভাবে নয়, সম্পূর্ণ, অনবচ্ছিন্ন সচেতনতায়—ধর্মও নীতি-নির্ভর, অনন্যরূপে ভালোর সমর্থক; সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের এটুকু অন্তত সাদৃশ্য যে ভালো হও, ভালোবাসো, এ-কথা ধর্মেরও কথা, ধর্মেরই কথা।

সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের এই প্রকৃতিগত সংযোগ আছে ব'লে, বর্তমান জীবলোকে, সাহিত্যবহির্ভূত জগতে, আধুনিক সাহিত্যিক তার স্বপ্নের স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলো একমাত্র মহাত্মা গান্ধীতে। দীর্ঘ, দীর্ঘ দুঃখের এই দিন, সপ্তাহ, মাস, মাসের পর মাস; হিরোশিমা, ন্যুরেমবর্গ, কলকাতা; নোয়াখালি, বিহার, পঞ্জাব; বিচ্ছিন্ন বাংলা; আণবিক অস্ত্রনির্মাণে প্রতিযোগিতার উল্লাস; আবার এরই মধ্যে আরো-এক যুদ্ধের হাসিখুশি জল্পনা; এই দীর্ঘ, তিক্ত, সুদীর্ঘ দিনের পর দিনে সাহিত্যিকের একমাত্র সান্ত্বনা ছিলো সাহিত্যে, কবিতায়;—আর গান্ধীতে। দুঃখের এই আনত আবদ্ধ

ঋতুতে এ-উপলব্ধি তার হ'লো—পূর্ব-জীবনের সমস্ত বছরগুলি একত্র ক'রে যতটা পেয়েছিলো, তার চেয়েও অনেক গভীর, অব্যর্থ ক'রে এবার এই উপলব্ধিকে সে পেলো যে প্রতিদিনের সংবাদপত্রের প্রত্যেকটি প্রথম পাতায় যারা সমাসীন, তারা শুধু ধূর্ত কথা বলে, স্বার্থের কথা বলে, কিংবা পারে শুধু প্রাণহীন সৎকথার জড়পিণ্ডের চর্বিতচর্বণ ; আর সত্য, জীবন্ত সত্য বলেন শুধু পৃথিবীর কবিরা—আর বলেন গান্ধী। তাই সে প্রতিদিনের সংবাদপত্রে গান্ধীর প্রার্থনাসভার একটি-ছুটি কথার প্রসারিত হাতের মধ্যে খানিকক্ষণ শুইয়ে রাখতো তার ক্লান্তিকে, তার সঙ্গহীন হতাশাকে ; ঐ একটি-ছুটি কথার নম্র অধৈর্যহীন আঙুলে সেই শান্তি তাকে স্পর্শ করতো, সেই সান্ত্বনা, যে-শান্তি, যে-সান্ত্বনার অন্য একমাত্র উৎস তার কাছে কবিরা, কবিতা। সান্ত্বনার প্রয়োজন ছিলো তার—এখনও আছে, এখন আরো বেশি—; কেননা সমস্ত পৃথিবীর সর্বাঙ্গীণ অবস্থা যে তার অস্তিত্বের প্রতিকূল সে-বিষয়ে এখন নিশ্চিত হ'লো সে ;—আর তবু যখন, যদি সে পারে, বেঁচে তাকে থাকতে হবে, তখন বিশ্বব্যাপী প্রতিকূলতার মুখে বাঁচবার শক্তি, সাহস, ধৈর্য কেমন ক'রে পাবে সে, যদি-না সেই ধৈর্য, সাহস, শক্তি শোষণ ক'রে নিতে পারে কোনো গূঢ়, অক্ষয়, অকলুষেয় উৎস থেকে।

যে-জগৎ শিল্পীরা চান, সেই জগৎই গান্ধীর। যদিও পৃথিবীর শিল্পীদের মধ্যে অধিকাংশই আকারে-প্রকারে গান্ধীপন্থী নন, তবু তাঁদের সকলেরই মনোলোক গান্ধী-গ্রহের অন্তর্ভুক্ত, আর-কোনো কারণে নয়, তাঁরা শিল্পী ব'লেই। তাঁরা কেউ-কেউ তা জানেন, অনেকেই জানেন না, অনেকে হয়তো জীবনেও জানবেন না। এটুকু এতদিনে প্রায় সকলেই জেনেছেন যে প্রতীচী-প্রবর্তিত এই যন্ত্র-যুগ, যুদ্ধ-যুগ শিল্পীকে চায় না ; সেই সঙ্গে এ-সত্য পৃথিবীতে রাষ্ট্র ও স্বীকৃত হ'তে আরো কিছু দেরি হবে

যে ইতিহাসের এই নব্যতম হরিজনরাও গান্ধী-গ্রহে গৃহস্থ। উনিশ শতক যখন পড়ন্ত, আর বিশ শতক বাড়ন্ত, এই অনতি-অতীত অধ্যায়ে পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে কবিশিল্পীদের মধ্যে পানাসক্তি, উন্মত্ততা আর আত্মহত্যার পরিস্ফীতি শিল্পীর এই জাতিচ্যুতিরই চেতনাপ্রসূত। এই সময়কার ইওরোপীয় সাহিত্যের একটি প্রধান অংশ গম্ভীর বিষণ্ণতায় ছায়াচ্ছন্ন ; আর যদিও তার কিছু পরে অডেন-গোষ্ঠী আশার বাঁশিতে ক'ষে ফুঁ দিলেন, তবু সেই কুক্কুট-কণ্ঠের নান্দীপাঠ যে-রক্তরেখাকে লক্ষ্য করেছিলো, তা থেকে নতুন ঊষা নামলো না পৃথিবীতে, রক্তই নামলো : নামলো অন্ধকার, নৈরাজ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আর যেহেতু সেই যুদ্ধের ব্যাপ্তি, হিংস্রতা, দূরপ্রবাহী ধ্বংসস্রোত সকল অনুমানকে পঙ্গু ক'রে দিলো, তাই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের একটি প্রধান অংশ আজ আবার বিষাদের ভারে আচ্ছন্ন, আবার অন্তর্দর্শনের গম্ভীরতায় নিমগ্ন—শুধুই ব্যর্থতাবোধ আর হতাশা নয়—সেই সঙ্গে সুতীব্র তৃষ্ণা, শান্তির তৃষ্ণা ; সেই সঙ্গে নিরন্তর সন্ধান, শিকড়ের সন্ধান। জড়বাদের উন্মাদনার অবসানে, নেতিবাদের ক্লান্ত রাত্রিশেষে এলিঅট, ইডিথ সিটওএল, হক্সলি আজ কোনো-এক সংশ্লেষণের সন্ধানী, কোনো-এক সাযুজ্যের, ঐক্যের অপরিহার্য স্বীকৃতিতে স্বাক্ষরকারী। অনিবার্যত, এই স্বীকৃতি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে সম্প্রতি একটি তীক্ষ্ণ নতুন প্রাচ্য-চেতনা জাগিয়েছে : আর যদিও তা দেখে আমাদের অতিসম্ভব আত্মপ্রীতি সযত্নে পরিহার্য—কেননা পশ্চিমই এখনও জীবন্ত, পূর্বদেশে শান্তি থাকলেও প্রাণ নেই, আর শান্তিই বা কোথায়, আর শান্তি গেছে ব'লেই যে প্রাণ আসবে তারই বা নিশ্চয়তা কী—তবু এই স্বীকৃতি, এই সন্ধান, এই তৃষ্ণা পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডকে, সমস্ত পৃথিবীকে একদিন গান্ধীর কাছেই পৌঁছিয়ে দেবে, নামত না হোক, সারত।—কিংবা হয়তো দেবে না, মানে এখনই, সমীপবর্তী ভবিষ্যতে, কিংবা ছু, চার, দশ দশকেও দেবে না ;

দু-হাজার বছরেও যীশুর কাছে পৌঁছতে পারলো না মানুষ ;—কিন্তু তাই ব'লে ব্যর্থ নন এঁরা, কেননা তৃষ্ণা আছে মানুষের, অফুরন্ত তৃষ্ণা ; তার মানে কোথাও-না-কোথাও, কোনো দূরকালের পরপারে, তার তৃপ্তিও আছেই। যে-কথা রিল্‌কে বলেছিলেন ঈশ্বর সম্বন্ধে, এ-ক্ষেত্রেও তা-ই, হয়তো, প্রযোজ্য : এঁরা, মানে এঁদের ধর্ম, মানে মানবধর্ম, এখনও অজাত, সম্ভাব্য, ভাবীকালে গর্ভিত ; হয়তো তা সেই গাছের চরম ফল, যে-গাছের আমরা লক্ষ-লক্ষ পাতা। গান্ধীর কথা, 'Non-violence is the law of humanity', এর সহজ অর্থ তো এই যে হিংস্রতা পশুধর্ম, আর ভালোবাসা মানবধর্ম, কেননা পশু প্রকৃতির দাসত্বে বন্দী আর মানুষ প্রকৃতিজয়ী ; এর অর্থ এই যে মানুষের দেহগত, বুদ্ধিগত বিবর্তনের মতো তার মানসিক বিবর্তনও আছে, আধ্যাত্মিক বিবর্তনও আছে ; আর যেমন দেহগত, বুদ্ধিগত বিবর্তনের ফলে মানুষ পৃথিবীর প্রভু হয়েছে, তেমনি মানসিক, আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ফলে, যে-ভালোকে আজ সে সাহজিকভাবে চিনতে পারে, সেই ভালোই হবে তার স্বভাব। যে ছিলো বানর, সে হ'লো মানুষ, এত বড়ো অসম্ভব যদি সম্ভব হ'তে পারলো, তাহ'লে অন্য-এক আপাতঅসম্ভব কেন সম্ভব হবে না ?

Much too simple. But Mr. Bose has never changed. The principle of evil — Faust and Mephistopheles, Thomas Mann : Dinesen as un-reality, as an experience of this world. The idea of fate — etc.

আশ্বিন

বিষ্ণু দে

আশ্বিন বুঝি ! আশ্বিনে কাঁপে ঘর
আকাশে মুখর চাঁদের স্বচ্ছ স্বর
হালকা আকাশে আশ্বিন থরথর।
ভেঙে যায় ঘুম। ক্লান্ত দিনের ঘুমে
সদ্য অতীত মৃত, নেই ভয়ডর।
বাল্যের স্মৃতি যৌবন মরশুমে
বাড়ীতে বাড়ীতে ছাতে ছাতে থরথর।
জেগেছে আমার এই তো সেই শহর।

স্বপ্নের দিন রাতের জীবনে মেশে
সেকালে একালে অবাক বাংলাদেশে
আশ্বিন আসে সচ্ছল নির্ভরে
শহরে শহরে লক্ষ গ্রামের ঘরে
আকাশে হাওয়ায় আলোয় উন্মুখর
হাল্‌কা মেঘের শত কিন্নর হেসে
শ্বেত উত্তরী ওড়ায় কিশোর বেশে
হাসে পার্বতী, দেখে পরমেশ্বর।

সোনার কাঠির এই তো সেই শহর
পূজার ছুটির পাহাড়ে পাহাড়ে ছোটে,
ক্ষেতের সোনার লালমাটি ফুল ফোটে,
আকাশের নীলে মেঘের আঁজিতে লোটে
চোখের আরাম প্রাণের আরাম তার
স্বচ্ছ আকাশে, দু বাহুর বিস্তার

কাঁকরের দেশে বালিনদী-শালবনে
নিটোল পাহাড়ে আকাশ প্রতীক বোনে
উৎরাই আর খাড়াইতে দুস্তর।

আশ্বিন আনে চোখের মুক্তি নীলে,
হৃদয় ছড়ায় তালপুকুরের মিলে,
পায়ের মুক্তি, মুক্তির নিঃশ্বাস
মাঠে মাঠে ছোটে, রিখিয়ার ঘাস, কাশ,
উদার পৃথিবী তারই মাঝে দিল্‌দার
ঘর বেঁধেছিল শিল্পী প্রেমের তার
আশ্বিনে বাঁধা ঘর
এদিকে পাহাড় ওদিকে চূড়ার সার—
এই পার্বতী এই পরমেশ্বর।

ভেঙে যায় ঘুম, চাঁদের আলোর ডাকে।
এই তো জীবন নাজেহাল হিমশিম
চাল নেই চুলো হিন্দু ও মুস্‌লিম
শুনি শুধু আছে, দেখি শুধু উন্মাদ।

আশ্বিন আসে নির্বাক প্রতিবাদ
মুকুরিত হাসি তার
সোনালী ধানের হাল্‌কা হাওয়ায় আলোকিত প্রতিকার
নির্বিরোধের সহজ অঙ্গীকার
হাওয়ায় ছড়ায় শালের চূড়ায় গোলাপবনের বাঁকে—

স্মৃতির মুক্তি, চলে' যায় পশ্চিম।
বহু আশ্বিনে কাঁপে দীপালির হিম,
আগুন নেভায় চাঁদের আলোর চর।

পশ্চিমে যাই, চলে' যাই উত্তর
চলে' যাই। আহা বাংলোর সেই ঘর!

ঘুম ভেঙে যায়, জানলায় আশ্বিন,
বর্তমানের পাক খুলে যায় চাঁদ,
ইতি ও নেতির অতীত সে প্রতিবাদ
গত আগামীর দুহাতে ছড়ায়
আলোঢালা স্রোতে রাতে মিশে যায়
কালো কালো কটা দিন।
কানায় কানায় আলোয় হৃদয় ভরে
আকাশে মিলাই ছাতে ছাতে সুন্দর
এই আশ্বিন এই তো সেই শহর।
শির্‌শিরে হাওয়া সঙ্গীত মর্মরে
আমার হৃদয়ে ঢেলে দিলে আশ্বিন।

রাইনের মারিয়া রিলকে-র কয়েকটি কবিতা

শরৎ

পাতা ঝরে, যেন ঝরে কোন দূর থেকে,
যেন বা আকাশে দূরে জ্বলে যায় শত শাহীবাগ—
পাতা ঝরে অবিরাম নির্বিশেষ নেতির মুদ্রায়।

এবং, রাত্রিতে যবে ছেয়ে যায় নির্জনতা সমুদ্রের প্রায়,
বর্তুল পৃথিবী ঝরে দূরগামী হাহাকারে তারাদের পায়ে পায়ে
ডেকে।

আমরা সবাই ঝরি। পাঁচটি আঙুল ঝরে বালির করকা।
যেদিকে তাকাও একই, সবই বর্ষপত্রত্যাগী, ক্ষণিকহরিৎ

তবু আছে একজন, পড়ন্ত সকলই শুভ্রপীত
মহাস্নেহে সমাদরে দুহাতে যে ধরে থোকা থোকা।

কবির উদ্দেশে মেয়েদের গান

দেখ, দেখ কিরকম সবই হয় উন্মোচিত, আমরাও তাই ;
আমরা তো আর কিছু নই শুধু মোচন অবাধ,
যা ছিল পশুতে শুধু রক্ত আর অন্ধকার অজ্ঞাত সদাই
তাই আমাদের মধ্যে বিকচ মানস পেল, আর তাই সাধ
শর্বরীতে কাঁদে পুনর্বিকাশের তরে। কেঁদে তোমাকে জানায়
কিন্তু সে পশে না বুঝি তোমার দৃষ্টির পারে মরমে গভীর :
তুমি শুধু নিষ্পলক স্নেহভরে বিনা কামনায়।

এদিকে আমরা মনে ভাবি, যার তরে কান্না কোথা সে কবির
কোথা সেই কান্নার উদ্দেশ ! কিন্তু তুমিই কি সেই
নও যার মাঝে আত্মহারা আমরা খুঁজেছি সাযুজ্যসঙ্গ যার ?
সে ছাড়া কোথায় বলো প্রাণ পাব তীব্র অস্তিত্বেই ?

অসীম তো আমাদের পাশ কেটে যায় অবজ্ঞায়।
কিন্তু তুমি, ওগো মুখ, থাকো কাছে, আমরা যে শুনি বারম্বার
কিন্তু তুমি, আমাদের সম্ভাষো যে, তুমি থাকো অতল প্রজ্ঞায়।

মেয়েরা

তোমাদের অস্তিত্বের কি যে ধারা উৎস, সে ঠিকানা
অনেকেই জানে নাকো, কোনো কোনো কবি জেনেছে সে,
তোমাদেরই কাছে তারা জীবনের পাঠ নেয়, ব্যবধান নানা
যদিও দূরেই রাখে, সন্ধ্যা যেন নক্ষত্রনির্দেশে
ধীরে ধীরে মেনে নেয় চিরন্তনে, অভ্যস্তে অজানা।

তোমরা কোরো না কেউ আত্মদান কবিকে হেলায়
যদি দেখ তারও চোখ খোঁজে শুধু নারীকে কন্যায় ;
কন্যারা কেবলই দেখি মানসকে স্মৃতিতে মেলায় ;
তাছাড়া, পেলবহাত তোমাদের ভারি গয়নায়
যেন ভেঙে পড়ে নাকো বাজুবন্ধে জরির ঠেলায়।

ছেড়ে দাও কবিকে ও ময়দানের নৈঃসঙ্গ্যের ব্রতে,
যেখানে সে তোমাদের দেখেছিল চিরন্তনাভাসে,
প্রাত্যহিক পথে তার আনাগোনা হোক্ ইতস্ততে
ছায়ানীড় সপ্রতীক্ষ আসনের শূন্য আশে পাশে
কিম্বা ঘরে সেতারের মর্মরিত রেখাবে ধৈবতে।

যাও···অন্ধকার নামে। এখন যে অনুভব তার
তোমাদের কণ্ঠস্বর তোমাদের কায়া চায় নাকো।
পরিত্যক্ত পথ চায় সে যে চায় সুদীর্ঘ বিস্তার,
আঁধার অশ্বত্থ-তলে সে চায় না তোমরা যে শুভ্রতায় থাকো,
সে যে চায় মূক ঘর এখন সে চায় রুদ্ধদ্বার—
তবু তোমাদের কণ্ঠ-কানে তার পশে শূন্য বেয়ে
(সেই জগতের ভিড় থেকে যা সে ছেড়েছে ক্লান্তিতে)
সুরভি স্মৃতিতে তবু ব্যথা পায় জেনো এ ভ্রান্তিতে—
তোমাদের ঘিরে থাকে সে জগতে এতো লোক চেয়ে।

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

ডায়েরি

অমিয় চক্রবর্তী

নয়

অশেষ জেনেও, মৃত্যু জেনেও, জীবন অজানা জেনেও,
পথিক চোখের দৃষ্টি দুজনে স্বপ্নপথেই হেনে,
চির-অতৃপ্ত রঙীন তৃষায় প্রাণলোকে ব'লে যাব—
সূর্য পৃথিবী ধন্য ;
তুমি আমি এই পৃথিবীতে এসে ধন্য।

ভোরে হোলো দেখা, দুপুরে বিরহ, সোনার বিকেল এল,
আরো আছে ভরা সন্ধ্যাতারায় রাত্রে দূরের জানা,
বিরহ দিনের গাছের ছায়ায় রিক্ত পৃথিবী ধন্য,
প্রাণ, তুমি আমি ধন্য।

খুঁজে পাবো কবে দুজনায় ভরা একটি স্বর্গবেলা,
সারাসৃষ্টির অতীত লগ্নে আছে সে মিলন দিন ;
তারি ধ্যানে দোঁহে ধন্য
অশেষের পারে, মৃত্যুর পারে, অজানা জীবন পারে ॥

দশ

হবেই এ প্রাণ শুদ্ধাধার ॥
ধরব তখন সহজ সুখে
তোমার দেওয়া আলোকধার,
চোখের জল ;
—ভরব বুকে।
মলিন হবে না কখনো আর ॥

মাটির উপরে জাগে পাহাড়—
হিমপাত্রে সে নেয় ছলছল
সূর্যের দান রাখে ঝলমল,
দূর থেকে পায় শুভ্রহার।
চির তুষার
ধুলোভরা এই হৃদয়, তেমনি
জাগবেই দেখো প্রেম তোমার।
তুমি শুধু প্রাণে চরণ রেখো?

সেদিন ধেয়ানে বিশ্ববেদনে
বাধা থাকবে না,
আলো, তুমি প্রাণ জ্বালাবে বোধনে।
তুমি দেবে ফুল; গেঁথে দেব মালা;
আগুনে দোঁহার আরতির থালা;
পৃথিবী-আড়াল একটুও ঢাকবে না।
সেদিন হৃদয় আগুনে পোড়ানো,
—নিয়ো তুমি তাকে;
সেদিন সকালে উৎসবে শাঁখে
নীলের নিশান ওড়ানো॥

এগারো

লাবণ্যফুল ফোটাবো।
দেখো, আমার অশনায়ার অন্ধকারে
কিম্বা তীব্র মরীচিকার ভর দুপুরে,
সংসারকে দিয়ে যাবোই একটি মাঙ্গলিক—
দুলবে আলোয় আমার বাঁচার দান।

ব্যথা পেয়ো না আমার জন্যে
হে সংসার,
পৃথিবীঘর যা দেখেছি অপূর্ব তাই
এমন মধুর।
কবি তো নয় অকৃতজ্ঞ—
গানে ভর্তি বুকের খুসি
ছড়িয়ে যাবো পথের হাওয়ায় হাওয়ায়।
আলোর মূর্তি এই জীবনেই পেয়েছি তো
চিরজন্মের মানসিনী।
ধ্যান দিয়ে তার আকাশভরা ফুল ফোটাবো,
কল্যাণফল রাখব শেষে তোমার পায়ে॥

বারো

সারা জীবনের ব্যথা সমস্ত দরজা খুঁজে পথে ফিরে ফিরে
শেষ ক্রান্তিতটে এসে দাঁড়ালো সমুদ্র-ঝাউবনের মন্দিরে॥

মুখোমুখি আরবার সেই প্রশ্ন বেদীতলে অন্তিমের কাছে:
সেই প্রশ্ন জীবনে যা প্রলাপী যৌবনে ছিল, প্রাণে এই আজো
ভ'রে আছে॥

দেশে দেশে ঘুরেছি তো পৃথিবীতে, বুকে জ্বেলে স্তব্ধ হোমশিখা;
কোন ধ্যান প্রাণে রেখে পর্বতে, নির্জন তীরে, দিগন্তে দেখেছি
দূর-লিখা॥

বিরহের অশ্রু ভ'রে নির্বাসনা বিশ্বে আমি দাঁড়িয়েছি বারবার একা,
সংসার-তরঙ্গে তরী উঠেছে নেমেছে কত, তীরে তবু মেলেছি-যে
দেখা॥

তার পর দৈবদিনে অশ্রুতে আনন্দে মিলে মিলনের এল যে লগন,
চির প্রার্থনার সুধা কাছের ধরায় নেমে স্বর্গময় করেছে গগন ॥

যৌবনের রত্নরাজি জ্বলজ্বল আরবার আরো যেন গভীরে হারায়,
চাওয়ার পাওয়ার টানে মৃত্যু প্রাণে টুটে যায়, ডুবে যায় মঙ্গলধারায় ॥

তবু সেই প্রশ্ন থাকে ভালোবাসা-ভরা চোখে, নিবেদিত জীবনের মূলে ;
কী প্রশ্ন জানি না, তাই উত্তর এলো না, সন্ধ্যা-নীলাকাশ-ঘেরা প্রাণকূলে ॥

মন্দিরে দাঁড়াই আমি, সমুদ্র-ঝাউয়ের নিত্য মর্মরিত ব্যথা দীর্ঘদিন
আমার ব্যথায় মেশে, বেদনার হে বিধাতা, প্রশ্ন হোক চিরদাহে লীন ॥

বর্ষশেষের গান

বাণী রায়

কোথায় তুমি, কোথায় তুমি,
আকাশে ওড়ে সুর—
পাশের বাড়ির আলিসা ধরে
ওঠে সে অনেকদূর।
গির্জাঘরের ঘড়ির আগে,
অক্‌টোলিনির চূড়ার আগে,
নীল আকাশে সে সুর আজি ব্যথায় চুরচুর।
তোমারে চাই, তোমারে চাই,
—কাঁদিয়া কহে সুর।

চৈত্রশেষের বেদনা দিয়ে গড়া এ সুর মম,—
অনেকদূরে যাবে ;
রেলের সাঁকো, বনের ধার ;
জোয়ারে ভাঙা তটের পার ;
সাগরপাশে বিরহে লুটি আমার সুর গাবে,—
কোথায় তুমি, কোথায় তুমি ?
কোথায় গেলে পাবে ?

চিলের ওড়া শিখেছে সুর ;
কাকের ডানার গতি ;
এরোপ্লেনের পাখার বেগ ধরেছে সুর মম।
অনেক দূরে যেতে যে হবে,
যেখানে প্রিয়তম,

পাথরপুরে একেলা নিশি জাগো।
অনেকে আছে সেখানে, শুধু আমার ছায়া নাই ;
বল তো প্রিয়, নিরালা ক্ষণে পরশ আজও মাগো ?

বাঁধন হারা এ সুর আজি বাতাসে মেলে যায় ;
সুবাস সম, বীজাণু সম
ছড়ায় চারিদিক।
চৈত্রনিশা অবশ প্রেমে নূতন বাহুডোরে
আকাশে কাঁপে পাহ্লা রবি মাগি।
তোমারি লাগি, তোমারি লাগি
কাঁদিয়া কহে সুর—
আমারি সুর আকাশে অনিমিখ—
আজিও শুধু তোমারি লাগি
—আমার সুর কহে—
তোমারি লাগি
বিরহে আমি জাগি।

তোমার মুখ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দেখিনি তোমার মুখ
কঠিন অসুখ
আমাকে দিয়েছে ভাষা
যে-ভাষা মৃতেরা বলে। জীবনের অন্তিম নিরাশা—
দেখিনি তোমার মুখ, কখনো দেখিনি
উদ্দাম নদীর জলে মনোহীন তরঙ্গের গ্লানি
তোমার মুখেরও চেয়ে কঠিন পাথর।

চেনা-পথ শেষ হলে মৃত্যু থরথর।
তারপর স্বপ্ন-জাগরণে
বাতাস অস্পষ্ট কথা হানে
তারও পরে, হায় মন, ট্যাক্সির মেশিনের গানে
এলোমেলো চুল, কথা, হাসি আসে মৃত্যুর আহ্বানে।

তারপর কোনো গ্রামে
ঘুমন্ত প্রণামে
তোমার মুখের মতো কাকে দেখি যেন
উপরে পাতলা ঠোঁট কেন ?

এ-জীবন আশ্চর্য বিস্ময় মানি
তোমার কঠিন মুখ তার কতখানি ?

দুরাশা

নরেশ গুহ

১

কত আঁকাবাঁকা নদী হোলো মেঘ, ছায়া হোলো দিন,
শকুন্তলা,
আর কবে আমি শুধবো তোমার ঋণ।
আর কতবার পূর্ণ হয়েছে চাঁদের কলা,
শকুন্তলা।
আরো কতবার আকাশ শুনেছে শরতে শানাই।
বেশ তো না হয় তুমি কাছে নাই,
বেশ তো না হয় আসবে না তুমি আর, তবু কাল
সূর্য উঠবে, হাসবে আকাশে সোনার সকাল।
পাখী হবে গান, গান হবে সুর, আলো হবে ফুল।
এক নিঃশ্বাসে ঝরে যাবে যত ডালের মুকুল।
আবার আষাঢ়ে ঝরঝর ধারে মেঘ হবে জল।
স্বপ্নে আমার তবু তো তোমার কালো কুন্তল—শকুন্তলা—
এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে থাকবে। কখন আবার
স্বর্গশিশির সপ্তর্ষির অস্তে যাওয়ার
আয়োজন হলে ভেঙে যাবে ঘুম, ভরে যাবে ঘর,
অশরীরী কার চিরচেনা স্বর।

আজো কে আমার বন্ধ দুয়ার ঠেলে ফিরে যায়।
কী জানি, হয়তো রাতের হাওয়ায়—
ও কিছুই নয়, ও কিছুই নয়, সময়ের ঢেউ
ফেরাতে কখনো পারবে না কেউ।
ভোরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি নীচে, কাজে চলে যাই,

কাদা মাখি গায়ে ঘামের গন্ধে নিজেকে হারাই।
অপমানে পাপে আত্মারে আমি যত করি ক্ষয়,
তবু থাকো তুমি, তবু তো সময়
কী জাদুমন্ত্রে বোঝা ভারি ক'রে চলে দিন-দিন,
শকুন্তলা,
আর কবে আমি শুধবো তোমার ঋণ।

২

আজো জেগে আছি, ঘুমে দুই চোখ ক্লান্ত।
আসবে না আর আসবে না তুমি আগে তা কি মন জানতো।
মেনেই নিয়েছি ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে,
অলীক আলোয় ছায়াপরীদের নৃত্যে
মূঢ় চিত্তকে করিনি আত্মহারা।
বুঝিয়েছি : মন, স্ববশে আনো তো লেখনী।
কালকে হারাবে কী দিয়ে? আজো কি শেখোনি
সার্থকরাই পায় শুধু তার সাড়া?
কিছুর বদলে কিছু দিতে হয়—এ কথাটা কে না জানে?
সার্থকতাই হাত ধ'রে জেনো অভাবনীয়কে আনে।

যদি তাই হয়, দিতে যদি হয় তুল্য,
ক্লান্তিবিহীন শ্রমে যা গড়েছি কিছু কি হবে না মূল্য?
মেঘে মেঘে নীল কত আষাঢ়ের লুঠ ক'রে আনা পণ্য
গানের জাহাজে এনেছি তোমার জন্য।

করিনি লজ্জা, মনে বাসি নাই ভয়।
দস্যুর মতো মনের ঘোড়ায় চাপি
ছিনিয়ে এনেছি নীলতারাদের ঝাঁপি,
তুমি কি জানো না সে জয় তোমারি জয় ?

ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে হয়েছে, দিনের ক্লান্তি মিথ্যে।
বিনিদ্র রাত, অধৈর্য ভরা চিত্তে
—তুমি আসো নাই—ব'সে আছি একা, বৃষ্টির সুরে ক্লান্ত।
মূল্যে তোমারে মেলে না এ-কথা আগে যদি মন জানতো।

মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে

বুদ্ধদেব বসু

এ নয় গানের দিন। বৎসরের হ্রস্বতম দিনে
স্বল্পতম সূর্যালোক, ন্যূনতম তাপ আর কুয়াশায় আচ্ছন্ন আভার
চাঁদ
দুরাশারে পশায় কফিনে, আশারে মিশায় হতাশায়।
তবু-তো শীতেই আশা, দুরাশাও, দাঁড়ায় আবার ;
দাঁড়ায় মুমূর্ষু, মৃত, নামমাত্র দিনের খবরে,
বৎসরের হ্রস্বতম দিনের কবরে জন্মে
আবার দ্বিতীয় দিন, হ্রস্বতায় বৎসরে দ্বিতীয়।
দিনে-দিনে ছোটো হ'য়ে দিন সবচেয়ে ছোটো দিন আনে,
তারপর দিনে-দিনে আরো দিন, আরো, বড়ো, আরো আলো,
আরো তাপ,
আরো!
বাড়ো, দিন, বাড়ো!
এই গান—যদি একে গান বলো, আমার তো তা-ই মনে হয়—
এই গান গায় কাক, শালিক, চড়ুই
তীক্ষ্নস্বরে, শঙ্খস্বরে,
শেষরাতে আকাশে যখন রাতের লাঙুল ধ'রে টানে
দিগন্তের তল থেকে দিনের আঙুল, আর অন্ধকার
তাদেরই পাখার মতো ছটফট করে—
মানে, ঐ পাখিদের। আবার সন্ধ্যায় গায় একই গান—
আরো দিন, আরো!—
একই কাক, শালিক, চড়ুই, ফুটপাতের গাছের ডালের

সবচেয়ে উঁচু, লঘু সবুজ বিনুনি থেকে যেই
খ'সে পড়ে রোদ্দুরের সোনার চিরুনি, আর অন্ধকার
তাদেরই পাখার রঙে পৃথিবীরে ঢাকে—
মানে, ঐ পাখিদের।

তবে কেন বলো গান নেই?
পাখিরা-তো গান গায়, হোক কাক, চড়ুই, শালিক,
তবু পাখি, তবু গান।

কেউ-কেউ আরো বলে।
বলে, এ-তো ফুর্তির ঋতু। বাংলার শীত মৃদু, শরীরের সুখ
এই-তো দু-মাস। এই-তো দু-দিন
কনকনে কড়া শীত, আকাশ নরমনীল, ঝকঝকে অথচ নরম রোদ;
একটু স্বাধীনভাবে
উত্তুরে হাওয়ার স্বাস্থ্যে বছরের যে-কোনো ইচ্ছারে মেটাও, মেটাও।
মেটাও, মেটাও।
সব দাও, সব নাও।
না-ও ফিরে পেতে পারো, না-ও ফিরে যেতে পারো এ-ইচ্ছায়
আগামী বছর;
(যে-শীতে আরেক দল মেয়েদের হল্লা ডাক দেবে
হয়তো আরেক দল যুবকের হুল্লোড়ে, সে-শীত
কাছেই—কাছেই)
যদি আজ আর-কিছু না-ও থাকে, ইচ্ছা-তো আছেই;
আর যদি ইচ্ছা থাকে শুধু, আর-কিছু না-ও থাকে, তবে,
তবু নাও, নাও, চেয়ে নাও,
চেয়ে ছাখো, যাও।

কলকাতায় ক্রিসমাস, দিল্লিতে উল্লাস, আর শান্তিনিকেতনে
মেলা, খেলা, সারাবেলা—বেলা যায়, যায়।

—যাক।
বেলা-তো গেছেই, আমার-তো বেলা গেছে। বুড়ো হ'য়ে
উড়ো-উড়ো মন
মানায় না আর, মানায় না ইচ্ছার হাওয়ার তাড়া:
শুধু শুনে যেতে হয়, শুধু মেনে নিতে হয়, তাই
আমি তাই মেনেই নিয়েছি এই উত্তরের ঠাণ্ডা ঘর,
রাস্তায় গণ্ডগোল রাত্তির বারোটা অব্দি;
ঘেঁষাঘেঁষি-প্রতিবেশীদের
কয়লা-ধোঁয়ার ফাঁসি, পচামাছরান্নার প্রবল
গন্ধের উথাল।
আমি, বুড়ো, প্রায়-বুড়ো, তাই সারাদিন
কাটাই চেয়ারে ব'সে;
লিখতে না-পারি যদি, পড়ি, বই পড়ি;
আর যদি আলো কম লাগে—যেহেতু আমার চোখ
তত ভালো নেই আর—
তবে চুপ ক'রে ব'সে ভাবি, ভাবি; আর
ভাবতেও ক্লান্ত যখন লাগে, জানলা-বাইরে
রাস্তায় তাকিয়ে দেখি, নয়তো, রাত্তিরে
শুয়ে-শুয়ে চিরচেনা অথচ অচেনা
দেয়ালে তাকিয়ে থাকি।

হয়তো এখন
মানবে-যে শীত নয় সুখের সময়, অন্তত আমার নয়।
শীত···শীত।
হাতে ঠেকে টেবিলের ঠাণ্ডা কাঠ, পায়ে ঠেকে ঠাণ্ডা মেঝে,

পিঠে বেঁধে ঠাণ্ডা হাওয়া ; ঠাণ্ডা, অন্ধকার,
বদ্ধ এই উত্তরের ঘরে।
দিন আরো ছোটো আর আলো আরো কম এই ঘরে,
খাতা খোলা প'ড়ে থাকে, তোলা থাকে বই :
কই,
সকাল দেরিতে এত, সন্ধ্যা আসে এতই সকালে,
সময়-বা কই।
দিন নেই, আলো, নেই, মন নেই, কিছুরই সময় নেই, যদি-না
ঘুমের ; তবু
চেয়ারেই ব'সে থাকি—বিছানাটা আরো ঠাণ্ডা ব'লে ;
ব'সে-ব'সে কিছুই হয় না ব'লে
শুয়ে পড়ি রাত্রে তাড়াতাড়ি, কুঁকড়ে লুকোই
পশুর গুহার মতো লেপের গহ্বরে ;
আর যতক্ষণে
বিছানা গরম হয়, মনে-মনে ভাবি—
কী ? কী ভাবি ?
আমি, বুড়ো, প্রায়-বুড়ো, কী আছে আমার
কী আছে ভাবার আর
তীব্র স্মৃতি ছাড়া,
তীব্র, তিতো, মত্ত স্মৃতি ছাড়া ?

এই শীতে গান ?

এই শীতে গান। এই শীতে গান নেই, যদি-না বানাই আমি,
কেননা শালিক, কাক, চড়ুয়ের ডাক
গান নয়—যদিও আমায় কানে গান ;—
পাখিরে দেয়নি গান, পাখিরে দিয়েছে শুধু ডাক ;

আমারে দিয়েছে গান, আমি তাই গানেরেই ডাকি,
ডাকি শীতে, শীতের শত্রুতা সহ্য ক'রে, পাংশু, কৃশ দিনে,
রক্তশোষা অসহ্য সন্ধ্যায়।
অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে সারাদিন ধ'রে ব'সে-ব'সে
আমি, বুড়ো, প্রায়-বুড়ো, ডাকি, বাড়ো,
বাড়ো গান। এখনো হয়নি শেষ, আছে আরো,
আরো গান। আরো দিন।
দিনে-দিনে ছোটো হ'য়ে দিন সবচেয়ে ছোটো দিন এনে
দিনে-দিনে বড়ো হয়, মাঝখানে একটু নিশ্বাস নিয়ে
আকাশের উত্তলে হেলান দেয় উত্তরের দিকে মুখ ক'রে
মকরক্রান্তির সূর্য :
আবার প্রখর পথ, খাড়া সিঁড়ি, ঝিরিঝিরি ফাল্গুনের পরে
বৈশাখের সুখের শিখর ;
তার আগে একটু জিরিয়ে নেয়, ফিরে চায়, দূরে চায়, ক্রান্তির
ক্লান্তিরে বিছায়
উত্তরায়ণের সূর্য।
তাই গান, আজও গান : যেহেতু আমিও
ফিরে চাই, দূরে চাই, ক্রান্তির ক্লান্তিরে বিছাই
মাংসহীন শীতের শরীরে ; যেহেতু আমার
যদিও যৌবন গেছে, তবু আছে, কিছু দেরি আছে
মাংসহীন শেষ শূন্য শীতের মুক্তির ; যেহেতু আমারে—
যদিও অধৈর্যহীন—তবু আজও শিরার দড়িতে বাঁধে
জীবনের প্রয়োজনে : তাই আমি আয়ুর সিঁড়িতে ব'সে
শুনি পিছে স্মৃতির প্রপাত—
অস্থির প্রলাপ।—আর দেখি সামনে পথের
কড়া, খাড়া, চড়া রেখা, যত চড়া তত বাঁকা, তত একা ; তাই
এক জন্ম শেষ ক'রে আরেক জন্মের আগে—

আর-কিছু নয়—শুধু চিন্তারে বিছাই
দিনের টেবিলে আর রাতের লেপের তলে ; আর শেষরাতে
মুখ-ঢাকা বুক-চাপা অন্ধকারে ঘুম ভেঙে মনে হয়, নেই—
নেই—কিছু নেই—
শুধু এই ভার,
শুধু এই ভার ছাড়া,
আমার চিন্তার ভার ছাড়া।

তাই গান,
বানাতেই হবে গান, বাস্তবের স্বাস্থ্যে ফিরে যেতে।

কিন্তু কোন গান ?

যৌবন যখন ছিলো, যৌবনেরে
করেছি বন্দনা ; যৌবন যখন যায়, যায়-যায়, তখনও আবার
যৌবনেরে করেছি বন্দনা ; কেননা জীবন
যৌবনেরে ভালোবাসে—প্রকৃতির রীতি এই ;
যার আছে সে-ও ভালোবাসে, যার নেই সে-ও ভালোবাসে।
সন্তানের যৌবনের তাপে রোদ্দুর পোহায় পিতা,
তরুণী নাৎনির তাতে মাতামহী হাত সেঁকে নেন ;
পরস্পর-বিদ্বেষী বুড়োরা
পরস্পরের মুখে আঁকা
নিজের জরার ভয়ে হাত পাতে যৌবনের দম্ভের কাছেও ;—
আর তাই বুড়োরা এমন একা, আর তাই বার্ধক্য এমন
নিষ্ঠুর, ভীষণ।

তবে কি, জন্তুর ধর্ম মেনে নিয়ে,
প্রকৃতির অন্ধ টানে অজাত সন্তানে শুধু

ডেকেছি, কবিতা লিখে ? যৌবনের বন্দনা আমার
সে কি শুধু জননশক্তির পূজা ? আমার ছন্দ কি
প্রকৃতির ষড়যন্ত্রে আরেকটি যন্ত্র হ'য়ে চৈত্রের চাঁদের আর
গ্রীষ্মের চাঁপার মোহে, আর
বৃষ্টির বন্যতায়, রাত্রির অন্ধতায়, শুধু
রটিয়েছে প্রকৃতির পরামর্শ—বাড়ো বীজ, বাড়ো। বাড়ো জীব, বাড়ো।
আরো, আরো, আরো।

তা-ই যদি হ'তো, তবে আজ
পঁচিশ বছর ধ'রে কবিতা লেখার পরে, কবিতারে
ভাসায়ে দিতাম জলে, মিশায়ে মাটিতে
পাতাঝরা হাওয়ার হত্যায়। কেননা, যে-কথা
কোটি কণ্ঠে প্রকৃতি জপায় নিত্য, তারই ধ্বনি—প্রতিধ্বনি ছাড়া
আর-কিছু বলার না-থাকে যদি, তবে-তো কবির
মুখ না-খোলাই ভালো।

আমি মনে করি,
যৌবনের, বিদ্রোহের, জীবনের অন্ধ আনন্দের—
কিংবা তার অস্থির স্মৃতির—যদিও করেছি স্তব
তৃপ্তিহীন, স্তাবকতা কখনো করিনি। আমার পূজায়
পৌত্তলিক কামনা ছিলো না। রূপে রঙে বানায়েছি প্রতিমারে
প্রাণে ছন্দ ছিলো ব'লে, হাতে কারুকর্মের কৌশল ;—
কিন্তু সেই রচনার আশ্চর্য সুখেও
এ-কথা ভুলিনি, যার প্রতিমারে বার-বার
বানাই, আবার ভাঙি, আবার বানাই,
সে-তো নয়, কিছু নয়, আমারই আত্মার

ভালোবাসা ছাড়া,
আত্মহারা ভালোবাসা ছাড়া।

তাই বলি,
যা-কিছু লিখেছি আমি—হোক যৌবনের স্তব, অন্ধ জৈব
আনন্দের বন্দনা হোক-না—
যা-কিছু লিখেছি, সব, সবই ভালোবাসার কবিতা,
কথা বুনে, ছন্দ গেঁথে, শব্দ ছেনে আমি শুধু ভালোইবেসেছি
সবচেয়ে তীব্র, মত্ত, সত্য, ক'রে।
—আজও তা-ই! আজও এই ঠাণ্ডা ঘরে ব'সে-ব'সে,
শীতে কেঁপে, হাতে হাত ঘ'ষে, অন্ধকার দিন ভ'রে মাথা
খুঁড়ে-খুঁড়ে
কথা আনি, কথা বুনি, শব্দ ছানি; কেননা তাতেই আজও
সবচেয়ে ভালোবাসি,
ভালোবাসি সবচেয়ে সত্য ক'রে।

কিন্তু কারে? কারে ভালোবাসি?
সে কি নারী? সে কি কোনো নারী? সে কি কোনো
চিরন্তনী-রঙ্গিণী নারীর মুখশ্রীর অসীম অমিয়,
অনির্বচীয়, অবিস্মরণীয়?
না-কি সে কবিতা? কবিতার জ্বলন্ত কল্পনা, ছন্দের দারুণ
উন্মাদনা? বাণীর আগুন
অঙ্গে-অঙ্গে, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, রক্তের অণুতে-অণুতে?
যদি ভাবি—ভাবিনি কখনো আগে; আজ যদি ভাবি, মনে হয়
নারীরে, বাণীরে
এক মনে হয়। মনে হয়, আমার তনুর তন্তুতে, সীবনে

যে-কবিতা, কবিতার ভালোবাসা ছিলো, তারই শ্বেত শিখার
পদ্মেরে
ফুটিয়েছি মনে-মনে নারীরে মৃণাল ক'রে: মনে হয়, নারীরে
বেসেছি ভালো, যেহেতু কবিতা
জেগেছে, জ্বলেছে তার চোখ থেকে—সে নিজে বোঝেনি।
সে নিজে বোঝেনি, আমি তারে ভালোবেসে
আরো ভালোবেসেছি আমার ছন্দের ইন্দ্রজালে, শব্দের সম্মোহনে,
আর
কবিতারে আরো বেশি ভালোবেসে আরো ভালোবেসেছি নারীরে
যতক্ষণ আমার হৃদয়ে প্রেম
কবিতা না হয়েছে, আবার
কবিতাই প্রেম।

কিন্তু এ-তো পুরোনো, পুরোনো,
পৃথিবীর সকল কবির কথা; নতুন, পুরোনো, এখন বিস্মৃত,
এখনো অশ্রুত, সব
কবির কথাই এই।...তাছাড়া তোমার
নারীর শরীরে আর নেশা নেই, শাড়ির পরশে আর সুরা নেই,
চোখে-চোখে কথা নেই, হাতে নেই কবিতার তাপ। তবে, তবু,
তোমার হাতেরে—
ঠাণ্ডা ঘরে, অন্ধকার দিন ভ'রে—
ঠাণ্ডার দাঁতের ধার পার ক'রে কে আনে আবার
কবিতার
তীব্র, মত্ত তাপে,
তীব্র, মত্ত প্রতীক্ষার তাপে?

প্রতীক্ষা কিসের ?
প্রতীক্ষা প্রেমের। কে প্রতীক্ষা করে ? যে প্রতীক্ষা করে সে-ও
প্রেম।
নারীর শরীরে আর কল্পনার শিরা নেই, শিরার বন্যায় আর
কবিতার সুরা নেই ; কিন্তু প্রেম আছে, তবু আছে ; কবিতারে
অথবা নারীরে নয় : শুধু প্রেম।
কখনো ভাবিনি আগে—ভাবতে-যে হবে, তাও ভাবিনি, বুঝিনি—
আজ দেখি ভাবতেই হবে,
জানতেই হবে
কে আমারে হাতে ধ'রে এত দূর এনেছে আয়ুর
শীতের সিঁড়িতে ; আবার শীতের দাঁত পার ক'রে কে আমার
হাতেরে চালায়
চড়া, খাড়া, বুক-ভাঙা কবিতার চাপে।…কী তোমার নাম দেবো,
যদি-না তোমারে বলি
প্রেম ? যদি ভাবি—যত ভাবি, তত আজ এক মনে হয়
ভালোবাসা আর যারে ভালবাসি।
মনে হয়—আর কারে নয়—ভালোবাসি ভালোবাসারেই।
যে-ভালোবাসার বাসা নতুন ননীর মতো নারীর শরীরে নয়,
ঢেউয়ের গানের মতো নামে নয়, হাজার ঢেউয়ের মতো নামে নয় ;
এমনকি, কবিতায় নয়, শব্দের ছন্দে নয়,
ছন্দের সম্মোহনে নয় :
যে-ভালোবাসার বাসা আমার হৃদয় শুধু—
তীব্র, মত্ত আমার হৃদয় ! আত্মহারা আমার হৃদয় !—
অথচ হৃদয়ে জরা ঠাণ্ডা আনে—সে-ভালোবাসার তবু শীত নেই,
অথচ হৃদয় ঝরে অন্ধকারে—সে-ভালোবাসার তবু শেষ নেই।
এই-তো এখন,

এখনই আমার মন ঠাণ্ডা ঘরে, অন্ধকার দিন ভ'রে একা ব'সে-ব'সে
যেন মিশে যায় হাওয়ার হত্যায়। এই-তো এখনই আমি
ফিরে যেতে চাই যেন তামসী মাতার গর্ভে, তারপর অজাত আত্মার
নিশ্চিন্ত নির্বাণে।
যে-বাসা ভেঙেই যাবে, তারে যেন নিজ হাতে ভেঙে দিতে চাই,
হৃদয়েরে নিজেই ঝরাই পাতাঝরাহাওয়ার হত্যায়। মনে হয়,
আজই মনে হয়,
এই যেন সেই শীত, যে-শীতে আমার
বুকে আর পড়বে না কবিতার হাত, আর হাতে আর ফিরবে না
কবিতার তাপ ;
ঠাণ্ডা ঘরে, অন্ধকারে, হাতে হাত ঘ'ষে, একা ব'সে-ব'সে,
কবিতারে ভালোবেসে বলবো না আর, 'ভালোবাসি,'
অন্তহীন ওষ্ঠহীন অন্ধকারে,
অণ্ডহীন কঠিন ঠাণ্ডায়।
তাই শুয়ে পড়ি তাড়াতাড়ি, তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো
কুঁকড়ে লুকোই
লেপের তাপের তলে ;
যতক্ষণ বিছানা গরম হয়, মনে হয় ঘুম যেন জীর্ণ কোনো জন্তুর
গোপন গুহা, ছোটো তার অন্ধকার রেখেছে ঠেকিয়ে
আরো-বড়ো অন্ধকারে এখনও—এখনও।
আর ঘুম যখন গরম করে, মনে হয় ঘুম যেন মাতার মমতা,
তামসী-মাতার নির্জন করুণ যোনি,
পরিমিত অন্ধকারে, মমতার নরম উষ্ণতা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে
অন্তহীন অন্ধকারে, কঠিন ঠাণ্ডারে—
আরো-এক দিন—আরো-এক দিন !

আরো-এক দিন ! আরো-এক দিন ।
দিন আসে আকাশে আবার, তবু অন্ধকার ।
দিগন্তের জন্ম-যন্ত্রণারে কণ্ঠ দেয় শালিক, চড়ুই, কাক, ওঠে ডাক,
তীক্ষ্ণ-ডাক, শঙ্খ-ডাক অন্ধকারে—'আরো দিন ! আরো-এক দিন !'
মুখ-ঢাকা বুক-চাপা অন্ধকারে, লেপের গোপন, গরম গুহায়
রাত্রি কাৎরায় ; আর রাত্রিরে জড়ায়ে ঘুম হাৎড়ায় স্বপ্নের শেষ ;
তবু ওঠে, আরো ওঠে ডাক, ফোটে দিন, আরো-এক দিন ।
সেই ঘরে, অন্ধকারে আরো-এক দিন ।
দিন আসে আকাশে আবার, ঘরে অন্ধকার ; আর সেই ঘরে, বন্ধ ঘরে, ঘুমের নিশ্বাসে ঘন অন্ধকারে
আধো ঘুমে আধো স্বপ্নে আচ্ছন্ন আমার
মনে হয়,
নেই,
ঘুম নেই, স্বপ্ন নেই, দিন নেই,
কিছু নেই—কিছু নেই—
শুধু এই ভালোবাসা,
শুধু এই ভালোবাসা ছাড়া,
আমার উন্মত্ত, তীব্র, আত্মহারা ভালোবাসা ছাড়া !

তাই গান, তাই আজও গান ।

স্বভাবকবি

স্বভাবকবি কথাটা প্রথম বোধহয় উচ্চারিত হয় গোবিন্দচন্দ্র দাসকে উপলক্ষ্য ক'রে। কে বলেছিলেন জানি না, কিন্তু কোনো-একজন বোদ্ধাই বলেছিলেন, কেননা গোবিন্দচন্দ্রকে এই আখ্যা নির্ভুল মানিয়েছিলো ; তাছাড়া এতে কবিদের মধ্যে যে-শ্রেণীবিভাগের অনুক্ত উল্লেখ আছে, সেটাও অনর্থক নয়। 'নীরব কবি'র অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে রবীন্দ্রনাথ গ্রে-প্রবর্তিত মূক-মিল্টনী কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করেন ; কিন্তু স্বভাবকবি কথাটার স্থায়িত্বের কারণ এই যে, যদিও এ-অর্থে কবি-মাত্রেই স্বভাবকবি যে সহজাত রচনাশক্তি না-থাকলে কবিতা লেখা অসম্ভব, তবু, বিশেষ-একটি অর্থে (আর সে-অর্থই গোবিন্দচন্দ্রে প্রযোজ্য) সব কবি স্বভাবকবি নন, অনেকে উল্টো, যদিও সেই বিপরীত লক্ষণের এ-রকম কোনো সহজ, যথার্থ অভিজ্ঞা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। স্বভাবকবি বলতে শুধু এটুকুমাত্র বোঝায় না যে ইনি স্বভাবতই কবি, অতএব কবিতা না-লিখে পারেনই না ; স্বভাবকবি বলতে সেই কবিকে বোঝায় যিনি একান্তই হৃদয়নির্ভর, প্রেরণাবিশ্বাসী, অর্থাৎ যখন যেমন ইচ্ছা লিখে যান, কিন্তু কখনোই নিজের লেখার সমালোচনা করেন না, হয়তো অন্যের লেখারও না, কেননা এই ধারণার তিনি বশবর্তী যে সমালোচনার শক্তি কবিত্বশক্তির পরিপন্থী। এই লক্ষণ কবিতে বর্তায় ব্যক্তিগত কারণে, কিংবা ঐতিহাসিক কারণে ; অর্থাৎ কেউ-কেউ স্বভাবতই স্বভাবকবি ; আবার কোনো-কোনো সময়ে সাহিত্যের চলতি হাওয়াই স্বভাবকবি বানায়। গোবিন্দচন্দ্র দাসকে মনে হয় স্বভাবতই স্বভাবকবি, কেননা তাঁর রচনায় এই অবিশ্বাস্য ঘোষণা পাই যে রবীন্দ্র-সমসাময়িক হ'য়েও রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব পর্যন্ত তাঁর চেতনায় অপ্রবিষ্ট। আর ঐতিহাসিক

স্বভাবকবি রবিরাজত্বের প্রথম পর্বে আমরা কয়েকজনকেই পেয়েছি : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের মধ্যে প্রধান, আর তার পরেই যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

এ-কথা বললে কি ভুল হয় যে বিশ-শতকের আরম্ভে যাঁরা বাংলার কবিকিশোর, ঐতিহাসিক স্বভাবকবিত্ব তাঁদের বিধিলিপি ছিলো? বিধিলিপি কেন? অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরই জন্য। পৃথিবীর প্রাণের উৎস সূর্য; কিন্তু সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব যদি ন' কোটি মাইলের কাছাকাছি না-হ'য়ে মাত্র ন' লক্ষ মাইলের কাছাকাছি হ'তো, তাহ'লে সূর্যের তাপে পুড়ে মরতো পৃথিবী। ক্ষীণ, ক্ষীণপ্রাণ বাংলা সাহিত্যে, তেমনি, রবি-কবির আগ্নেয় সত্তা, বহ্নিবীজ, অনিবার্যত অসহ্য হয়েছিলো প্রথমে; দাশরথি রায়ের পাঁচালীর পরে, রামপ্রসাদের শাক্তগীতিকার পরে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাংবাদিকতার পরে, এমনকি মধুসূদন দত্তের সিংহনাদের পরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবে বিস্মিত, মুগ্ধ, বিচলিত, বিব্রত, অভিভূত, সবই হওয়া সম্ভব, কিন্তু অসম্ভব তাঁকে সহ্য করা। সূর্যকে সহ্য করতে হ'লে যে-দূরত্ব চাই, সে-দূরত্ব অদ্যাবধি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ঘটেছে কিনা সন্দেহ; হয়তো আরো পঞ্চাশ বছর, কি পুরো একটা শতকই কেটে যাবে সেই শুভযোগের প্রস্তুতিতে। কত অসহ্য ছিলো বঙ্গসমাজে রবিবহ্নি, তার প্রমাণ-তো এই যে স্বল্পকাল পূর্বেও বাঙালি জনসাধারণের রবিভক্তার উপায় প্রত্যক্ষরূপে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না, সে-উপায় মূর্ত হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের দুই সহজ, সুসহ, মনোরম সংস্করণে: গদ্যে শরৎচন্দ্রে, আর পদ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে।

বিশ-শতকের প্রথম চতুর্থ গেছে বাঙালি কবির সংকটকাল। কবিত্বশক্তির অভাব বাংলাদেশে কখনো ঘটেনি; তাই এই অধ্যায়ের সমতল সদৃশতা, কবিতে-কবিতে ভেদচিহ্নের অস্পষ্টতা এবং সর্বাঙ্গীণ মৃদুলতা থেকে ন্যায়সম্মত মীমাংসা এটা নয় যে

অন্তর্বর্তী কবিরা অবশ্যতই অপ্রতিভ, সে-মীমাংসা এই যে তাঁরা সকলেই এক অনতিক্রম্য, অসহ্য পরিমণ্ডলের অধিবাসী। অর্থাৎ, তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথের অনতি-উত্তর তাঁরা, এ-কথা তাঁদের কল্পনার পরপারে ছিলো যে রাবীন্দ্রিক সরলতা মারাত্মকরূপে প্রতারক, তাই সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না-বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে। যাঁদের কৈশোরে-যৌবনে প্রকাশিত হয়েছে সোনার তরীর পর চিত্রা, চিত্রার পর কথা-কাহিনী, আর কথা-কাহিনীর পর কল্পনা-ক্ষণিকা, সেই মায়ায় না-ম'জে উপায় ছিলো না তাঁদের; সুর শুনে যে-ঘুম ভাঙবে সেই ঘুমই তাঁদের রমণীয় হ'লো, এত মধুর সেই সুর; স্বপ্নের তৃপ্তিতে মনে হ'লো আত্মচেতনা বৃথা, আত্মজিজ্ঞাসা অনর্থক, এত মধুর সেই সুর; জন্ম নিলো এই মনোরম মতিভ্রম যে রিনিঠিনি ছন্দ বাজিয়েই ছোঁয়া যাবে রাবীন্দ্রিক লাবণ্য, আর জল-সহজ হ'লেই পাওয়া যাবে জলের সরলতা। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা বরণ করলেন, কিন্তু গ্রহণ করলেন না; শুধু কানে শুনলেন, মনে ভাবলেন না; এও ভাবলেন না যে রবীন্দ্রনাথের যে-সরলতায় তাঁরা মুগ্ধ, তার চরিত্র প্রকৃতপক্ষেই জলের মতো, জলের মতোই তা সরল শুধু উপরিস্তরে, শুধু আপতিকরূপে; অন্তরে, অভ্যন্তরে, গভীরে তা কুটিল, ক্রূর, অনিশ্চিত, শান্তিহীন; স্রোতে, প্রতিস্রোতে, আবর্তে নিত্যমথিত; এমনকি, আরো গভীরে তা ঝড়ের জন্মস্থল; এমনকি, আরো গভীরে তা নক্রমকর-খরদন্ত-দুঃস্বপ্নের বাসা। যে-আশ্রয়ে স্থিত হলেন তাঁরা, সেই রবীন্দ্রনাথের অবিরাম জঙ্গমতা লক্ষ্য করলেন না, এমনকি দেখতেই পেলেন না; দুর্গম, ভীষণ কিন্তু অনন্ত মুক্তিপথ ব'লে জানলেন না রবিসমুদ্রকে, নিশ্চিন্তে নোঙর করলেন রবীন্দ্রবন্দরে। ফলত, তাঁরা সকলেই আবদ্ধ হলেন

স্বভাবকবিত্বে; বুদ্ধিকে জল্লাদজ্ঞানে বর্জন ক'রে একান্তরূপে শরণ নিলেন হৃদয়প্রহ্লাদের।

আবার বলি: এ-রকম না-হ'য়ে উপায় ছিলো না সে-সময়ে। আর এ-রকম হয়েছিলো ব'লেই এই অধ্যায়ের বিস্তৃততর বিবেচনা এখন প্রয়োজন। বিশ-শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের বাংলা কবিতার একটি সংকলনগ্রন্থ, যোগ্য ব্যক্তির সম্পাদনায়, প্রকাশিত হ'লে শুধু-যে বিশেষ-একটি যুগের বিশেষ-একটি স্বাদ আমরা নিবিড় ক'রে পাবো তা নয়, ললিত পদাবলীর বহুলতার মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে সুশ্রী কবিতাও কম পাবো না, আর সেই সঙ্গে এমন-অনেক কবির সঙ্গে আমাদের, অনেকের প্রথম, অনেকের নতুন ক'রে, পরিচয় হবে, যাঁরা অনেকে এখনই বিস্মৃত, অনেকের কোনো বই পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, যাঁদের শক্তি সুস্পষ্ট, শ্রম শ্রদ্ধেয়, আর সর্বোপরি এবং সব সত্ত্বেও, অসহ্য রবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে যাঁরা সতর্ক ক'রে গেছেন পরবর্তীদের।

* যতীন্দ্রমোহন বাগচী: ১৮৭৮-১৯৪৮। 'যমুনা', 'মানসী', 'পূর্বাচলে'র সম্পাদনা করেন। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'লেখা'। অন্যান্য প্রধান গ্রন্থ: রেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, জাগরণী, নীহারিকা, বন্ধুর দান, পাঞ্চজন্য, মহাভারতী, পথের সাথী (উপন্যাস), রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য (প্রবন্ধ)। সংকলিত কবিতা 'কাব্যমালঞ্চ' নামে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৮-এ রসচক্র তাঁকে অভিনন্দিত করেন, আর ১৩৫১ সালে তাঁর সাধারণিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

'হরাইজন'

সাহিত্যজগতের আবহাওয়ার ওঠাপড়া সাময়িক পত্রিকার ব্যারোমিটারে যেমন ধরা পড়ে এমন আর কিছুতে না। গণকৌতূহলে অনুৎসুক আত্মমগ্ন শিল্পীরও অভাব নেই; কিন্তু যন্ত্রবিপ্লবের পরে সার্বিক শিক্ষাপ্রচলনের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমবর্ধমান পাঠকমহলই হয়ে উঠেছেন সাহিত্য ও শিল্পের প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক। এর ফলে আলোকপ্রাপ্ত-জনতার মনে কতটা পরিমাণে শিল্পবোধ জাগ্রত হয়েছে সে-প্রশ্ন না-তুলে এ-কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে শিল্পী সাহিত্যিক সকলকেই এই আধুনিক পেট্রনদের অবকাশযাপনের দাবী চরিতার্থ করতে হয়। বহুসংখ্যক মানুষের চিত্তবৃত্তির অনুশীলনে সহায়ক ব'লে এ-ব্যবস্থা যেমন বাঞ্ছনীয়, এর বিপদ সম্পর্কে অনবহিত হওয়াও তেমনি মারাত্মক। পেট্রনমাত্রেই শ্রদ্ধাশীল গুণগ্রাহী হন না। আর সেই পেট্রন যখন অস্থির-রুচি অগণ্য অপরিচিত, তখন এ-আশঙ্কা থাকেই যে কোনো-না-কোনো সময়ে বিবেকবান শিল্পী ও সাহিত্যিককে গণরুচির কাঠগড়ায় আসামী হয়ে দাঁড়াতে হবেই, যার সহজ অর্থ হচ্ছে—হয় সাময়িক রুচির অনুশীলনে খ্যাতি বজায় রাখা, না হয় উপেক্ষিত অরণ্যে নিঃসঙ্গ মানসভ্রমণ,—এ ছাড়া তৃতীয় পথ নেই।

এদিকে বাজার মন্দা, পঁচিশ বছর পরে-পরে যুদ্ধ, রাজনীতি, জীবনধারণের ক্রমবর্দ্ধমান দুরূহতা ইত্যাদি সমসাময়িক চিত্তবিক্ষেপকারী ঘটনায় মন আচ্ছন্ন বলেই শিল্প ও সাহিত্যে মানুষের স্বাভাবিক উৎসাহ বর্তমানে স্তিমিত। দৈনন্দিন জীবনযাপনের এই সব দুর্গতি—যদিও এরই মধ্যে মানুষের জন্মমৃত্যু, প্রকৃতিতে ঋতু আবর্তন, বালকের যৌবনে এবং যুবকের প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়া অব্যাহত গতিতে চলেছে—এই সব সামাজিক দুঃখকাহিনী যদি সাহিত্যেও বিবৃত না হলো এবং সাহিত্যিক যদি অনতিদূর ভবিষ্যতে সুদিনের কোনো প্রতিশ্রুতিই দিতে না পারলেন, তাহলে সেই সাহিত্য ও সাহিত্যিক যে অবজ্ঞেয়, এমনকি নিন্দাভাজন এ-কথাটা এমন প্রচলিত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোনো সাহিত্যিক স্লোগানে কুণ্ঠিত হলে তাঁর রচনার ব্যর্থতা স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়, পাঠযোগ্য ব'লেও বিবেচিত হয় না। কেননা জীবন থেকেই যিনি 'পলাতক,' অর্থাৎ দৈনন্দিনতা যাঁর রচনায় প্রকটিত নয়, তিনি আবার গ্রাহ্য কিসে?

সাহিত্য-শিল্পের এই বিপদের দিনেও সাহিত্যের নিত্যকালের মূল্যে আস্থা রেখে প্রাণের দীপশিখা কালো হাওয়ার ঝাপটা থেকে বাঁচিয়ে বিবেকবান কতিপয় আত্মনিষ্ঠ মানুষ সব দেশেই নিঃশব্দে কাজ ক'রে যান। সাহিত্য ও শিল্প এঁদের জীবনে যেমন হাতুড়ি কি তুরপুন নয়, তেমনি চাঁদ তারা কোকিলের ছন্দোবদ্ধ ললিত পদাবলীও নয়। ভূগোলে অনুক্ত সেই ষষ্ঠ মহাদেশের তাঁরা দিশারী যার সন্ধান নিজের মনের মধ্যেই। একনিষ্ঠ অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে সেই নবমহাদেশে উপনিবেশ বসাতে হয়। সে-দেশ যার আবিষ্কার করা হলো না, দুর্ভাগা সে: সে তো জীবন থেকে পলায়ন নয়, জীবনে নিমজ্জন। ইংলণ্ডে এই মার্জিত বোধে আলোকিত লেখকবৃন্দের মুখপত্র Horizon পত্রিকা। যুদ্ধের অপরিমিত ক্ষতি এবং হতাশায় ইংলণ্ডের অস্তিত্ব পর্যন্ত যখন বিপন্ন তখনই এই পত্রিকার জন্ম হোলো। হরাইজনের নির্ভীকতা এই জন্যই প্রশংসার যোগ্য যে সাময়িক অকৃতার্থতার উর্ধ্বে উঠে শিল্পের স্বয়ম্বশ প্রাণবন্ত ব্যঞ্জনায় যাঁরা প্রতিশ্রুত, হরাইজন তাঁদেরই খুঁজে-খুঁজে আনছেন। যে-প্রগতিশীলতার আসল নাম সাংবাদিকতা, তার আক্রমণ থেকে ইংলণ্ডও মুক্ত নয়। অথচ এই কোলাহলের অন্তরালে যুদ্ধ, বিপ্লব, উৎকণ্ঠা ও হতাশার মধ্যেও সিটওএল ভ্রাতা-ভগ্নী নিঃশব্দে কাজ ক'রে চলেছিলেন। যুদ্ধের পরে আপাতজয়ের আস্ফালন এবং আশার অলীক উল্লাস যখন মিলিয়ে গেল, তখন আত্মমগ্ন এলিঅটের পাশে ইডিথ সিটওএলই ইএটসের পরে ইংলণ্ডের প্রধান কবি ব'লে বন্দিত হলেন। হরাইজনও যুদ্ধকালে অলীক আশায় না মজেছেন তা নয়, কিন্তু তাঁরা যে যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার আগেই মতি স্থির করতে পেরেছেন এ আনন্দের কথা।

শ্রীমতী সিটওএলের কথায় ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক কবিতার কথা আসে। ইএটসের উন্মাদনার পরে এলিঅটের ক্ষুরধার প্রতিভার দীপ্তি দেশে বিদেশে সমসাময়িক কবিকুলের রচনায় অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করলেও স্বভাবতই তিনি বাক্‌কুণ্ঠ। বছরে একটি কবিতা তিনি আজকাল লেখেন কিনা সন্দেহ। অডেন আমেরিকা-প্রবাসী হয়ে অবধি এমন কিছু করেননি যা থেকে তাঁর ক্রমপরিণতিতে আশ্বস্ত হওয়া যায়। এই পত্রিকারই কোনো সংখ্যায় স্পেণ্ডরের আবেগলব্ধ সুন্দর একটি প্রেমের কবিতা দেখে আশা হোলো তাঁর মনের তুষার বুঝি আবার গলবে। মার্কিন কবি কমিংসএর কবিতা হরাইজনে নিয়মিত ছাপা হচ্ছে আজকাল। ভাষার বিন্যাসে আর আকস্মিক শব্দযোজনায়

কমিংসের কবিতায় যে-পৃথিবীর প্রকাশ, আপাতদৃষ্টিতে তা উন্মাদের পৃথিবী। যতিচিহ্নহীন, ক্যাপিটাল-অক্ষর-বর্জিত তাঁর শব্দরাজি সাধারণ দৃষ্টিতে প্রলাপের সামিল।

a wai
ter lugs his copious whichwhat skilfully here
& (simply infinite) there &
(Smoke)a fair
Y socked flopslump (& juke)ing shrieks Yew May
n't Dew Thiz Tew Mee

কোনো এক হোটেলঘরের ডিনারদৃশ্য। ব্র্যাকেটগুলো বর্জন করে একটু চেঁচিয়ে পড়লেই বোঝা যায়—ওয়েটারটা প্রকাণ্ড একটা ট্রেতে একটা কী (whichwhat) নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বাহারী মোজা পরা ভারীদেহ একটা মেয়ে চীৎকার করছে। অন্তহীন ধূম্রতত্ত্বে মগ্ন উদাসীন কে আর-একজন। বন্ধনীচিহ্নগত অংশগুলি তাঁরই উক্তি ব'লে ধ'রে নিতে পারি। কবিতার পংক্তিতে-পংক্তিতে ইচ্ছাকৃত বাধার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে পাঠকের সঙ্গে রসিকতা করার সামিল বলেও গণ্য করতে পারি না। যে-আত্মপ্রত্যয়হীন বস্তুমুগ্ধ উদ্দেশ্যহারা পৃথিবীর ছন্নছাড়া ছবি তিনি আঁকতে চান, গির্জের কথায় যেখানে বলতে হয়:

this is a deaf dumb church and blind
with an if in its soul
and a hole in its life
where the young bell tolled
and the old vine twined

তার জন্য ভাষাতেও কিছু ভাঙচুর অনিবার্য, কিন্তু জয়স যেমন এক হাতে ভেঙেছেন আরেক হাতে গড়েছেন, কমিংস সে-রকম পারলেন না ব'লে তাঁর রচনা, পাউণ্ডের 'ক্যাণ্টোজ'-এর মতো, শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের জাদুঘর-নমুনা হ'য়েই থাকবে।

দেখা যাচ্ছে, অন্য দেশের চেয়েও মার্কিন দেশে সাহিত্যিকের দুর্দশা বেশি। Horizon-এর মার্কিন শিল্পসাহিত্যের আলোচনায় উৎসর্গিত সংখ্যাটি প'ড়ে

এ-কথাই বুঝতে পারলুম যে মার্কিন সাহিত্যের অধিপতি আজ চারটিমাত্র অতিবৃহৎ প্রকাশকমণ্ডলী—আর হলিউড। যে-বইয়ের কয়েক লক্ষ কপি অন্তত কাটবে না, সে-বই ছাপা হওয়াই দুষ্কর। আর লক্ষ-লক্ষ সভ্যসম্বলিত বুকক্লবের মাসিক মনোনয়ন যে-বই লাভ করতে না পারলো সে-বইয়ের বাজার নেই। তাই এমন কোনো লেখক সে-দেশে যদি থাকেন (আর আছেনও), বুকক্লবসম্মত রুচিতে আস্থা না রেখে মন খুলে নিজের কথা বলার দুঃসাহস যাঁর আছে, তাঁর বই উদ্যোগী হয়ে তাঁর বন্ধুরা আর বিত্তবান হলে তিনি নিজে ছাপাতে না পারলে আর ছাপাই হবে না। বাড়ির ছেলে হঠাৎ যদি আপিশমুখো না-হ'য়ে লেখক হবার সংকল্প করে, আর দুপুরে বাড়ি ব'সে থাকে, বাড়িতে সেটা একটা কেলেঙ্কারির সামিল, প্রায়ই তাকে গৃহত্যাগ করতে হয়, ছাড়তে হয় নিজের শহর, নিউ ইঅর্ক ব্যয়বহুল ব'লে যেতে হয় নিউ অর্লীন্স-এর মতো কোনো মফঃস্বলে, যেখানে উপনিবেশ স্থাপন ক'রে পরস্পরের সাহায্যে নতুন লেখকের বেঁচে থাকা কোনোরকমে সম্ভব। অবশ্য সেই ছেলেই যদি হঠাৎ হলিউডের নজরে পড়ে, কি দৈবাৎ কোনো সেরা-বিকিয়ে লিখে ফেলে ডলারে ঝলমল করে, তাহ'লে সেই বাড়ি, সেই শহরই তাকে 'সিংহ' বানিয়ে জমকালো পার্টি দেবে—কিন্তু তা যদি না হ'লো তবে কিছুই হ'লো না। হেনরি জেমসের মতো এলিঅটও যে ইংরেজ ব'নে গেলেন, সেটা অনিবার্যই মনে হয়; আবার অল্ডস হক্সলি কেন মার্কিনদেশে বাসা নিলেন তার উত্তরে তিনি নাকি বলেছেন: 'মেটিরিয়লিজম যে কত ব্যর্থ তা বোঝবার জন্য আমেরিকাতেই থাকতে হয়।'

হরাইজনের বৈশিষ্ট্য তার দৃষ্টির ব্যাপ্তিতে, ইংলণ্ডের বাইরে যে ইওরোপ আছে, ইওরোপের বাইরে আমেরিকা, আর ইওরোপ-আমেরিকার বাইরেও যে পৃথিবী আছে, সে-বিষয়ে সচেতনতায়, আর এই আণবিক যুগে মানবিক মূল্যবোধের অঙ্গীকরণে।

নরেশ গুহ

সমালোচনা

শিল্প কথা, নলিনীকান্ত গুপ্ত। কালচার পাবলিশার্স।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তর পাণ্ডিত্য অসামান্য ব'লে অনুমান করি, কেননা 'শিল্প কথা'য় সংগৃহীত প্রবন্ধাবলী সংস্কৃত, ল্যাটিন, ফরাশি ও ইটালিয়ান উদ্ধৃতিতে অলংকৃত এবং সাহিত্যক্ষেত্রে বিশ্ববিহারী। পাণ্ডিত্য আর মনীষার সংযোগ আবশ্যিক নয়, আবার রুচিও সর্বত্র মনীষার অনুগামী হয় না: কিন্তু নলিনীকান্তর চিন্তাশক্তি স্বীকার্য, আর যতক্ষণ-না আধুনিক সাহিত্যে কটাক্ষপাত করেন—সাধারণত রুচিভ্রষ্টও হন না। সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় তিনি-যে অধিকারী, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই; আর সেইজন্যই তাঁর কাছে আশা আমাদের বড়ো, 'শিল্প কথা'র মতো খণ্ডপ্রবন্ধের সংগ্রহে সে-আশা মেটে না। প্রবন্ধগুলি আকারে ক্ষুদ্র ব'লে আপত্তি নয়: আপত্তি এই যে তারা লক্ষ্য করেছে সাধারণ পাঠককে, শ্রেষ্ঠ পাঠককে নয়; গাম্ভীর্যে তারা ন্যূন, ক্বচিৎ প্রগল্ভতার প্রশ্রয়ী। ফলত, লেখক তাঁর স্বকীয় চিন্তার পক্ক ফল এখানে দিতে পারেননি; বিশ্ববিশ্রুত নানা মুনির নানা মত সরল ক'রে পরিবেষণ করেছেন নিজের মন্তব্যের সঙ্গে জুড়ে।

ধ্রুপদী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ-পদ্ধতিও নির্ভুল মীমাংসায় পৌঁছিয়ে দিতে পারে—কেননা যে-সাহিত্য হাজার, পাঁচশো কিংবা দেড়শো বছরেরও পুরোনো, সেখানে সমালোচনার তৈরি রাস্তায় চলাফেরা সহজ—কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচনা সম্পূর্ণই স্বাধীন চিন্তার প্রয়োগসাপেক্ষ, আর সেই কারণে সমসাময়িকের আলোচনাই সমালোচকের পরীক্ষা। এ-পরীক্ষায়, দুর্ভাগ্যত, নলিনীকান্তর মেধা ও বিদ্যা তাঁকে উত্তীর্ণ করতে পারেনি, অপঘাত ঘটেছে বার-বার; কেননা যদিও বিদেশী ও স্বদেশী আধুনিকদের অনেকগুলি পংক্তি তিনি উদ্ধৃত করেছেন, তবু এ-কথা একেবারেই লুকোতে পারেননি যে আধুনিকের জগতে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য নেই, এবং আমাদের মনে এই অনপনেয় সন্দেহ জাগিয়েছেন যে উল্লিখিত, এমনকি আলোচিত কবিদের রচনাবলী তিনি যথোচিতরূপে পড়েননি, হয়তো আদৌ পড়েননি, শুধু দৈবাৎ-চোখে-পড়া কোনো উদ্ধৃতির পুনরুদ্ধার

করেছেন। উদাহরণত, ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠায় জাপানি কবিতার ব্যর্থ অনুকরণের নমুনাস্বরূপ যে-রচনা তিনি পেশ করেছেন, সেটি বিষ্ণু দে-র শুদ্ধতম গীতিকবিতার অন্যতম, পূর্ব-পাউণ্ডের অনুরূপ, কিন্তু নলিনীকান্তর ছিন্ন বিকৃত উদ্ধৃতি দেখে মনে হয় মূল কবিতাটির সঙ্গে তিনি পরিচিতই নন।* অবশ্য পাউণ্ডকে নলিনীকান্ত দাঁড় করিয়েছেন 'হীন গ্রাম্যতা'র নিদর্শনস্বরূপ, কেননা, এফ. এল. লুকস-এর মতে, পাউণ্ড ইংরিজির সঙ্গে 'গ্রীক লাতিন (তাও আবার ভুল) মিশিয়ে পাণ্ডিত্য বা চাতুরী দেখান, সস্তা অনুপ্রাসের চটক ফলান।' লুকস-এর মতের বিষয়ে এখানে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক, হয়তো বাহুল্য, কিন্তু যে-রকম নিশ্চিন্ত উৎফুল্লতায় নলিনীকান্ত এ-মত উদ্ধৃত করেছেন তাতে স্বতই মনে হয় যে তিনি শুধু এফ. এল. লুকস-এর গ্রন্থই পড়েছেন, এজরা পাউণ্ডের কবিতা পড়েননি। এ-রকম অচিন্তিত মন্তব্যের আরো একটি উদাহরণ আছে ৭৭ পৃষ্ঠায়, যেখানে গদ্যধর্মী পদ্যের প্রসঙ্গে

অনেকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে
কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গোরু-খোঁজা ক'রে

তবু তোমরা আজকের মতো চুপ করো
একটু চুপ ক'রে থাকতে দাও আমাকে

এই উদ্ধৃতি দুটিকে প্রথমে এলিঅটের 'অনুকরণ বা প্রতিধ্বনি'রূপে চিহ্নিত ক'রে, পরে তিনি বলছেন: '"আঙ্গিক" হিসেবে বলা হয়েছে এ সব নাকি অনবদ্য। কারণ প্রথমটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সে হ'ল নিখুঁত পয়ার (নূতন ধরনের ভঙ্গকুলীন যদিও) আর দ্বিতীয়টি পাঁচের চালের মাত্রাবৃত্ত

* মূল কবিতা	নলিনীকান্তর উদ্ধৃতি
চলে গেল চাঁদ,	শীতল স্থির আকাশ
শান্ত ধূসর অন্ধকার,	গ্যাস নিভে গেছে
সূর্য এখনো আসেনি,	জাগে নি কো কাক
শীতল স্থির আকাশ,	বাতাস—চুপ
গ্যাস নিভে গেছে,	শুধু কাঁপে তার শুধু বাজে যেত বক্ষ তার—
জাগে নি কো কাক,	
বাতাস চুপ—	
শুধু কাঁপে তার, শুধু বাজে যেত বক্ষ তার।	

অথবা মতান্তরে চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত।' দ্বিতীয়টিকে মাত্রাবৃত্ত অথবা স্বরবৃত্ত কে বলেছিলেন জানি না, কিন্তু গুপ্ত-মহাশয় এখানে শোচনীয়রূপে প্রতারিত হয়েছেন, কেননা ওটি স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত বা অন্য যে-কোনো নামধেয় ছন্দের অন্তর্ভুক্ত নয়, নিছক গদ্যকবিতা। কলাকৌশলের দিক থেকে, এবং সব দিক থেকেই, উদ্ধৃতি দুটি জাতে আলাদা, এক কোপে এ-দুয়ের বলি চলে না, এক যূপেও না। আর এদের সঙ্গে এলিঅটের সম্বন্ধ মাত্র এটুকুই আবিষ্কার করা সম্ভব যে আমাদের অনেক প্রবীণ প্রাজ্ঞদের ধারণায় আধুনিক বাঙালি কবিকে ছুঁয়ো দিতে হ'লে এলিঅট পাউণ্ড ইত্যাদি কয়েকটা নাম প্রথমেই আউড়ে নিতে হয়।

এ ছাড়া 'শিল্প কথা'য় ক্ষুদ্রতর প্রমাদও আছে; ক্ষুদ্র ব'লে উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের আবাল্যপরিচিত কোনো-কোনো কবিতাপংক্তির রূপান্তর, 'Will no one tell me what she sings?'-এর বদলে 'Can anyone tell me what she sings?' আর 'ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু'ধারে'র বদলে 'ঢেউগুলি নিরুপায় ভেঙে পড়ে দু'ধারে' অনেকেরই কর্ণপীড়া ঘটাবে, কারও-কারও মর্মপীড়া। 'রবার্ট গ্রীভস্ (Robert Greaves)' ব'লে একজন ইংরেজ কবির খবর এ-বইয়ে পাওয়া গেলো, যাঁর নাম ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি, যদিও রবর্ট গ্রেভস (Robert Graves)-এর কথা শুনেছি। তবে 'East Coker' 'East Coaker' হয়েছে বোধহয় ছাপারই ভুলে।

ইশারা। টুর্গেনিভ-এর 'Poems in Prose'-এর অনুবাদ। অনুবাদক: মৃণালকান্তি দাশ। শ্রীহট্ট লেখক ও শিল্পীসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত। দেড় টাকা।

কন্সটান্স গারনেটের অনুবাদ বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ে যে টুর্গেনিভের 'পোএমস ইন প্রোজ' পৃথিবীর গদ্যকাব্যের চরম চূড়ার অন্যতম। বাংলা অনুবাদের পক্ষে এ-বই বিশেষভাবে উপযোগী; কেননা এই ধরনের সান্ধ্যধূসর সোনালিবিষণ্ণ স্বপ্নিলতার বাংলা ভাষা এখন বিশেষভাবে অনুকূল। তার উপর শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি দাশ নিজে কবি, এবং বিষণ্ণ সুরেরই কবি। টুর্গেনিভের সুরটি, তাই, মাঝে-মাঝে ধরা পড়েছে 'ইঙ্গিতে'; টুর্গেনিভীয় জাদু মাঝে-মাঝে আমাদের স্পর্শ করে এখানেও। মাঝে-মাঝে, কিন্তু সর্বত্র নয়; কেননা অনুবাদক যত বড়ো সুযোগ পেয়েছিলেন তত নিবিড় মনোযোগ

দেননি, যত্ন নেননি যথেষ্ট, পরিশ্রম করেননি যথোচিত, মনে-মনে ভেবে ছাখেননি এ-অনুবাদ তাঁর হাতেই আরো কত ভালো হ'তে পারতো। ফলত, বাংলা ভাষার সাধারণ তথাকথিত অনুবাদের সঙ্গে 'ইঙ্গিতে'র যদিও তুলনাই হয় না, তবু বইখানা টুর্গেনিভ হয়নি, হয়েছে টুর্গেনিভের স্মারক; পাঠযোগ্য, উপভোগ্য, কিন্তু এমন নয় যাতে আমরা গারনেট পড়তে পারলেও এটিই পড়বো, কিংবা ইংরেজি-না-জানা পাঠক যাতে ঠকবেন না, কেননা এতে টুর্গেনিভের সৌরভ থাকলেও টুর্গেনিভের মহিমা নেই।

বইখানার একটি ভূমিকা লিখেছেন শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়। ভূমিকাটি একান্তই টুর্গেনিভের পরিচায়ক হওয়া স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু অপ্রত্যাশিত এবং একটু অপ্রাসঙ্গিকরূপে শ্রীযুক্ত রায় 'কোমল তুলির মায়াময় আঁচড়ে' টুর্গেনিভের দায় সেরে লিপিবদ্ধ করেছেন অনুবাদকেরই পরিচয়, আর পরিশেষে প্রশ্ন তুলেছেন: 'মৃণালবাবু অত্যন্ত একা, একান্ত নিঃসঙ্গ, নিরাসক্ত; এবং তাঁর রচনা এই নিঃসঙ্গতার বেদনায় ভারাতুর। কিন্তু, কেন? জনতার মহিমা কি মৃণালবাবুকে আকর্ষণ করে না, অসংখ্য জীবনের কলরোল কি তাঁকে চঞ্চল করে না?...'

উপলক্ষ্য যেখানে টুর্গেনিভের মতো শুদ্ধশীল শিল্পী, তার উপর 'পোএমস ইন প্রোজ'-এর মতো পবিত্র চরিত্রের কাব্য, সেখানে, সেখানেও এই প্রশ্ন!...কিন্তু কথাটা একেবারেই অবান্তর হয়তো নয়, কেননা টুর্গেনিভ নিজেই ছিলেন তাঁর সময়ে 'অত্যন্ত একা, একান্ত নিঃসঙ্গ,' আর ঠিক এই প্রশ্ন তাঁর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করবার উৎসাহেরও অভাব ছিলো না তাঁর সেই মাতৃভূমিতে, যেখান থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হ'য়ে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন।

বু. ব.

প্রাপ্ত

Visva-Bharati Quarterly: Education Number. Ed: Kshitis Roy; উপনিষদ্: বিধুশেখর ভট্টাচার্য। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী, ॥৹; কঙ্কর: ললিত মুখোপাধ্যায়। ৸৹

সম্পাদক ও প্রকাশক: বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা থেকে
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত

কবিতা

ত্রয়োদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা] আষাঢ় ১৩৫৫ [ক্রমিক সংখ্যা ৫৮

টি. এস. এলিঅট-এর কয়েকটি কবিতা

নিসর্গদৃশ্য

১. নিউ হ্যাম্পশিয়র

বউলের মাস আর ফলের মাসের মাঝে
শিশুদের গলা ঐ আমজামবনে:
সোনা মুখ, রাঙা মুখ
সবুজ ডগার আর শিকড়ের মাঝে।
কালো পাখা, মেটে পাখা, দাও ছায়া দাও;
বিশটি বছর, আর, বসন্ত উধাও;
আজ কাঁদে, কাল কাঁদে হায়;
ঢাকো ঢাকো, পল্লবিত আলোক! আমায়;
সোনা মুখ, কালো পাখা, ধাও
জড়াও, দোলাও,
লাফাও ও গাও
দুলে' দুলে' উঠে' যাও জামরুলের ডালে।

২. ভার্জিনিয়া

লাল নদী, লাল নদী,
মন্থরস্রোত তাপ তো নীরব,
কোনো ইচ্ছাই নিথর নয় কো নিথর নদীর মতো;
তাপের স্তম্ভ নড়ে কি একটিবার
বউ কথা কও বারেক ডাকায়? স্তব্ধ পাহাড়

প্রতীক্ষমান। ফটকে তোরণে প্রতীক্ষমান। বেগনি গাছেরা
শাদা গাছগুলো প্রতীক্ষমান
দেরি কতো সয়, শতদিকে ক্ষয়। জীয়ন্ত প্রাণ
জীবন্ত প্রাণ কঠিন অচল। সদাই সচল
লৌহ ভাবনা—এসেছিল তারা আমারই সঙ্গে
আমারই সঙ্গে বিদায়রঙ্গে যায় :
ওগো লাল নদী ওগো নদী লাল নদী।

৩. অস্‌ক্

ভেঙো না হঠাৎ ডাল অথবা কোরো না আশা
শাদা হরিণেরে শাদা কুয়ার আড়ালে।
ফিরাও নয়ন, খর তীর নয়, মন্ত্রজালে
অতীত কুহক আর জাগিও না। ঘুমাক্ ঘুমাক্ নতশিরে।
নামাও যতনে ধীরে, কিন্তু নয় অতল গভীরে।
তোলো চোখ দুটি
যেখানে সড়ক নামে এবং যেখানে সড়ক গিয়েছে উঠে
শুধু কোরো সন্ধান সেথায়
যেখানে ধূসর আলো মিশে' যায় সবুজ হাওয়ায়
মুনির মন্দিরে, পরিব্রাজকের প্রার্থনায়।

৪. র‍্যানথ্, বাই গ্লেন্‌কো

এখানে উপোসী কাক, এখানে সহিষ্ণু মৃগ পাতে
সংসার বন্দুকেরই তরে। টস্‌টসে আকাশ আর
থস্‌থসে জলার মাঝে, কদাচিৎ স্থান
লম্ফের বা ওড়বার। বস্তু ঝরে ঝুর্‌ঝুর্ শীর্ণ হাওয়ায়
শীতল চাঁদের কিম্বা উষ্ণ চাঁদিনীর। পথ চলে ঘুরে ঘুরে'
প্রাচীন যুদ্ধের অবসাদে
চলে ভগ্ন ইস্পাতের বিলগ্ন ক্লান্তিতে

হতবুদ্ধি অন্যায়ের আর্তনাদে, শোভন সে
শুধু স্তব্ধতায়। স্মৃতি শক্তিধর, হাড়েরও নাগাল
সে ছাড়িয়ে যায়। গর্ব ভাঙে মট্‌মট্
তবু ছায়া লম্বিত গর্বের, দীর্ঘবর্ত্মে নেই
হাড়ে হাড়ে সংঘর্ষে মিলন।

৫. কেপ অ্যান্

আহা। চট্‌পট্ চট্‌পট্ শোনো ঐ গানচড়াই
বিলচড়াই, মাঠচড়াই, সাঁঝের আকাশে তালচড়াই
সকালে বিকালে। নাচ দেখ চেয়ে নাচ দেখ ধেয়ে
ভর্-দুপুর হরিয়ালের। ছেড়ে দাও তার খামকাখুশিতে
পাপিয়া-কে, বাছা বড়ো লাজুক। ডেকে আনো ঘরে
দোয়েলের সুরে ধারালো শিসে কাদাখোঁচাকে
খাগড়া-ঝোপে যে এড়িয়ে বেড়ায়। ধাওয়া করো ঐ
পায়দল-চল ডাহুক-কে। ধাওয়া করো ও-ফিঙের
তীরের নাচনে ছুটে' ধাওয়া। করো মৌনে বরণ
বাদুড়-বীরকে। সবই দিল্‌খুশা। মধুর মধুর
তবু ছাড়ো দাবি, ছেড়ে দাও জমি শেষে
জমির মালিক হিম্মৎ-ওয়ালা গাংচিলকেই।
আবোলতাবোল শেষ।

কোরিওলান

২. কর্ণের খেদ বা মধ্যকালীন দুঃখ

ক্রন্দন কিসের ক্রন্দন করবো বলো ?
সর্বজীব নশ্বর নশ্বর
বৃটিশসাম্রাজ্যের নাইট, নবাব, সর্দার
আহা সে সর্দার! নিজামৎ জং,

রানাশের জঙ্গের তারকা (সোনার, রুপার)
কাশ্মীরের কাকের পদক।
ক্রন্দন ক্রন্দন করব কিসের ক্রন্দন করব ?
প্রথম কাজই হল অনেক সমিতি গড়া :
পরামর্শ-পরিষদ, উপদেষ্টা-সমিতি ও বিশেষজ্ঞ এবং বহুশাখা-
সমিতি গঠন।
একই সম্পাদকে হবে বহু সমিতির।
কিসের ক্রন্দন করি বলো ?
শ্রী শিবেন পাক্‌ড়াশী মাসিক পঞ্চান্নটাকা মাহিনায়
বছরে বছরে দু'টাকা মাহিনাবৃদ্ধি হারে আশিটাকা চরম হিসাবে
টেলিফোন অপারেটারের পদে বাহাল হলেন।
একটা সমিতি গড়ো, সে সমিতি জলসরবরাহের ব্যাপারে
এক এন্‌জেনিয়ার-কমিশন গড়ে দেবে।
কমিশন চাই এক চিরশান্তি ব্যবস্থার জন্যে
আফ্রিদিক মিশনের সঙ্গে আলোচনা করে'।
লাঠিয়াল, গুপ্তিছোরানির্মাতা ও কামারসজ্ঘেরা
বায়না কম্‌তি বলে' এক আপত্তির যুক্তসমিতি করেছে
ইতিমধ্যে সান্ত্রীদল খালে বিলে পাশা খেলে
আর খালে বিলে ব্যাং ডাকে (শোনো দ্বৈপায়ণ !)
জোনাকিরা আলো জ্বালে ক্ষীণপাতে বিদ্যুৎবিলাস
কিসের ক্রন্দন করি বলো ?
জননী জননী
এই তো বংশের যতো মূর্তি সারে সারে, ধূলাকীর্ণ প্রতিমূর্তি,
সবাই দেখতে এক, চন্দ্রবংশজাত,
সবাই দেখতে এক, আলো যেই জ্বলে' ওঠে থেকে থেকে মশান-
আলোয়
প্রহরীর হাতের মশালে হাইতোলার ফাঁকে ফাঁকে।

আহা হে গোপন…হে গোপন…যেখানে বলাকাপাখা সমাহিত
মুহূর্তের তরে রুদ্ধগতি
নিথর মুহূর্ত এক, মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম, মধ্যাহ্নের বিরাট বটের কোনো
চূড়ার শাখায় স্থির
বিকালের হাল্‌কা হাওয়ায় কাঁপা বুকের পালকতলে
সেখানে মন্দার খোলে পাখা তার, পারিজাত নত ঘরের চৌকাঠে
হে জননী (এ সব মূর্তির মধ্যে, যথাযথ নামাঙ্কিত, এর মধ্যে নয়)
আমি এক ক্লান্ত মাথা এ সব মাথার মধ্যে
মোটা ঘাড়ে ভারি মাথা
বাতাসকাটারি নাক
জননী আমার
আমরা কি একদিন, এখনই হয়তো মিলতে পারি না দোঁহে
যদি ধৈর্য, সর্তত্যাগ, আত্মদান, পরস্পর অনুরোধ
এখন সবাই মানে
আমরা কি পারি না মিলতে
হে গোপন
নিথর মধ্যাহ্নে, স্তব্ধ দাদুরীমুখর রাত্রিতে গোপন।
এসো এসো চামচিকের পাখার বিস্তারে, এসো জোনাকির অগ্নি-
কণিকায়, ছারপোকার ক্ষিপ্রতায়
যতো সব ক্ষুদ্র জীব জন্মমৃত্যুস্বভাব, নশ্বর
ক্ষুদ্র জীব মাটির ধূলায় মিহি গান করে রাত্রির গভীরে।
হে জননী
আমরা সমিতি চাই, সর্বজন প্রতিনিধিমূলকসমিতি, তদন্ত-সমিতি
পদত্যাগ পদত্যাগ পদত্যাগ

বর্ন্ট্ নর্টন

১

বর্তমান কাল আর গতকাল উভয়ে বুঝিবা
বর্তমান ভাবীকালে
আর ভাবীকাল ভাব্য অতীতজঠরে।
যদি সর্বকাল থাকে চিরকালই বর্তমান
অমোচ্য সে সর্বকাল শূন্য আশাহীন
যা হতে পারত সে তো তত্ত্বমাত্র
সদাসর্বদাই চিন্তার কল্পনাবিশ্বে
শুধু চিরন্তন সম্ভাবনা।
যা হতে পারত আর যা সত্যই হল
দুয়েরই নির্দেশ এক, এক লক্ষ্যে, সদাবর্তমানে।
পদক্ষেপ ওঠে প্রতিধ্বনিত স্মৃতিতে,
যে দালানে যাই নি আমরা
দরজার দিকে, যে দরজা খুলিনি কোনো দিন
গোলাপ বাগানে যেতে, সেই পথে। আমার কথার প্রতিধ্বনি
এই ভাবে, তোমার হৃদয়ে।

কিন্তু সে যে কি উদ্দেশ্যে
গোলাপ-দানিতে ঝরা পাতার ধূলায় ঝড় তুলে ;
আমি তা জানি না।

অন্য সব প্রতিধ্বনি
বাগানে বাসিন্দা। আমরা করব কি ধাওয়া ?
শীগগির, পাখিটা বলে, খোঁজো, খোঁজো, ওরা
বাঁকটা ছাড়িয়ে কোথা। প্রথম ফটক পার হয়ে'
আমাদের প্রথম জগতে, আমরা কি করব ধাওয়া
দোয়েলের বঞ্চনাই ? আমাদের প্রথম জগতে—
সেখানে তারা তো ছিল, স্বাধীন, অদৃশ্য সব

স্বতই চলিষ্ণু ছিল মরা ঝরা পাতার উপরে
শরতের মৃদুতাপে স্পন্দমান বাতাসের স্রোতে,
তখন ডাক্‌ল পাখি, কুঞ্জের গোপন
অশ্রুত সে গানের উত্তরে,
অদৃশ্য দৃষ্টির রশ্মি পার হয়ে, কারণ গোলাপগুলির চেহারায় বোঝা
　যায়
তারা সব চোখে-পড়া ফুল।
সেখানে অতিথি তারা আমাদেরই, গৃহীত, গ্রহীতা।
এভাবে আমরা চলি, আর তারা, জ্যামিতিবিন্যাসে,
শূন্য গলিপথ দিয়ে, বেড়ার গোলকে,
সেঁচা দীঘি ঝুঁকে পড়ে দেখতে চলেছি।
শূন্য দীঘি, শুক্‌নো শান, পাটল পাড়ের রেখা,
আর, দীঘি পূর্ণ হল জলে জলে রৌদ্রে থৈ থৈ,
আর, পদ্ম মাথা তোলে, ধীরে, অতিধীরে,
আলোর অন্তর থেকে প্রদীপ্ত বাহির,
আর তারা আমাদের পিছনে, দীঘিতে মুকুরিত।
তারপরে একফালি মেঘ গেল, শূন্য হল দীঘি।
যাও, পাখি বললে, কারণ পল্লবে পল্লবে শিশুদের মেলা,
মহা সোরগোল, কেবা কোথায় লুকিয়ে, সম্ভাব্য হাসিতে।
যাও যাও যাও, পাখি বল্‌লে, মানুষ
সইতে পারে না বেশি বাস্তব সত্তা-কে।
গতকাল আর ভাবী কাল
যা হতে পারত আর যা সত্যই হল
নির্দেশ করে সে একই লক্ষ্যে, এক সদা বর্তমানে।

২

রসুন ও ইন্দ্রনীল কাদায় কাদায়
মাটিতে জমেছে রথচক্রের ধুরায়
অনারোগ্য ক্ষতচ্ছায়ে রক্তের ধারায়
মুখর সংগীত স্পন্দমান তারে তারে
বিস্মৃত যুদ্ধের দ্বন্দ্ব মেলায় এবারে।
শিরায় শিরায় নৃত্য, গ্রন্থিসার ধেয়ে
সঞ্চালিত স্রোত বুঝি প্রতিভাস পায়
নীহারিকাপুঞ্জে ক্ষিপ্র নক্ষত্রের সারে
চৈত্রে ওঠে বটে ওঠে আমজাম বেয়ে
আমরাও চলি ঊর্ধ্বে গাছের ধাওয়ায়
আলোয় আলোয় চিত্রবিচিত্র পাতায়
আর শুনি নিচে কাদা মাটির উপরে
শিকারী কুকুর আর দন্তুর শূকরে
আপন বিন্যাসে পিছু ধায় পরস্পরে
অথচ শান্তিতে মেলে নক্ষত্রের সারে।

ঘূর্ণ্যমান এ বিশ্বের স্থিরকেন্দ্রে। দেহ নয়, দেহাতীতও নয় ;
কোথাও থেকেও নয়, কোথাও গম্যও নয় ; স্থিরকেন্দ্রে, নৃত্য
　সেখানেই,
কিন্তু নয় সম্বরণ, আন্দোলনও নয় এবং বোলো না সেটা নিশ্চল
　নিয়ম।
যেখানে গত ও ভাবী সংগৃহীত। কোথাও থেকেও নয়, গম্যও
　কোথাও নেই,
আরোহণ নয় কিম্বা অবতরণও সে নয়। আদ্যন্ত সে কেন্দ্র ছাড়া,
　সেই স্থিরকেন্দ্র ছাড়া
নৃত্য কিছু নেই আর কেবল নৃত্যই তৎসৎ।

এটুকু বলতে পারি আমি, সেইখানে আমরা ছিলুম, কিন্তু বলা
　যায় না কোথায়
বলতে পারি না আমি, কতোক্ষণ, সে যে হবে কালে তাকে
　স্থানান্তর।
প্রত্যক্ষ চিকীর্ষা থেকে অন্তরের স্বাধীনতা
কর্ম ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, ভিতরের আর
বাহিরের চাপ থেকে ছাড়া পাওয়া, অথচ রইবে ঘিরে
ইন্দ্রিয়প্রসাদ এক, এক শুভ্র জ্যোতি স্থির অথচ সচল,
আবেগ অথচ কোনো ঈপ্সা নেই, একান্ত সংহতি, তবু
কিছুই সংক্ষেপ নয়, একাধারে নতুন জগৎ
এবং পুরানো, স্পষ্ট, উভয়েই উপলব্ধ
নিজের নিজের খণ্ডিত পুলকগণ্ডী সম্পূর্ণ হওয়ায়,
নিজের খণ্ডিত ভীতি সমাহিত বলে'।
গত ও ভবিষ্য তবু যদি শৃঙ্খলিত হয়
পরিবর্তনীয় এই শরীরের দুর্বলতা ডোরে,
তবেই মানুষ বাঁচে মর্ত্যের অসহ
স্বর্গ ও নরক থেকে।

　　　　কাল গত আর কাল ভাবী
আমাদের মুষ্টিভিক্ষা চেতনা জোগায়।
চেতন মানেই সে তো কালের অতীত
অথচ কালেরই পটে গোলাপ বাগানে সেই মুহূর্ত একটি
লতাকুঞ্জে বৃষ্টিউদ্বেজিত মুহূর্তটি
ধোঁয়ার প্রহরে সেই মুহূর্তটি ঝোড়ো মন্দিরের
স্মরণে অস্তিত্ব পায় ; গত আর ভাবীতে জড়িত।
কালেরই মাঝারে শুধু কালীয়-দমন।

৩

এই তো সে বিরাগের ঠাঁই
গত কাল আর ভাবী কাল
অস্ফুট আলোয় : দিবালোক নয়
স্বচ্ছ স্থিরতায় রূপের আরোপে
ছায়াকে যে কায়া দেয় ক্ষণিক সুন্দরে
মন্থর আবর্তে এনে অক্ষয় আভাস,
অন্ধকারও নয়, এ তো চিত্তশুদ্ধি ব্রতে
পঞ্চেন্দ্রিয় শূন্য করে কৃচ্ছ্রে বিবিক্তিতে
অনুরাগ মুক্তিস্নাত মুক্ত কালোত্থিত।
ঋদ্ধি নয় রিক্ততাও নয়। শুধুই নিমেষপাত
কালাহত বিড়ম্বিত মুখের উপরে সব,
খেয়ালে খেয়াল থেকে খামকাতাড়িত
নানান্ খুসিতে ঠাসা আর অর্থহীন
অনীহাতে স্ফীত, নেই কোনোই সংহতি
নানা মানুষের ভিড়, কাগজের টুক্‌রো ওড়ে শীতল বাতাসে
কালের আগে ও পরে বইছে বাতাস
অসুস্থ ফুসফুস থেকে যায় আর আসে
কালের বাতাসে কাল আগে আর পরে।
কলকাতার নিরানন্দ খালে বিলে সেঁচা
বিলীন হাওয়ায় যতো স্বাস্থ্যহীন আত্মাদের
আকণ্ঠ উদ্গার, যতো ভারাক্রান্ত জড়
জড়ো হয় বাতাসের লগির ঠেলায়
বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, বেহালা মানিকতলা,
কাশীপুর, দমদম, বরাহনগর। এখানে সে নয়
নয় সে এখানে সেই অন্ধকার কিচিমিচি এ জগতে নয়।

আরো নিচে নামো, নামো
শুধু চিরন্তন নিঃসঙ্গের তিমির জগতে,
জগৎ জগৎই নয়, সে জগৎ অপ্রাকৃত
আন্তরিক অন্ধকার, সকল সত্ত্বের
বিবিক্তি, দুঃস্থতা
ইন্দ্রিয়সংবেদ্য বিশ্বে অবক্ষয়
কল্পনাবিশ্বের সে যে বাস্তুছাড়া নীতি
মানসবিশ্বের সে যে অসহায় পক্ষাঘাত ;
এ একটি পথ এবং অন্যটি সেও
একই, সে গতিতে কিম্বা আন্দোলনে নয়,
সেও তো স্তম্ভিত গতি ; এদিকে জগৎ চলে
বাসনার দীর্ঘশ্বাসে, জগতের সরকারী রাস্তায়
গতকাল ও ভাবী কালের।

৪

কাল ও ঘণ্টা দিলে দিনের কবর
কালো মেঘ নিয়ে গেল সূর্যকে প্রখর।
সূর্যমুখী চাইবে কি আমাদের পানে, মেলবে মালতীলতা
আমাদের দিকে হেল্‌বে কি ? আঁকশি ও ফুলঝাড় পরস্পর
জড়াবে পাকাবে ?
হিমানীর
শ্মশানধুতুরা বুঝি আঙুল বাঁকাবে
আমাদের দিকে ? মাছরাঙার পাখায় যবে
আলো পাবে আলোর দোহার তারপরে স্তব্ধ রবে
তখনও তো আলোর বিন্দুটি ঘূর্ণ্যমান জগতের স্থিরকেন্দ্রে স্থির।

৫

শব্দেরা চলিষ্ণু, সুরও চলে শুধু
কালে কালক্ষেপে ; কিন্তু যা কিছু জীয়ন্ত
সে শুধুই মরে। শব্দেরা কথার-শেষে
পৌঁছায় নৈঃশব্দ্যে। শুধু রূপায়ণে, নক্‌সায়, বিন্যাসে
শব্দেরা অথবা সুর খুঁজে' পায় সে স্থিরতা
যেই স্থিরতায় আজো চৈনিক কলস স্থির
অবিশ্রাম ঘুরে' ঘুরে' নাচে।
সারেঙ্গীর স্থিরতা নয়কো, চরম পর্দায় শেষ স্বর,
শুধু সেইটুকু নয়, কিন্তু সহজীব্যতা সে,
কিম্বা বলো, অন্ত আসে আদির আগেই
এবং সে আদি-অন্ত সদাই বিরাজে
আদির আগেই আর অন্তের পরেও।
এবং সমগ্র সর্বদাই সাম্প্রতিক। শব্দে টান পড়ে,
চিড়্ খায়, কখনও বা ভেঙে পড়ে, চাপে,
আততিতে, ফস্‌কায়, পিছলায়, নষ্ট হয়ে যায়,
অযাথার্থ্যে ক্ষয়ে যায়, যথাযথ খাপ খায় নাকো,
থাকে নাকো স্থির। বেতালার গলা যতো
ধমকে, ঠাট্টায়, কিম্বা নিছক বক্‌বকে
শব্দদের অবিরত আক্রমণ করে। লুব্ধ মদনের গলাবাজি
কৈলাসের বাক্ করে প্রায়ই কলুষিত,
শবশোভাযাত্রী নৃত্যে রুদ্ধমান ছায়া
স্বর্ণ মারীচের দিশাহারা হাহাকার।
রূপের বিন্যাসে অংশ শুধু গতির, বিস্তার
যেমন প্রমাণ দশটি সিঁড়ির উপমা,
বাসনা স্বতই গতি

যদিও স্বতই কাম্য নয় ;
প্রেম নিজে স্বভাবত গতিহীন
শুধুই গতির কারণ ও পরিণতি,
কালাতীত, কামগন্ধহীন
এক কালের দৃষ্টিতে ছাড়া,
সীমারূপে বদ্ধ
নেতি আর অস্তিত্বের মাঝে।
হঠাৎ রৌদ্রের ঘায়ে
যদিও এদিকে চলে ধুলামাটি ছাই
ঐ ওঠে শিশুদের গোপন হাসির
হঠাৎ সহস্র ধারা পল্লব-ছায়ায়
শীগ্‌গির, এখনই, এখানে, এখনই, চিরকাল—
উপহাস্য এই পোড়ো ম্রিয়মাণ কাল
আগে আর পরে তুই হাত পা ছড়ানো।

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

রাইনের মারিয়া রিলকে-র একটি কবিতা

অর্ফিয়ুস। ইউরিডিকে। হেরমেস।

এই-তো আত্মার খনি, অদ্ভুত, অতলস্পর্শ।
আর তারা, খনিগর্ভে রুপোর শব্দহীন শিরার মতো
চলছিলো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে। শিকড়ের ফাঁকে-ফাঁকে
অন্ধকারে ভারি পর্ফিরি-পাথরের স্তূপের মতো
উথলে উঠছিলো সেই রক্ত, যা ব'য়ে চলে চিরকাল
মানুষের সন্ততির দিকে।
তা ছাড়া লাল আর কিছুই ছিলো না।

কিন্তু পাথর ছিলো, প্রকাণ্ড পাথর,
আর ছায়াচ্ছন্ন অরণ্য। সেতু, শূন্য থেকে শূন্যে,
আর সেই বিশাল, ধূসর, প্রতিচ্ছায়াহীন পুকুর
ভূমিতলের অনেক, অনেক ঊর্ধ্বে ঝুলন্ত
দৃশ্যছবির উপরে বৃষ্টিঝরা ধূসর আকাশের মতো।
আর প্রান্তরের পর প্রান্তরের ফাঁকে-ফাঁকে, নরম, ধৈর্যময়,
দেখা দিলো একটিমাত্র পথরেখার ম্লান চিলতেটুকু,
যেন লম্বা সারিতে কাপড় দিয়েছে পেতে
রং ছোপাবে ব'লে।

আর এই একটি মাত্র পথ দিয়ে তারা এগিয়ে এলো।

প্রথমে ছিপছিপে স্বামীটি, গায়ে নীল উত্তরীয়,
বোবা অধৈর্যে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে।
তার পদক্ষেপ যেন পথটাকে মস্ত-মস্ত গ্রাসে গিলে নিচ্ছে,
চিবোবার সবুর সয় না; মুঠো-বন্ধ-করা ভারি তার হাত দুটি
এলিয়ে-পড়া ভাঁজের বাইরে এসে ঝুলে আছে,

আর নেই তাদের লঘু-মধুর বীণাটির চেতনা,
সেই বীণা, যা তার বাঁ দিকটাতে যেন গজিয়ে উঠেছিলো
জলপাইয়ের ডালে গোলাপের লতার মতো।
তার ইন্দ্রিয়গুলিতে যেন ভাগাভাগি হ'য়ে গেছে:
কেননা, দৃষ্টি তার দৌড়চ্ছে কুকুরের মতো আগে-আগে,
ঘুরছে, ফিরে আসছে, দাঁড়াচ্ছে বার-বার
একটু দূরে অপেক্ষা ক'রে, পথের এর-পরের মোড়টিতে;
এদিকে শ্রুতি রইলো পিছনে প'ড়ে গন্ধের মতো।
থেকে-থেকে তার মনে হ'লো যে তার শ্রুতি পিছনে স'রে
ফিরে গেছে সেই অন্য দু-জনের কাছে, এই সমস্তটা পথ
আরোহণ ক'রে পিছে-পিছে যাদের আসবার কথা।
তারপর আবার তার পিছনে যেন কিছু নেই, আর-কিছুই নেই,
শুধু তার চড়াই-চলার প্রতিধ্বনি আর উত্তরীয়ের হাওয়া।
কিন্তু মনে-মনে সে বললো আসছে তারা আসছে;
চেঁচিয়ে বললো, তারপর শুনলো সে-কথার মিলিয়ে-যাওয়া।
হ্যাঁ, আসছেই তো, আসছে তারা, কিন্তু
তাদের দু-জনের পা ফেলা কী-ভয়ংকর, কী-ভয়ংকর হালকা।
যদি থাকতো, যদি তার সাহস থাকতো
একবার, শুধু একবার পিছন ফিরে তাকাবার,
(যদি-না পিছন ফিরে তাকানোতেই
পণ্ড হ'তো সব, নষ্ট হ'তো সমস্ত এই প্রচেষ্টা
এখনো যা শেষ হয়নি,)
তাহ'লে কি আর দেখতে না-পেতো তাদের,
ঐ দু-জন চটুলচরণীকে, নিঃশব্দে তার পিছনে আসছে যারা:
দূরের দৌত্যের আর পন্থচারণের দেবতা,
তাঁর চকচকে চোখে শফর-টুপি টানা,
তাঁর দেহের আগে-আগে ছিপছিপে ছড়িটি বাড়ানো,

তাঁর গুল্‌ফ ঘিরে পাখা ছুটি লঘুকম্পমান,
আর তাঁর বাঁ হাতে বিশ্বাসে সমর্পিতা, সে।

সে, এমন সে প্রেয়সী
যে সমস্ত বিলাপকারিণীদের চেয়ে
বিলাপ বেশি উঠেছে একটিমাত্র বীণায়,
উঠেছে বিলাপের একটি অখণ্ড বিশ্ব, যার মধ্যে
সকল বিশ্ব-বস্তু নতুন ক'রে উপস্থিত : উপত্যকা আর বনানী,
আর পথ আর পল্লী, পশু আর প্রান্তর আর নির্ঝরিণী,—
আর এই বিলাপময় বিশ্বকে ঘিরে,
যেমন ঐ অন্য পৃথিবীকে ঘিরে ঠিক তেমনি
ঘুরেছে একটি সূর্য
আর একটি সমগ্র শব্দহীন তারাচ্ছন্ন আকাশ,
একটি বিলাপময় আকাশ বেদনাবিকৃত তারায় আচ্ছন্ন :—
সে, এমন সে প্রেয়সী।

কিন্তু এখন সে
ঐ দেবতার হাতে হাত রেখে হাঁটছে
আঁকড়ে-থাকা কবর-কাপড় পায়ে-পায়ে জড়ানো,
মৃদু সে, অনিশ্চিত, অধৈর্যহীন।
সময় যার আসন্ন, তার মতো
নিজেকে দিয়েই জড়িয়ে নিয়েছে নিজেকে,
ভাবছে না আগে-আগে পথ-চলা স্বামীর কথা,
আর ঐ-যে পথ উঠে গেছে জীবনের দিকে তার কথাও না।
নিজেকে দিয়েই নিজেকে জড়িয়ে-জড়িয়ে
চলছে সে। আর তার মৃতত্ব
যেন পূর্ণতা, তাতেই সে পরিপূর্ণ।

যেমন একটি ফল ভ'রে ওঠে মধুরতায় আর অন্ধকারে,
তেমনি সে, তার মহান মৃত্যুর সঙ্গে।
সে-মৃত্যু এতই নতুন
যে তখনকার মতো আর-কিছুই সে ভাবতে পারছে না।

সে পেয়েছে নতুন একটি কৌমার্য,
হয়েছে স্পর্শের অতীত ; তার নারীত্ব বুজে গেছে
এগিয়ে-আসা সন্ধ্যায় তরুণ একটি ফুলের মতো,
আর ম্লান তার হাত ছুটির স্ত্রী হবার অভ্যাস আর নেই,
এতই অনভ্যস্ত
যে তাকে হাতে ধ'রে নিয়ে আসছে যে-ক্ষীণতনু দেবতা
তাঁর সংস্পর্শের অসীম মৃদুতাও তাকে পীড়া দিচ্ছে
অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার মতো।

এখনও, এখনও সেই সুন্দরী সে-তো নয়,
কবির কবিতায় মাঝে-মাঝে যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে,
এখনও নয় উদার শয্যার সুগন্ধ আর সুগন্ধি দ্বীপ,
নয় ঐ স্বামীর সম্পত্তি।
এখনই, এখনই লম্বা চুলের মতো সে খুলে গেলো,
তাকে ছড়িয়ে দিলো দিকে-দিকে ঝ'রে-পড়া বৃষ্টির মতো,
তাকে বিলোনো হ'লো, যেন সে কোনো সর্বস্বের সরবরাহ।

শিকড়, সে শুধু শিকড়।
আর যখন, চকিত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে
দেবতা চেপে ধরলেন তার হাত, আর যন্ত্রণার তীব্র
চীৎকারে উচ্চারণ করলেন এই একটি কথা : সে ফিরেছে !
ফিরে তাকিয়েছে !
কিছু না, কিছু বুঝলো না, শুধু অস্ফুটে বললো : কে ?

কিন্তু দূরে, ঐ দূরে, দীপ্ত দ্বারপথে তমস্বী
কে-একজন দাঁড়িয়ে, যার মুখভঙ্গি
চেনা যাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখ্‌লো
প্রান্তরের পর প্রান্তরের ফাঁকে-ফাঁকে পথরেখার চিলতেটুকুতে
নিঃশব্দে, বিষণ্ণ চোখে ফিরে দাঁড়ালেন দৌত্যের দেবতা
একজনের অনুসরণে,
যে-একজন এরই মধ্যে ফিরে চলেছে সেই একই পথরেখা ধ'রে
আঁকড়ে-থাকা কবর-কাপড় পায়ে-পায়ে জড়ানো,
মৃদু, অনিশ্চিত, অধৈর্যহীন।

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

রামধনু

(বুড়চার জন্যে) Contrast - Coventry Patmore's 'Toys'.

বিষ্ণু দে

অন্ধ নইকো, আলো আজো উৎসুক
নতুন সকালে শিশির ছড়ায় মরানদী প্রান্তরে।
বধির নইকো, হৃদয়ের কানাকানি
থেকে থেকে ঢেকে দেয় ঝরাপাতা মরাপাতাদের মুখর দিনের
গ্লানি।

আমের বউল কঙ্কালে ঝরে
জামরুলে মরে ফুল
তবু বৈশাখী কথা রাখে নাকো, তবু অভিসারে ভুল।
তমালের ডালে ঝুলাই হৃদয়, ঘাটে মড়কের বাসা।

তারা বলে ভালোবাসো
কেউবা বণিক কেউবা গণক প্রাণের মানের চরে
সোনালি রুপালি চরে ঘড়া ঘড়া তুলে ভরে
কালো কবন্ধ দন্তুর ভালোবাসা
কেউবা শুধুই বুলি দিয়ে যায় খাসা
ভালোমন্দের ডালে আব্‌ডালে সাতরাণী খেলে পাশা।

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?
ঘরে বসে কি যে লিখে যাস হিজিবিজি
ওরে নির্বোধ শুনিস্ না পথে গান্ধীজি গান্ধীজি ?
সেদিনও তাদের গবেষণা বৃথা, আজো বৃথা পথে খুঁজি।
বহুরূপী তারা, তারা জানে শুধু রংরেজিনীর খেলা।
তাই ঘৃণা, তাই যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে।

ধৈর্যের টানে জ্যাবদ্ধ রাখো ধনু
হে বীর অতনু আসন পূর্ণ করো
নয়নাভিরাম ছদ্ম আর কি সাজে
আকাশ বাতাস উদ্যত থরোথরো
অনাহার আর অনাচার সহে না যে
হানা দিয়ে যায় বহুরূপী মহামারী
হানো বৈশাখী টঙ্কারো হরধনু
গুরুগুরু মেঘে দ্রিমিকি দ্রিমিকি বাজে
বিশ্বামিত্র সামগায়ত্রী ধরো।

দক্ষিণাপথে কল্কীর খুর সাজে
তবু বামাচারে নেই সহজের আশা
গালভরা সুখে ম্যাজিকে মজে না মন।
বিন্ধ্য তোমার নোয়াই স্থাবর ঘাড়
ভূভারতে গড়ি পূর্বাপরের হিমে হিমে যে পাহাড়
পৃথিবীর মানদণ্ড সেই বিরাজে।

কোথায় পালাও ? কাতরে শুধায় নির্ভয় নির্বোধকে
নাটুকে ডাকের নামাবলী গায়ে বৃথাই বাঁচাও চামড়া
চাঁটি মেরে বলো চম্পট কোথা দেবে যতো করো চোখ লাল
কাকে শোধরাবে শাসিয়ে ? শুধায় মন মার্‌-মার্‌কাট্‌-কে।

চুরি জুয়াচুরি জন্মে তার
হুলো বটে তবু রাজদুয়ার
সদা যায় আসে, উদোর পাপ
বুদো ভোগে—মজা এ দুনিয়ার।

কতো না নহুষ দক্ষিণ হাওয়া কাঁপায় ফাঁসায় ফোলে
কতো উভচর, মাটি পায় নাকো, ঝোলে
তবু আশঙ্কা তবু সিন্ধুকে মরা
একঘরে তবু স্বর্ণলঙ্কা ভরা !

ঐ বৈশাখী ! দক্ষিণে তার চৈতী ঘূর্ণী চুপ
কালবৈশাখী ! দক্ষিণে তার উড়েছে সরীসৃপ
উত্তরে তার উমার আরাম কিম্বা আনত সীতা
জনকদুহিতা আকাশে মেলায় মাটির জম্বুদ্বীপ
জামদগ্ন্যের হরধনু বাজে পৃথিবী দীপান্বিতা।

হৃদয় আমার লাফ দিয়ে ওঠে খুশিতে
আমারও হৃদয়
শিশুর শুচি ও সুচির হৃদয়
আকাশে যখন রামধনু ওঠে রামধনু নীল আকাশে
ক্ষণিকপ্রাণের অক্ষয় বরাভয়
লাফ দিয়ে ওঠে খুশিতে
তোমার হাসিতে হে শিশু শেখর রাঙাসন্ধ্যায় আমারও হৃদয় ॥

শপথান্ত

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যবহারে-জীর্ণ-করা একরাশ রাত্রির তলায়
　　খোঁজা বৃথা সেদিনের সেই মাল্যডোর
ফুল যার গেছে খসে' কোন্‌কালে বিশুষ্ক মর্মরে
　　কুসুমিত কোমলতা হয়েছে কঠোর।

সেদিনের সেই স্বর মরে' গেছে তোমার গলায়,
　　স্তনে নেই সেদিনের রক্তের স্তনন ;
প্রেম—সে তো রাত্রিজীবী পতঙ্গের মতো মরে' যায় ;
　　অক্লান্ত থাকে তবু সন্তানজনন।

জীবনের স্তব যতো নীরব হয়েছে জানা কথা,
　　ঝরে' গেছে অতুলন সেই অনুভব।
বিদ্বেষ-ধূমিত বহ্নি ও-হাস্যের হসন্তিকাটায়
　　ভস্ম হ'ল বিগলিত সৌখ্যের শব।

রোমাঞ্চের ভীরু বন কেঁপে কেন ওঠে নাকো আর
　　সুচটুলা মায়াবিনী ছোঁয়ার সাড়ায়,
ভুখা মন মিছে তবু অভ্যাসের যান্ত্রিক প্রথায়
　　রিক্ত হাত ভিখারীর মতন বাড়ায়।

ছ্যাখো না নিজেরই বুকে সেই সব রজনীর নীড়
　　ভেঙে গেছে হত্যাকারী কালের হাওয়ায়,
বিদ্বেষের বিষছুরি বুকে নিয়ে মিছে হাসাহাসি
　　ছলে-ছাওয়া অনুদ্বেল চোখের চাওয়ায়।

প্রাণপণ করে' তবে এইটুকু জেনে গেছে আজ
　　আমাদের ছু'জনের মোহরিক্ত মন :
ফাগুনে আগুন দাও আর কেন, জ্বলে' যাক তবে
　　হৃতপুষ্প কামনার কম্র উপবন।

শপথ হয়েছে শেষ, পথ তবু আছে ছুজনার ;
　　কেন তবে বৈনাশিক ঘৃণার ইন্ধনে
ছুটো প্রাণ হবে খাক্‌, কাজ নেই আর থাক,
　　বিকর্ষক বিবাহের বিকৃত বন্ধনে।

মরা সাধ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার যে ছিলো সাধ,　　তোমার মনের
একটুকু আলো নিই ;　　তোমার বনের
বিরলে খানিক বসি ;　　শিথিল ক্ষণের
অবসরে দেখে নিই　　ছায়া ঝিলমিল।

আমার যে ছিলো সাধ,　　এক পলকের
তরে যেন বসি ওই　　এলো অলকের
যবনিকাটির আড়ে ;　　দিঠি ঝলকের
কিছু আলো নিয়ে গড়ি　　আমার নিখিল।

দিলে কোথা সেই আলো,　　সেই ছায়া রং,
তার চেয়ে কিছুটাও　　দিও না বরং,
অমরতা দেবে বলে'　　দিলে যে মরণ
যতো সাধ মরা আজ—　　মৃতের মিছিল।

তোমার মনের তল　　মননের মাপে
মাপতে গিয়েছি যেই　　এ-প্রাণের তাপে
আশা মিছে অপলাপ　　হ'লো কী যে শাপে
ছলনার মায়া কাঁপে　　আযোজন নীল।

তাসের প্রাসাদ

নরেশ গুহ

'মহান তাসের ঘর, এরি মধ্যে যজ্ঞ জ্বালা চাই।
এখন বিকেল ছটা, সংকল্প নিলাম, তারে মনে রেখো ভাই।
যদিও তাসের গড়া, তবু এর অলীক দেয়ালে
বর্ণ চরিতার্থ হবে অনাগত শিল্পীর খেয়ালে।
দুদিনেই অসমাপ্ত তম্বুরার তার
সুরের সম্মোহে পূর্ণ ক'রে দেবে সমস্ত সংসার।
এ বিশ্বাস মনে নিয়ে এসো আজ ভঙ্গ করি সভা।'
(বাহবা! বাহবা!)
সভা শেষ।...সিগরেট কাছে আছে কারো ?
...আনিনি ট্রামের পাশ, দুচার আনা ধার দিতে পারো ?...
আবার চা কেন ভাই, এ মহৎ কাজে
এই সব তুচ্ছ দিকে আমাদের মন দেওয়া সাজে ?

*　　*　　*

আশ্চর্য কুশলী শিল্পী এলো এক, শূন্যে গড়ে ছাদ,
আকাশের সীমা ছোঁয় অনির্দেশ্য তাসের প্রাসাদ।
এখনো দেয়াল বাকি, সবশেষে গড়া হবে ভিত।
তাসের দেশে এই সনাতন রীত।
(এরই মাঝে একদিন যজ্ঞ জ্বালা চাই—
মনে রেখো, মনে রেখো ভাই।)

হঠাৎ কে ব'লে ওঠে—নিশ্চয়, নিশ্চয়।
এতদিনে গড়া হোলো প্রাসাদ কি, হোলো কি সময় ?—
প্রাণের আগুনে লাল গোলামের মুখে সিগারেট,

বিবিদের আশে পাশে বাচালেরা রপ্ত এটিকেট,
সন্ধ্যার প্রাচীর খোঁজে।

কোথায় সে তাসে গড়া ঘর?
অন্ধকারে শোনা গেল বক্তার একটানা স্বর—
—'ধৈর্য ধরো, বন্ধুগণ, তাস-প্রাসাদ হোলো না তাতে কী?
দৈব বাণী তাই ব'লে কখনো কি হ'তে পারে মেকি?
আনো ঘাস লতা পাতা, দেশলাই দিয়ে জ্বালো আলো।'—

বিবিরা লজ্জায় লাল, গোলামরা সহসা পালালো।

প্রেমের কবিতা

মৃণালকান্তি দাশ

উনিশে ফাল্গুন

এসেছে কখন জানি ভালোবাসা
হৃদয়ের পাখি,
শুনি তার গান,—
শূন্যক্ষরা মধু।
ছড়াল সে স্বপ্নের পালক
নানা রং আঁকা।
এনেছে নীড়ের শান্তি
নিঃসঙ্গ জীবনে।

রিক্ত শাখা আমার এ
বসন্তের বনে,
ফোটাবে কি অগ্নিবর্ণ ফুল
উনিশে ফাল্গুন।

নির্জন স্বপ্ন

তোমাকে খুঁজি মনের নির্জন ছায়ায়,
আকাশে যখন মেঘ করে অবেলায়,
একা একা চেয়ে থাকি জানালার বাহিরে
আর রৌদ্রের দুপুরে
মাঠের বনে যখন ঘুঘু ডাকে।

কিম্বা ঝিঁঝিঁর সুরে রাত নিঝুম হয়ে আসে,
জ্যোৎস্না এসে দাঁড়ায় জানালার পাশে
বোবা, স্তব্ধ—
সেই গহন রাতে তোমাকে মনে পড়ে

আর সারারাত তোমাকে খুঁজি
ধূসর স্বপ্নের পথ ধরে।

নির্জন স্বাক্ষর

রাত্রি ঝরে মাঠ বন ঘাসের শরীরে,
গাছের পাতারা নড়ে, হাওয়ায় হলুদ পাতা ঝরে।
এলোমেলো স্বপ্ন নামে মনের আকাশে,
ঘুমের পাখিরা উড়ে আসে—
শিশিরের শান্তি, স্পর্শ আনে গান
অনামা ফুলের ঘ্রাণ,
অন্ধকার,
ভালোবাসিবার—
প্রেম, তুমি শুনিতে কি পাও
এই পিপাসার ধ্বনি!
হে সুদূর,
রাখো এই হৃদয়ের পর
নির্জন স্বাক্ষর।

আমি শুধু ভালোবাসি

কোনোদিন শুধাব না: 'ভালোবাসো?'
উদাসীন দুপুরে,
মেঘলা দিনে,
ছোট্ট ঘরে যখন ঘনায় সন্ধ্যার ধূসর ছায়া
আর সবুজ ঘাসের ঘ্রাণে বিষণ্ণ বাতাস,
সেই মন্থর মুহূর্তে:
'আমাকে মনে পড়ে?'

কোনো শ্রাবণ রাত্রির
গভীর স্তব্ধতায়

নিজেকে মনে হয়
একা, সুদূর!
আর ঘুমের ঝুরির মত নামে বুকের অন্ধকারে
অস্ফুট বেদনা?

কিম্বা 'ভুলিব না,' করেছিলে কঠিন শপথ,
সে কথাও শুধাব না।

আমি শুধু ভালোবাসি—ভালোবাসি—
এই কথা নির্ঝরের মত নিরন্তর
ঢেউ তোলে হৃদয়ের নদীর ভিতর।

একটি প্রশ্ন

এক ঝলক সোনালি রোদ,
উদাসীন দুপুরের চিল,
মৌমাছির অলস গুঞ্জন
বেগুনি ঘাসফুল—
এর চেয়ে কী সুন্দর,
সেই রংকরা রাজবাড়ি?
যে-কল্পনায় তুমি
ক্লান্ত, ধূসর।

গুচ্ছ

শক্তি মুখোপাধ্যায়

১

কোথা হ'তে এলো পারাবত
কোথা হ'তে এলো কপোতী,
নবজনমের ফুল-রথ
মনোমিলনের সারথি।
দোঁহাকার তরে দুজনে,
দোঁহাকার হৃদি-আরতি ;
এক নীড়ে মধু-কূজনে
মহীরূহ- শাখে ব্রততী।

২

মধ্যদিবসে
উড়ে চলে যায়
যৌবন-রাঙা পাখী,
দীপ্ত আশায়
গান গায় মন
আলপনা দেয় আঁকি।
কল্পনা-বীণা বাজে
রক্ত-কণিকা নাচে।

৩

একটি নিমেষে আঁখিতারা গড়ে
স্বর্গ-স্বপ্ন-দেহ—
আরেক নিমেষে মনের আঘাত
ভাঙে তার সন্দেহ।

৪

কখনো যদি দেখা হ'য়ে যায়
নীরব গোপন পথে,
শুধু চেয়ে রবো দুজনায়
বিস্মিত আঁখিপাতে।

৫

বিদ্যুৎ দিলো
একটু পুলক
তোমার আমার বুকে ;
গান গাই, গান গাই।
বিশ্বভুবন নাচে তালে তালে,
ভাষা নাই, ভাষা নাই।

জলের আয়না

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

প্রেম যেন স্বচ্ছ এক জলের আয়না।
যা-কিছু অসম আর যা-কিছু বিকৃত
করে সে সুন্দর।

যেমন আমার মুখ বাঁকাচোরা-সৃষ্টির স্বাক্ষরে
কুৎসিত, কুটিল—
তবু জানি কোনো-এক তরুণীর চোখে
কোনো-একদিন
এই মুখ ছিলো আলো-ছায়ার বিস্ময়
রূপের মিছিল!
এই চোখে চোখ রেখে
কোনো-একদিন
স্বপ্নে নীল
স্বপ্ন হ'য়ে উঠেছিলো
কোনো-এক কম্পিত হৃদয়॥

অনামী

অরবিন্দ গুহ

ঝিলমিল নীল শূন্যে বাসনার শ্বেত শালিকেরা
অনেক রৌদ্রের রং গায়ে মাখে। কপোত-কপোতী
বাঁধে নীড় ঊর্ধ্ববাহু হিজলের ডালে। রৌদ্রমতী
তবুও মনের ঝর্না শীত-শান্ত ঘন-নীলে ঘেরা।
বনের ছায়ায় এসে হিমে নীল হয় কতো রাত!
তবু তো আকাশ ঢালে সারারাত আলোর প্রপাত।
ঘুম-ভাঙা রাতে বুঝি ভয় করে?—আকাশে তো তারা,
আর কেউ না-থাকুক জেগে থাকে তারার পাহারা।
আবার ঘুমাও তুমি।...এখন তো পাখিদের ভীড়,
ঘুম-ভাঙা ভোরে দেখো মুঠো মুঠো ছড়ানো আবীর
মেঘের কিনারে আর নদীর কিনারে কাশবনে;
সে-রঙের কোনো ছায়া পড়ে নি কি, পড়ে না কি মনে?
তবু কী ভেবেছ তুমি? কোথায় সে রাতভরা তারা,
কোন ভীতু মেয়েটির আকাশে যে এখন পাহারা!

৩

তোমাকে

অরবিন্দ গুহ

শালিকের রঙে ছাওয়া কোনো-এক নদীর বিকালে,
হাওয়ার উতল ছোঁয়া রাশি-রাশি সারি-সারি পালে
যদি এসে লেগে যায় ! হয়তো তখন নীল জলে,
ডানার রৌদ্রের রং ধুয়ে ফেলে পাখিরা সকলে।
পাতার আড়ালে ঘেরা চেনা পথ আর ছোটো নীড় ;
সে-বিকেলে ঠিকমতো ফিরে আসে মাঠের তিতির।
বহু কামনার দূর নীল ছবি মনে হয় সব :
তেঁতুল ছায়ার ফাঁকে হরিয়াল করে কলরব।
এমনি মাটিরে যদি কখনো তোমার রেলগাড়ি
পার হয় ;—তার আগে, আমি ঠিক বলে দিতে পারি,
তোমার চুলের গোছা ছুঁয়ে যাবে উদাসী বাতাস,
রঙিন লাগবে সব—বন, নদী, মাঠ, পথ, ঘাস
রঙিন, রঙিন ছাড়া আর কিছু মনে হবে নাকো—
এ-নীল আকাশ, আহা, কোন মহাসাগরের সাঁকো।

দ্বীপ

অরবিন্দ গুহ

মনের বিজন দ্বীপ সাগরের লোনা নিঃশ্বাসে
মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। হয়তো তখন নীল ঘাসে
চাঁদের সবুজ ছোঁয়া নরম হাতের মতো লাগে,
হয়তো মনের দ্বীপ খুশি হয়ে ওঠে অনুরাগে।
নামহীন এক ঝাঁক ছাইরঙা সাগরিকা পাখি,
এক ঝাঁক—যে-দুপুরে মনে হয় তবুও একাকী—
তেমনি দুপুর রোদে সূর্যেরে আড়াল করে মেঘ—
জানে না তো হেথা আছে সাগরের, চাঁদের আবেগ।
আমার দ্বীপের কথা দিনরাত এতো ক'রে ভাবি,
কে জানে কোথায় তবু এ-দ্বীপের দরোজার চাবি !
চোখের জলের কার লোনা ঢেউ দোলা দেয় মনে ?
না-জেনে কেন যে তবু খুশি-হ'য়ে-ওঠা অকারণে !
হয়তো মিথ্যে নয় এই ধান, এই গান বোনা,
হয়তো অতল তলে ঘুমায়ে রয়েছে কিছু সোনা,
আমার ফসল বোনা হয়তো বা মিছিমিছি নয়—
না হ'লে তো থাকতো না আকাশের নীলের অভয়।
না হ'লে কি কালো জলে ডুবে গেলে জনতার দ্বীপ
কোনো কেউ জ্বেলে দিত সারারাত চাঁদের প্রদীপ ?

হৃদয়কে নিয়ে

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

এক-একদিন থাকি চুপচাপ হৃদয়কে নিয়ে।
খুঁজে ফিরি হৃদয়ের শব্দহীন রহস্য গভীর,
মনের সুরঙ্গ-পথে শত শত অন্ধকার ভিড়,
ঊষর স্মৃতির ইট, ইতস্তত কঙ্কাল ডিঙিয়ে
চলে গেছি : ঢেউ-ভেঙে দূর দূর অতল সাগরে :
নবনী-নরম মাটি—চিড় খায় ঝড়ের বাতাসে,
দেখেছি রৌদ্রের রঙে তবুও প্রোজ্জ্বল সূর্য হাসে,
তবু যেন মনে হয় ভিতরটা থম্‌থম্ করে।

মাঝে মাঝে নেমে আসি হৃদয়ের সত্তার ভিতর।
মুক্ত করে দিয়ে যাই অবরুদ্ধ প্রাণের কপাট,
কত না স্মৃতির ঘ্রাণ স্থানে স্থানে মূর্ছাহত ঝড়
চকিতে আভাস আনে, স্বেদসিক্ত হয় যে ললাট।
কখনো পৃথিবী নিয়ে কখনো বা প্রচ্ছন্ন হৃদয়
শশব্যস্ত, ভুলে থাকি দীর্ঘশ্বাস, অন্ধকার, ভয়।

চিঠি

(নরেশ গুহ-কে)

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গের করুণা পেতে ছায়াপথে অনেক ঘুরেছি,
সূক্ষ্ম শিল্পে ভাবনার মেঘলোক ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছি
কথার মিনারে—আর ফসলের সোনা-জ্বলা ক্ষেতে
কম্পিত কার্তিকে যারা ক্ষুধাশীর্ণ মুঠি ভরে দিতে
খেটে খেটে হতদীপ্তি ; এ যন্ত্রের অনাহত তারে
তাদের নামের গান নীলিমার বেতারে বেতারে
পৃথিবীকে শুনিয়েছি—অনিদ্রিত দীর্ঘ রাত্রি দিনে
তবু তো বঞ্চিত আমি, নির্যাতিত নবাঙ্কুর তৃণে।

বহু অনুক্রম শেষে পথপ্রান্তে আজ বসে ভাবি
বিনা সর্তে মেনে নেব উপবাসী হৃদয়ের দাবী ;
বক্ষের পবিত্র রক্ত-পদ্মে পেতে স্বর্ণ-সিংহাসন
মিছিল, মেলার ভিড়ে খুঁজে আজ পেলে তার মন
গান, শুধু গান গাই। সেই ক্ষণে তুমি, যদি পারো,
মোর শুষ্ককণ্ঠে সুধা ঢেলে দিয়ো একবিন্দু, আরো।

পেশা

সুনীলকুমার নাগ

নারীর চোখের তলে নেই আর সাগরের ভার,
খোঁপা যদি খুলে যায়, কারো কিছু এসে যায় না তো,
এমনকি অঞ্চলের শৈথিল্যও ততটা বিখ্যাত
নেই আর, প্রকৃতির রহস্যের ভিড় নেই আর।
একদা যা ছিলো দীর্ঘ সাধনার দুষ্প্রাপ্য সঞ্চয়,
সম্প্রতি যে-কোনো পণ্য, অন্য-কোনো জিনিশেরই মতো
তারেই ছড়ানো দেখি যেখানে-সেখানে ইতস্তত ;
সরল, প্রকট বিশ্বে নিঃশেষিত হয়েছে বিস্ময়।

তবু তো উদাস দিনে কিংবা কোনো বিষণ্ণ বিকালে
ধৈর্য ধরে তাল দিই কোনো দূর কূজিত কপোতে ;
সন্ধ্যার আকাশ আজো শুনি ভালো লাগে অনেকের—
যদিও তখনি তারা অবহুল বসনের তলে
খোঁজে সেই অধীর অভ্যাসে ; কিন্তু তারপর পথে
একা রাত্রি স্বপ্ন আনে। স্বপ্ন দেখা পেশা আমাদের।

ক্লান্ত কাক

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাল সারারাত ধ'রে
জ্যোৎস্নার অবিশ্রান্ত বর্ষণে সিক্ত হয়েছে পূর্ণিমার পৃথিবী :
আলো আর অন্ধকারের লুকোচুরি উৎসব হয়ে গেছে
গাছের পাতায়, ঘাসের শীষে, ঝরা শিউলির মরা শরীরে।
উপরে আলো, নিচে অন্ধকার, এপাশে আলো, ওপাশে অন্ধকার,
তবু সকল অন্ধকারকে ছাপিয়ে আলো, আলো, অফুরন্ত আলো—

কাল সারারাত ধ'রে
কাকটাকে মাতাল করেছিলো,
'ভোর হয়ে গেল, ভোর হ'য়ে গেল' ভেবে।
'ভোর হয়ে গেছে, ভোর হ'য়ে গেছে—'বলে
সারারাত ধ'রে চিৎকার ক'রে ক'রে
তারপর প্রভাতের শিশিরে প্রভাতী সূর্যের রক্তাক্ত জন্ম দেখে, ছায়া
দেখে
কোনো ভৌতিক স্বপ্নগ্রস্তের মতো এক নতুন বোধের আস্বাদ পেলো।

সেই চিরপরিচিত পৃথিবী, ছোটো নীড়
কিছুদূরের অতিপরিচয়ের ছোট্ট একটুকরো পরিত্যক্ত আলোর মধ্যে
ঝরা শিউলির গন্ধ, ভোরের শিশিরের গন্ধ, সূর্যে ও শিশিরে মেশা
ঘাসের গন্ধ ও স্বাদ
আজ সকালে আর তার চিকণ-কালো পালক দুটিকে চঞ্চল করলো না।
ভোরের হাওয়া যখন তাকে মুঠো মুঠো চুমু ছড়ালো
কাক তখন উঠলো আর্তনাদ করে, বললো—'ঘুম, ঘুম, ঘুম !'
কারণ, ক্লান্তি···ক্লান্তি ··ক্লান্তি···ক্লান্তি নেমেছে তার শরীরে,
শরীরের বিস্ময়ে, হৃদয়ের বিষাদের নতুনবোধের জন্মলাভের চেতনায়।

জাতিস্মর

চিত্ত ঘোষ

আমরা তখন এক সমুদ্রের ধারে বসে দেখেছি আকাশ :
সে-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন, স্বাদ, অভিলাষ, সব ইতিহাস
মনে জানে অবলুপ্ত প্রাসাদের গর্বিত গম্বুজ
মিনারের তীক্ষ্ণ চূড়া সূর্যালোকে সোনালি সবুজ,
বাতায়নে বর্ণমেঘ, কক্ষকোণে গন্ধজল, রশ্মিজালে লুণ্ঠিত প্রহর
দ্বারপ্রান্তে শিলামূর্তি, শ্বেততনু কুমারীর তরঙ্গিত দেহের মর্মর
ছায়ানীল অলিন্দের আশে পাশে, মেঝেতে মসৃণ
কাঁচা রোদে ঝলমল, ঝলমল দিন।

অতীতের অন্ধকারে মৃত মুখ বর্ণহীন স্থির :
কফিনের আবরণে মস্লিনের মত শাদা নারীর শরীর
সব আছে, সব আছে মনে—
তোমার হাতের মত ঠাণ্ডা হাত ছুঁই নিতো আমার জীবনে।

উত্তাল ঝড়ের রাতে সমুদ্র ভাসায়ে নিয়ে গেছে
প্রাসাদের বুক থেকে পাথরের প্রাণ : তবু তার মেঝে
জলের করুণ দাগ মুছে ফেলে নির্মম অতীত,
হেমন্তের সবখানে দিয়ে গেল কুয়াশার বরফের শীত ;
সেই মূর্তি, সেই কক্ষ, সেই বাতায়ন
উচ্ছল পাখীর মত কলকণ্ঠ মুখর জীবন
তারা কি ঝিনুক হ'য়ে ভেসে গেল লবণাক্ত জলে
অথবা গভীরতর অন্ধকারে ডুবে আছে সমুদ্রের রহস্যের তলে।

তবু নীল সমুদ্রের অবিশ্বাসী জল মেপে মেপে
হ্রস্ব দীর্ঘ রাত্রি দিন নিতান্ত সংক্ষেপে

আদিগন্ত কুয়াশায় রাতকানা জাহাজের বিমর্ষ নাবিক
গোলাকার কম্পাসের দিকে চেয়ে ভেবে নেয় কোন্ দিক ঠিক,
নীহারিকা ছায়াপথে কোনো বিজ্ঞ ধ্রুবতারা, আকাশপ্রদীপ
অন্ধকারে খুঁজেছিল হিরণ্ময় প্রবালের দ্বীপ।
সেই সব ঘটনার মূক বিবরণ— সব আছে মনে
তোমার মুখের মত মরা মুখ দেখি নাই এ তিন ভুবনে।

তরল হৃদয় থেকে সে আকাশ মুছে শেষ হ'লো :
সমুদ্রের দিকে চেয়ে তুমি আজ সত্য ক'রে বলো
কী ছিল তোমার মনে ?—নীড়, দেহ, মৃত্যু, ভালোবাসা ?
ছিল কি নদীর মত পাড়-ভাঙা দুরন্ত দুরাশা ?
নিরুত্তর কেন তুমি ? মূক কেন ? মুখ কেন বর্ণহীন, শাদা ?
সত্য বলো ঐ মনে কতটুকু জল আর কতটুকু কাদা ?

কুয়াশা-তুহিন রাত, মাটিতে জলের স্বর, শুধু পড়ে মনে
তোমার চোখের মত হিম চোখ দেখি নাই আমার জীবনে।

স্বগতোক্তি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

অপরাহ্ণ মিলে যায় বর্ণহারা সন্ধ্যার আকাশে,
চায়ের পেয়ালা হাতে আধো অন্ধকার এই ঘরে
দিনান্তকে ব্যর্থ ক'রে দেয়
আমার এ-হৃদয়ের রঙ্গমঞ্চে অতীতের পুনরভিনয়।
নিজেকে প্রত্যক্ষ করি অবিশ্বাস্য উজ্জ্বল আভায়।
কিন্তু এই স্মরণের, প্রাক্তনের সুর—
আমার জীবন থেকে কত দূর, আজ কতদূর।

২

জীবনের হারানো শরীরে
বসন্তেরা লিখেছিলো ফিরে-ফিরে
প্রাণের রক্তিম ইতিহাস।
সে-বসন্ত নেই।
বৈশাখের তৃতীয় নয়ন
আজকে করেছে দগ্ধ ফাল্গুনের বিজয়তোরণ,
পাখীদের আকাশবিলাসী কোলাহল,
এখানে এখন স্তব্ধ, আগামীর প্রত্যাশা অচল।
কেবল বিষণ্ণ মনোভার
আজ চায় মেঘে-মেঘে পুঞ্জীভূত সুবিশাল আচ্ছন্ন আষাঢ়।

৩

চোখের তারায়
বলো, বলো, স্বপ্নেরা কি এখনো দাঁড়ায় ?
অবিদ্যার অবকাশে অবুদ্ধির আড়ালে আড়ালে

সোনালি শৈশব ছিলো, কৈশোরও কিছুটা।
হে উন্মাদ, কোথায় হারালে ?

৪

দেখ, মূর্খ, চেয়ে দেখ
নিষ্ঠুর তুষারবৃত্ত ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসে,
গভীর মর্মের মূলে এখনো সন্ধান করো—
যতিহারা হাসির উল্লাসে।
এ তুষার ছিঁড়ে হবে দিতে
অরণ্যের অজস্র সংগীতে
রজনীগন্ধার ঝড়ে তোমাকে ফেরাতে হবে জীবনের বিনষ্ট সম্ভ্রম,
নিরাবেগ, নিরালম্ব দিনশেষে নিত্য নিরুদ্যম
দাঁড়াও, দাঁড়াও আজ উন্মোচিত আকাশের নিচে।
ফলের আস্বাদ জানি ক্রূর
তাব'লে কি ফুল সেও মিছে ?

এও তার

বুদ্ধদেব বসু

ক্ষান্ত হ'লো যৌবনের কলতান। সাঙ্গ হ'লো খেলা।
আনন্দিত ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল-লজ্জার মেখলা
শ্লথ হ'লো শূন্য ম্লান নিঃস্ব নীলিমায়। যে-মোহিনী
বিশ্বজয়ী মাল্য দিয়ে একদিন করেছিলো ঋণী,
আজ তার শুষ্ক মালা, পুষ্পগুলি একে-একে খ'সে
রেখে যায় স্মৃতির ভীষণ ভার। আমারই অর্ঘ্য সে
দেয়, দেখি, অন্য জনে, একই মন্ত্রে নিশ্চিন্ত নবীনে।
প্রাণলোকে আমার প্রবাস শেষ ; আজ দিনে-দিনে
অভ্যর্থনা-অতিক্রান্ত অপরাহ্ণ, আচ্ছন্ন, আতুর,
অব্যর্থ লুপ্তির ডাক আরো শোনে এ-রিক্ত ঋতুর
দীর্ঘশ্বাসে ; অবিরাম মুহূর্তের উদ্দাম উজানে
প্রাথমিক আতিথ্যেরে অসহ্য-অতীত ক'রে আনে
করুণার অগৌরবে, কার্পণ্যের অবমাননায়।

তবু কেন মনে হয় ভ'রে আছি কানায়-কানায়
খনির অপরিমাণ অন্ধকার আদিম হৃদয়,
তপ্ত, ঘন, আর্দ্র, কম্পমান ? তবু যেন মনে হয়—
যদিও সে-হুলুস্থুল, জলে-স্থলে মত্ত তোলপাড়
নেই আর—কিংবা নেই ব'লে—সেই মোহিনী আমার,
আমারই প্রেমিকা আজ। এই দীর্ঘ ধৈর্যের ঘনতা
আনে যেন অন্ধকারে ক্ষমাহীন খন্তার মমতা
আমার প্রিয়ার হাত ; তারই চাপ দিনে-দিনে বাড়ে
হৃৎপিণ্ডে, শিরার তৃষ্ণার ঠোঁটে। যা-কিছু সে কাড়ে
সবই তার অবিস্মৃত শর্তের পূরণ ; দেয় যদি

অন্য-কিছু, তাও তারই সত্যরক্ষা। যে-রক্ত, যে-নদী
দূরে, ধীরে বয়, পাথরের তলে, প্রচ্ছন্ন ধাতুর
ধারালো দাঁতের ফাঁকে, অন্ধ তাপে অস্থির বস্তুর
দীর্ণ ধাপে-ধাপে, সে-যে আজ আমার হৃদয় হ'য়ে
দূরে, ধীরে, আরো দূরে, অন্তহীন, শান্তিহীন, ব'য়ে
চলে, হীরকের মায়াবী চোখেরে ডাকে, এও তার,
তারই প্রতীক্ষার ধার, এও তারই প্রতিজ্ঞার ভার।

সম্পাদকীয়

'কবিতা'র তেরো বছর পুরলো। বাংলাদেশের পক্ষে, অমিশ্র সাহিত্যপত্রের পক্ষে, দীর্ঘায়ু বইকি। বেশি কিছু আশা নিয়ে আরম্ভ করিনি। 'আচ্ছা দেখি না'র বেশি স্পষ্টতা ছিলো না উদ্‌যোগে। কিন্তু 'কবিতা' বাড়লো, বন্ধু পেলো, লেখক, পাঠক, কিছু ক্রেতা, এমনকি কিছু বিজ্ঞাপনও। তৃতীয় আর চতুর্থ বছরে 'কবিতা' সচ্ছলতার মুখ দেখলো। আর যদিও সেই ক্ষণবসন্তের মুহূর্তেই পৃথিবী ভ'রে যুদ্ধের শীত নামলো, তবু এই প্রকাণ্ড লড়াইটাও 'কবিতা' কাটিয়ে দিলো কোনোরকমে। যুদ্ধ থামলো; নিশ্বাস নিয়ে, যেন নতুন ক'রে আমরা আরম্ভ করলাম; দেশ স্বাধীন হ'লো। আর তারপর আস্তে-আস্তে অন্য-এক শীত নামলো আমাদের মনে, এই উপলব্ধির শীত যে দু-দুটো সুবৃহৎ শুভঘটনা সত্ত্বেও সময়টা খারাপ, যুদ্ধের চেয়েও খারাপ—কেননা আমরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম না; যারা ছিলো, তাদের পক্ষে অবশ্য যুদ্ধের চেয়ে খারাপ আর-কিছুই না—এত খারাপ সময় আগে আর দেখিনি আমরা, আর—তার চেয়েও যা বেশি—আরো কিছুকাল ধ'রে আরোই খারাপ হবে দিন-দিন।

* * *

দেশের দুঃসময়ে প্রথমে মরে তারা, যারা মনের খিদে মেটায়। 'কবিতা'র সংসারে অকুলোন ঘটতে-ঘটতে এখন অসম্ভবের কাছাকাছি এসেছে। যুদ্ধের সময়ে আকাশস্পর্শী দামের সঙ্গে-সঙ্গে শস্তা টাকার ছড়াছড়িও ছিলো; এখন দ্বিতীয়টি নেই, ব্যবসামন্দার বিস্ফোটক দেখা দিচ্ছে, কিন্তু প্রথমটি ঠিক তেমনি আছে। ঠিক তেমনিও নয়; ছাপার দাম—মালিকরা যতটা শাসিয়েছিলেন, আমাদের আন্দোলনের ফলে ততটা না-হ'লেও খানিকটা আরো বেড়েছে, ১৯৪৫-এর দামের উপরেও শতকরা ২৫ থেকে ৫০ পর্যন্ত। আর সঙ্গে-সঙ্গে—কলকাতার বৎসরব্যাপী নরহত্যার ফলে, তারপর ব্যবসামন্দার সংকোচনে, বিজ্ঞাপন ক'মে গেছে; আরো-যে কমেনি, সেজন্য ধন্যবাদ জানাই তাঁদের, ব্যয়সংক্ষেপের প্রয়োজন এবং 'কবিতা'র পরিমিত প্রচার সত্ত্বেও এখনো যাঁরা নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের। এদিকে আমাদের চিরকালের চিরচেনা বাংলা দেশ হঠাৎ দুই রাজত্বে বিভক্ত হ'য়ে গিয়ে বাংলা বইয়ের সমস্ত

বাণিজ্যটাকে যে-বিশৃঙ্খলায় ফেলেছে, তার ধাক্কাও 'কবিতা'র পক্ষে কম না। আরো একটু কথা এই যে সাংসারিক বিচারে গ্রন্থাদি যেহেতু 'বিলাস-পণ্য', তাই 'কবিতা'র গ্রাহক আর না-থেকে বছরে চার টাকা বাঁচাবার প্রলোভন বর্তমান অবস্থায় কারো-কারো পক্ষে স্বভাবতই অসংবরণীয়। হয়তো এটা উল্লেখযোগ্য যে গত তিন বছরে যে-সব গ্রাহক ছেড়ে দিয়েছেন তাঁরা অধিকাংশই 'বড়ো চাকুরে', আর নতুন যাঁরা হয়েছেন তাঁরা অধিকাংশই—ঠিকানা থেকে যতটা বোঝা যায়—কেরানি কিংবা ছাত্র, কিংবা কোনো গ্রন্থাগার, কিংবা অবাংলার অধিবাসী।

* * *

১৯৩৮-এর তুলনায় 'কবিতা'র দাম বেড়েছে আড়াইগুণের কিছু বেশি, বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণের কিছু কম, আর খরচ বেড়েছে অন্তত চারগুণ। আয়-ব্যয়ের এ-রকম বৈষম্যে সকলেরই যা হয়, 'কবিতা'রও এখন তা-ই হয়েছে; এই সংকট আর বেশিদিন সহ্য করতে নিশ্চয়ই সে পারবে না। আর খুব বেশিদিন তার প্রয়োজনও বোধহয় নেই, এক হিশেবে কোনোকালেই ছিলো না, কেননা দেশের লোক-যে 'কবিতা'কে চায় না, তার প্রমাণ তো এই কথাগুলিতেই—যদি চাইতো, এ-সব বলবারই দরকার হ'তো না—আর দেশ যা চায় না, তার-তো না-থাকাই উচিত? বৃহত্তর অর্থে যেটা 'দেশ', সেটা, বর্তমান সময়ে, পৃথিবীর কোনো অঞ্চলেই শুদ্ধ সাহিত্য আকাঙ্ক্ষা করে না, এই বড়ো কথাটা এখন ছেড়েই দিলাম; দৃষ্টি সংকীর্ণ ক'রে এনে এটুকু দেখতে পাই যে দেশের মধ্যে—হ্যাঁ, দেশের মধ্যেই—কেউ-কেউ আছেন, 'কবিতা'র মতো কোনো পত্রিকা যাঁদের প্রয়োজনেরই অন্তর্গত। আপাতত তাঁদের সংখ্যা যত কম, আসলে তার বেশি ব'লে আমাদের বিশ্বাস;—সকলকে পৌঁছতে পারিনি আমরা, পারবোও না;—কিন্তু যাঁদের পেরেছি, তাঁদের কাছে আজ এই অনুরোধ উপস্থিত করি, তাঁরা যেন অন্যদের সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপনের মধ্যবর্তিতা করেন। আমরা অনুমান করি যে বাংলার বাইরে, বাংলার মফস্বলে, গ্রামে, এমনকি কলকাতার শহরেও, কিছু মানুষ আছেন যাঁরা 'কবিতা'র অস্তিত্বই এখনো জানেন না, কিন্তু জানলে সুখী হন, আর তাঁদের সঙ্গে 'কবিতা'র পরিচয় সবচেয়ে ভালো ঘটাতে পারেন তার বর্তমান পাঠকরাই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'কবিতা'র এখন যাঁরা গ্রাহক, তাঁদের সাহায্যেই আরো গ্রাহক পাওয়া

সবচেয়ে বেশি সম্ভব, আর এই সাহায্য, চতুর্দশ বর্ষের আরম্ভ থেকে, তাঁরা যদি 'কবিতা'কে করেন, তাহ'লে আরো কিঞ্চিৎকাল তার অস্তিত্ব সম্ভব হ'তে পারে।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

চতুর্দশ বর্ষের চাঁদা (চার টাকা), কিংবা নিষেধাজ্ঞা, আগামী ১লা আশ্বিনের মধ্যে যাঁরা না-পাঠাবেন, তাঁদের সকলকেই আমরা আশ্বিনসংখ্যা ভি. পি. করবো। ভি. পি. প্রত্যাখ্যান না-করবার যথাসম্ভব চেষ্টা সকলেই যথাসাধ্য করলে আমরা বিশেষরূপে বাধিত হই।

ডাকঘরের রেজিস্ট্রেশনের মাশুল বেড়েছে ব'লে রেজিস্টর্ড গ্রাহকদের চাঁদা চার টাকা আরো আনার বদলে **পাঁচ টাকা** ধার্য হ'লো। পূর্ববঙ্গের গ্রাহকদের রেজিস্টর্ড ডাকে পত্রিকা নেয়াই এখন পর্যন্ত বাঞ্ছনীয় মনে করি।

বুদ্ধদেব বসু
সম্পাদক, 'কবিতা'
কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

সম্পাদক ও প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা থেকে
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত